অমিত্রাক্ষর

ললিতমোহন

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই. এ. এস.
যুগ্ম-সচিব, পূর্ত বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার



পূর্ত বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশক :
পূর্ত বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ব্লক :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং

প্রচ্ছদপটশিল্পী :
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ :
৫,৫০০ কপি

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ, ১৩৭৭
(ফেব্রুআরি, ১৯৭১)

মূল্য ৩'৭৫ টাকা

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গে পুরাকীর্তির অভাব নাই। সর্বভারতীয় স্থাপত্যের তুলনায় তাহারা যথেষ্ট ব্যয়বহুল বা বৃহদায়তন না হইতে পারে, কিন্তু শিল্পকলার প্রকাশে ও আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করায় তাহাদের মূল্য খুব বেশী। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ ইহাদের অনেকগুলির সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিলেও, অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি পশ্চিম বাংলার দূরদূরান্তে এখনও অবহেলায় নষ্ট হইতেছে। প্রধানতঃ এগুলির সংরক্ষণের জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন প্রণয়ন করেন এবং সে আইনের বিধিগুলি কার্যকর করিবার জন্য ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এ রাজ্যে এক পূর্ণাঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের (Directorate) সৃষ্টি হয়। মূর্তি প্রভৃতি সংগ্রহ ও ভূগর্ভ খননপূর্বক নূতন আবিষ্কার করার দিকেই এই অধিকার প্রধানতঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, পুরাকীর্তি সংরক্ষণকার্যে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। ফলে, গত দশ-এগার বৎসরের মধ্যে এই অধিকার মাত্র অল্প কয়েকটি পুরাকীর্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন; বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত পুরাকীর্তি-গুলির একটি তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তাও তাঁহারা অনুভব করেন নাই। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন সরকারের পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে লইয়া রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে কর্মপ্রণালী স্থির করিবার জন্য এক উপদেষ্টা পর্ষদ ও প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি প্রণয়নের জন্য এক কমিটি গঠন করিয়া আমাকে অবৈতনিক-ভাবে প্রথমটির সভ্য ও দ্বিতীয়টির সভাপতি হইতে অনুরোধ করেন। আমি সে প্রস্তাবে সম্মত হই। কিছুদিন পরে, অবহেলিত পুরাকীর্তি-গুলির সংরক্ষণের জন্য, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর সভাপতিত্বে, কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তিকে লইয়া আর একটি কমিটিও গঠিত হয়। পুস্তক প্রণয়ন কমিটির কার্যসূচী হিসাবে স্থির হয় যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলার ও কলিকাতার যাবতীয় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির বিবরণী-সংবলিত পৃথক্ পৃথক্ পুস্তকের এক সুলভ গ্রন্থরাজি (series) প্রকাশিত হইবে এবং এগুলি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিত হইলেও, সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তিবিষয়ক এক আকর-

গ্রন্থের (Archaeological Encyclopaedia of West Bengal) অভাব পূরণ করিবে। এই দুরূহ কার্যের সূচনা হিসাবে সর্বপ্রথমে পূর্ত বিভাগের যুগ্ম-সচিব ও রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের তিনজন আধিকারিককে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও কোচবিহার জেলা সম্বন্ধে গ্রন্থরচনা করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। বর্তমান পুস্তকটি এই পরিকল্পনার প্রথম গ্রন্থ। অন্যান্য জেলা সম্পর্কে গ্রন্থগুলি যাহাতে শীঘ্রই প্রকাশিত হয় সেজন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হইবে।

এ পুস্তকের লেখক, পূর্ত বিভাগের যুগ্ম-সচিব শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই. এ. এস. মহোদয়, পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরাদি বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম, তথ্যবহুল, প্রামাণিক গ্রন্থ 'বাঁকুড়ার মন্দির'-এর প্রণেতা হিসাবেই সমধিক খ্যাত; তিনি যে উপরন্তু পদস্থ সরকারী কর্মচারী সেকথা সুবিদিত নহে। কিছুকাল আগেও সরকারী চাকুরি ও গবেষণামূলক গ্রন্থরচনার কাজ পরস্পরবিরোধী ছিল না; বহু আই. সি. এস. ও অন্যান্য উচ্চ পদাধিকারীরা জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন বিভাগে তাঁহাদের ব্যুৎপত্তি ও মণীষার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। বর্তমান যুগে ইহার দৃষ্টান্ত খুব বেশী দেখা যায় না। সুতরাং, শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পূর্বতন ধারাটি অনুসরণ করায় ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই আনন্দিত। শাসনকার্যে নিযুক্ত থাকিলেও, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের গবেষণা ও আলোচনায় তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও অধ্যবসায় আছে।

আলোকচিত্রণ বিদ্যায়ও শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য। প্রত্নতাত্ত্বিক বা অনুরূপ গবেষণার কার্যে এই আনুসঙ্গিক দক্ষতা অতিশয় প্রয়োজন। তাঁহার নিজের হাতে তোলা, এই পুস্তকের শেষে সন্নিবিষ্ট, ৬৪টি ফোটোগ্রাফ এবিষয়ে তাঁহার পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবে সন্দেহ নাই। এই চিত্রগুলি প্রস্তুত করিবার ব্যাপারে শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় রাহাখরচ ব্যতীত অন্য কোন সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; নিজের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া, নিজের 'ডার্করুমে' সেগুলি পরিস্ফুট করিয়া এ পুস্তকে ব্যবহারের জন্য দিয়াছেন। প্রকাশনের ক্ষেত্রেও যাবতীয় কার্য তিনি নিজেই করিয়াছেন; অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগের বা বর্তমান কর্মচারীদের নিকট সাহায্যের দাবী করেন নাই। ভরতুকি (subsidy) না দিয়া প্রকাশিত এ পুস্তকটির স্বল্পমূল্য নির্ধারণ (ব্যবসায়ী প্রকাশকেরা দ্বিগুণ মূল্যেও এহেন একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ) তাঁহার এই পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগের ফলেই সম্ভব হইয়াছে।

'ফিল্ড-ওআর্ক' বা সরেজমিনে অনুসন্ধানই এজাতীয় গ্রন্থের ভিত্তি। সেজন্য গ্রন্থকার গভীর নিষ্ঠার সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যে অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছেন, পুস্তকের সর্বত্রই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি বিষয়ে প্রচুর তথ্যবহুল এ গ্রন্থখানি যে বহুদিন পর্যন্ত ভবিষ্যৎ গবেষকদের পথনির্দেশ করিতে পারিবে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

গ্রন্থখানি প্রস্তাবিত এই শ্রেণীর গ্রন্থরাজির প্রথম প্রকাশিত পুস্তক হওয়ায় ইহার লেখকের দায়িত্ব খুব বেশী। কারণ, ইহা যে প্রণালী ও আদর্শ সূচিত করিবে ভবিষ্যতেও অনেক পরিমাণে তাহাই অনুসৃত হইবার সম্ভাবনা। গ্রন্থকার এই দায়িত্ব সুচারুরূপেই সম্পন্ন করিয়াছেন। ভূমিকায় বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস, মন্দিরনির্মাণপ্রণালী, মন্দিরের শ্রেণীবিভাগ ও কালনির্ণয় এবং অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আলোচনা করিয়া পরে মূল গ্রন্থে আদি বর্ণানুসারে পরপর বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থানের বিবরণ দিয়াছেন। এই বিবরণে, প্রতি স্থানে যাইবার পথের সন্ধান ও সেখানে যাহা যাহা দ্রষ্টব্য সে সম্বন্ধে এবং প্রাচীন কিংবদন্তী প্রভৃতি বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী সম্বন্ধে সকলের মনেই একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। গ্রন্থকার এজন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থরাজি প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, বর্তমান পুস্তকে তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তিগুলির এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণী অবিলম্বে সংকলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং যোগ্যতার সহিত এ কাজটি সম্পন্ন করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবী করিতে পারিবেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার
সভাপতি, প্রকাশন কমিটি
পূর্ত বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৪ বিপিন পাল রোড,
বালীগঞ্জ : কলিকাতা।

গ্রন্থকারের নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার পুরাকীর্তি থাকা সত্ত্বেও সেগুলি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ও সহজ ভাষায় লিখিত বাংলা পুস্তকের সংখ্যাল্পতায় আমার মতো অনেকেই হয়ত বিস্মিত। পেশাদার লেখক ও প্রকাশকদের কাছে এ জাতীয় গ্রন্থের মুনাফা অকিঞ্চিৎকর আর গবেষণা-অভিমানীদের কাছে এহেন গ্রন্থরচনার তাগিদে লাইব্রেরীর আরাম-কেদারা ছেড়ে, অনাহারে অনিদ্রায় গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ানোর ক্লেশ পণ্ডশ্রম মাত্র। ফলকথা, বঙ্গকৃষ্টির এই ঐশ্বর্যময় দিকটি আজও প্রায় অনুদ্‌ঘাটিত।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে, আমার বর্তমান পদে যোগ দিয়েই লক্ষ করি বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই নৈরাশ্য-জনক অবস্থার একটা বিহিত করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি বিষয়ে ম্যাপ ও আলোকচিত্রশোভিত এবং জেলাভিত্তিক এক গ্রন্থরাজি প্রকাশের যে প্রকল্প তিনি প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা ক'রে অনুমোদন করেন, বর্তমান পুস্তকটি তার প্রথম ফসল। বস্তুতঃ, এই দীর্ঘমেয়াদী, গুরুভার কাজের পরিকল্পনা ও প্রাথমিক ব্যবস্থাপনার সমস্ত কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। তিনি আমার ব্যক্তিগত ধন্যবাদজ্ঞাপনের ঊর্ধ্বে; লেখক-উপেক্ষিত, গবেষক-অনাদৃত ও প্রকাশক-পরিত্যক্ত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি সরকারী প্রচেষ্টা নিয়োগ করবার জন্য দেশবাসী ও পাঠকসাধারণ তাঁর যথোচিত সাধুবাদ করবেন।

আর প্রশংসার ভাগী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগ কর্তৃক গঠিত প্রকাশন কমিটির বেসরকারী বিশেষজ্ঞ সভ্যগণ যাঁরা স্বেচ্ছায় তাঁদের বহুমূল্য সময় ব্যয় ক'রে প্রস্তাবিত গ্রন্থরাজির প্রতিটি পাণ্ডুলিপির উৎকর্ষসাধনে প্রতিশ্রুত। এই কমিটির সভাপতি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সভ্য ডক্টর সুধীররঞ্জন দাস ও ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায় নানাবিধ সুপরামর্শ দিয়ে বর্তমান গ্রন্থটির মান উন্নয়নের জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের নির্দেশ ও সহযোগিতা ছাড়া এহেন গুরু দায়িত্ব আমি একা বহন করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ পুস্তকের 'মুখবন্ধ'টি লিখে দেবার কষ্টস্বীকার ক'রে ডক্টর মজুমদার

আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর মতো দেশবিশ্রুত জ্ঞানতপস্বীর আশীর্বাদ লাভের যোগ্য কিনা জানি না; তবে আমার এই অক্ষম প্রয়াসকে অভিনন্দিত করবার মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে তাঁর মহানুভবতাই সূচিত হয়েছে।

পূর্ত বিভাগের বর্তমান কর্ণধার, রাজ্যপালের অন্যতম উপদেষ্টা, শ্রীযুক্ত অরবিন্দকুমার ঘোষ মহোদয়ের সদা-প্রসারিত বিবিধ সাহায্যের জন্য তাঁর কাছেও আমি গভীরভাবে ঋণী।

এ পুস্তকে ব্যবহৃত উপকরণ ও আলোকচিত্র সংগ্রহের ব্যাপারে অগণিত সহযোগীর নানাবিধ সাহায্যের মধ্যে পূর্ত ও পঞ্চায়েৎ বিভাগের বহু কর্মীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। বাঁকুড়া জেলার দূরদূরান্তে বারংবার পরিভ্রমণের সময় আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসাবে সবচেয়ে বেশী শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করেছেন শ্রীমতী উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমাণিক-লাল সিংহ, মিঃ ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন ও শ্রীতারাপদ সাঁতরা। তাঁদের সঙ্গে আমার হৃদয়ের বন্ধন এতই গভীর যে তাঁদের স্নেহপ্রীতিসৌহার্দ্য কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের অপেক্ষা রাখে না।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ও পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ গ্রন্থাগারের সহৃদয় কর্তৃপক্ষের কাছেও আমি ঋণী; নানাভাবে তাঁরা আমায় সাহায্য করেছেন। 'প্রুফ' দেখার ব্যাপারে শ্রীমতী সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।

শ্রীসরস্বতী প্রেসের অন্যতম পরিচালক শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী শ্রীদীপক ঘোষ, স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানীর শ্রীহীরালাল সেনগুপ্ত, প্রচ্ছদপটশিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাজনারায়ণ ইন্দু ও ডক্টর টি. বি. লাহিড়ীর কর্মদক্ষতা ও অকুণ্ঠ সহ-যোগিতা ছাড়া ম্যাপ ও বহুচিত্রশোভিত বর্তমান গ্রন্থটি এত অল্প সময়ে এত শোভনভাবে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁরা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

পূর্ত বিভাগ:
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ভূমিকা

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ (আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া) এক শ বছরের বেশী পুরাতন ঐতিহাসিক ইমারতকে পুরাকীর্তি ব'লে গণ্য করেন। এছাড়া প্রাচীন স্তূপ, ঢিপি, জলাশয়, কবরখানা, ভাস্কর্য, পুঁথি-পুস্তক, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস প্রভৃতিও পুরাকীর্তি বা পুরা-বস্তুর পর্যায়ে পড়ে। এই সংজ্ঞা অনুসারে বাঁকুড়া তথা পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় পুরাকীর্তি ও পুরাবস্তুর সংখ্যা যে অগণিত তাতে সন্দেহ নেই। বাঙালীর এই মূল্যবান্ কৃষ্টিসম্পদের পূর্ণ বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া যতই কেননা কাম্য হোক, বর্তমান পুস্তকের ভূমিকায় প্রথমেই একথা ব'লে রাখা প্রয়োজন যে এহেন বহুজনসাধ্য, দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধানের সুযোগ না থাকায়, এ বই পুরাপুরিভাবে সে অভীষ্ট সাধনের জন্য লিখিত হয়নি। পুরাবস্তুর প্রসঙ্গ মোটামুটি বাদ দিয়ে, পুরাকীর্তির তালিকা এখানে সৌধ, ভাস্কর্য, ঢিপি ইত্যাদিতেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। এ পুস্তকে আলোচিত পুরাকীর্তির বিবরণগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ; অল্প কয়েকটি স্থানের তথ্য সহাধ্যায়ী সুহৃদ্ শ্রীমাণিকলাল সিংহ, মিঃ ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন ও শ্রীতারাপদ সাঁতরা সরবরাহ ক'রে বইটিকে পূর্ণাঙ্গ করতে সাহায্য করেছেন। অন্যের প্রকাশিত লেখার ওপর নির্ভর না ক'রে—তার প্রয়োজনও বিশেষ হয়নি—'ফিল্ড-ওআর্ক'কেই এখানে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার যাবতীয় পুরাকীর্তি এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এমন অসম্ভব দাবী কখনই করা যায় না ; তবু কয়েক বছরের প্রায় একক পরিশ্রম সরেজমিনে নিযুক্ত হওয়ার দরুন বাঁকুড়া জেলার প্রধান ও উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তিগুলির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ যে এখানে উপস্থিত করবার ঐকান্তিক চেষ্টা করা হয়েছে এমনই আমার বিনীত বিশ্বাস। গ্রন্থাগারনির্ভর, কেতাবী গবেষকদের জন্য এ বই লেখা হয়নি, যদিও এ থেকে তাঁরা নিরুপদ্রবে উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন। যে কাজ আমার একার দ্বারা সম্পূর্ণ হ'ল না, সেই বিরাট কাজে আরও পাঁচজনের সক্রিয় মনোযোগ আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। অশেষ ক্লেশে গ্রামগ্রামান্তরে সফর ক'রে যাঁরা দেশকে চিনতে আগ্রহী (দেশকে চিনবার আর কোন বিকল্প পদ্ধতি আমার

জানা নেই), তাঁদের কাছে এ বইটি যদি আরও বিস্তৃত অনুসন্ধানের প্রেরণা যোগায় তবেই আমার শ্রম সার্থক।

বাঁকুড়া জেলার সীমানা এখন যেভাবে চিহ্নিত সেই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে স্বতন্ত্র কোনও ধর্মমত, লোকসংস্কৃতি, স্থাপত্যশৈলী বা ভাস্কর্যরীতি যে আপন বৈশিষ্ট্যে একদা বিকশিত হয়েছিল একথা কখনই বলা যায় না। বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চলের ও তারও পশ্চিমের সিংভূম-মানভূম-ঝাড়খণ্ড এলাকার এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের উড়িষ্যা রাজ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতির স্রোত আবহমানকাল প্রবাহিত হয়েছে এই ভূভাগের ওপর দিয়ে। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গ ও ভাগীরথীর ওপার থেকে উন্নততর আর্য সভ্যতার অনুপ্রবেশও এ অঞ্চলে বহু শতাব্দীর। বাঁকুড়া জেলার সন্নিহিত পশ্চিমের বিস্তীর্ণ বনভূমিতে অনার্য জাতিরা বাস ক'রে এসেছে চিরকাল; আর পুব ও দক্ষিণের বঙ্গ ও কলিঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে আর্য সভ্যতার বিকাশ যে কতদিনের তা সঠিকভাবে বলা যায় না। বিপরীতধর্মী এই দুই কৃষ্টির সংঘাত ও সমন্বয়ের ক্ষেত্র হল মধ্যবর্তী রাঢ় প্রদেশ। সেই রাঢ়ের আবার মধ্যবিন্দু বর্তমানের বাঁকুড়া জেলা। অজয়-পারের বীরভূম যেমন উত্তর-রাঢ়, শিলাবতীর দক্ষিণে মেদিনীপুর যেমন দক্ষিণ-রাঢ়, ছোটনাগপুর-সন্নিহিত অরণ্যপর্বতাঞ্চল যেমন পশ্চিম-রাঢ় এবং পূর্ব-রাঢ় যেমন ভাগীরথী-অভিমুখী ক্রমনিম্ন সমভূমি, তেমনই এসব প্রান্তের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত ব'লে বাঁকুড়া অঞ্চল মধ্য-রাঢ়। বলা বাহুল্য, চারিদিকের সংস্কৃতির বাতাস যে এই মধ্যবিন্দুকে স্পর্শ ক'রে বইবে এমনই স্বাভাবিক। ফলে, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তিগুলি যে ধ্যানধারণার ফলশ্রুতি তার উদ্ভব ও পুষ্টি হয়েছে বহু যুগের বিভিন্ন কৃষ্টিধারার সমন্বয়ে। সেই যৌথ সংস্কৃতিতে আর্য সভ্যতার ছাপ যেমন স্পষ্ট, অনার্য সভ্যতারও তার চেয়ে কিছু কম নয়। বর্তমান পুস্তকে আলোচিত বিষয়বস্তু সম্যক্‌ভাবে বুঝতে হলে এই প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি সম্বন্ধে অবহিত থাকা খুবই প্রয়োজন।

বাঁকুড়া অঞ্চলে জৈনধর্মের বিকাশ ও অবনতি : সভ্যতা-বিকাশের আদিকাল থেকে বাঁকুড়া অঞ্চলের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। জৈন ধর্ম-সাহিত্যের প্রাচীন ও প্রধান গ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সুত্ত' যে অনেকাংশে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের আগেই রচিত হয়েছিল অধ্যাপক জেকবি সেকথা সন্তোষজনকভাবেই প্রমাণ করেছেন। সে পুস্তক থেকে জানা যায়, জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর কেবলজ্ঞান লাভ করবার পূর্বে কিছুদিন প্রাচ্য দেশের সুব্বভূমি, লাঢ় ও বজ্জভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে

পরিভ্রমণ করেছিলেন। সেসব প্রদেশের অধিবাসীরা তখন খুবই অনুন্নত ছিল। তারা মহাবীরের ওপর ঢিল ছুঁড়েছিল, কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল ও অন্যভাবে অত্যাচার করেছিল। 'লাঢ়' যে রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীন নাম তাতে সন্দেহ নেই। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, মহাবীরের সময়ে বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চল ছিল ঘোরতর অসভ্য ও পশ্চাৎপদ এবং মহাবীরের মাধ্যমে আর্য অনুপ্রবেশ প্রথম সূচিত হলেও সে সভ্যতার সেখানে আশু প্রতিষ্ঠার তখন কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মহাবীরের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪০-৪৬৮ অব্দ বলে নির্ণয় করেছেন। 'আচারাঙ্গ সূত্তে'র নজিরে প্রমাণ হয় যে আড়াই হাজার বছর আগে আর্য সভ্যতা রাঢ় অঞ্চলে প্রবেশের ছাড়পত্র তো পায়ইনি, বরঞ্চ উগ্রভাবেই প্রতিহত হয়েছিল। কিন্তু আদি জৈনধর্ম প্রচারকেরা এই বিরূপতা সত্ত্বেও তাঁদের ধর্ম প্রচার থেকে বিরত হননি বলেই মনে হয়। কেননা, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে, "বঙ্গদেশে জৈনধর্ম অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। আর উত্তরবঙ্গে যে সে সম্প্রদায়ের প্রভাব খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রবল ছিল তার প্রমাণ হিউয়ান সাং-এর বিবরণী হতেই পাওয়া যায়। তাঁর সময়েও পুণ্ড্রবর্ধন নগরে (বর্তমানে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়) নির্গন্থদের (অর্থাৎ জৈনদের) সংখ্যা ছিল অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে বেশী।" ('বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ' : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৬, প্রথম সংখ্যা)। জৈনদের ধর্মগ্রন্থ 'জৈনকল্পসূত্র', 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' প্রভৃতি থেকেও জানা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব কালেই পুণ্ড্রবর্ধন প্রাচ্যদেশে জৈনধর্মের সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। এসব ও অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ডক্টর রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর বলেছেন, "প্রাচ্যদেশ জৈনধর্মের দ্বারাই আর্যীকৃত হয়েছিল।"

সভ্যতার উন্মেষকালেই জৈনধর্মের প্রথম তরঙ্গ বাংলাদেশে এসে পৌঁছলেও খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী নাগাদ এ ধর্মের প্রভাব একমাত্র রাঢ় ভূখণ্ড ছাড়া বঙ্গদেশের অন্যান্য অংশ থেকে প্রায় লুপ্ত হয়। এর প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে বলা যায় যে, প্রথমতঃ, পাল রাজবংশ ধর্মবিষয়ে উদার মতাবলম্বী হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন; দ্বিতীয়তঃ, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেশব্যাপী পুনরুত্থানও বাংলাদেশে জৈনধর্মের অবনতি ঘটায়। পরবর্তী সেন-রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের অনুরক্ত ছিলেন ব'লে তাঁদের সময়ে জৈন

ও বৌদ্ধ দুই ধর্মমতই বিশেষভাবে হীনবল হয়ে পড়ে। কিন্তু সেন আমলেও জৈনধর্ম, তুলনায়, বৌদ্ধধর্ম থেকে বেশী সজীব ছিল ব'লে মনে হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মিডিভ্যাল স্কাল্পচার' গ্রন্থে বলেছেন যে "সে সময়ে এ ধর্মের প্রভাব গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পশ্চিম তীর থেকে গোন্দ্ জাতি অধ্যুষিত গন্দোয়ানা প্রদেশের অরণ্যাবৃত উত্তর সীমা অবধি বিস্তৃত ছিল।" মোটামুটিভাবে, এ অঞ্চলকেই আমরা রাঢ় দেশ ব'লে চিহ্নিত করেছি।

রাঢ়দেশে, বিশেষ ক'রে তার সন্নিহিত পশ্চিমে মানভূম-সিংভূম-পরেশনাথ অঞ্চলে, জৈনধর্মের প্রায় দেড় হাজার বছরের এই অবস্থিতি যে বাঁকুড়া জেলার স্থাপত্য-ভাস্কর্যকে কতদূর প্রভাবিত করেছে সেকথা সেখানকার পুরাকীর্তিগুলির আলোচনার সময়ে বারংবার পরিস্ফুট হবে। পশ্চিমের এই এলাকা একদা মগধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সে রাজ্যের অনেকাংশ যে জৈনধর্মের লীলাভূমি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আজকের হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ পাহাড়কে জৈনরা সমেত-শিখর বলেই জানেন। তাঁদের বিশ্বাস, মোট চব্বিশজন জৈন তীর্থংকরের মধ্যে কুড়িজনই সেখানে সিদ্ধিলাভ করেন। সমেতশিখর ও সন্নিহিত অঞ্চলের কেন্দ্রভূমি থেকে ব্যাপ্ত হয়ে জৈনধর্মস্রোত, অরণ্যের বাধা অতিক্রম ক'রে, প্রধান নদীপথগুলি বরাবর যে বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করেছিল এমনই মনে হয়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের স্বনামধন্য মিঃ বেগলার অবশ্য এই প্রসারের সহায়ক কিছু কিছু প্রাচীন পথঘাটও আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু মুখ্যতঃ দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী ও কংসাবতী প্রভৃতি প্রধান নদীগুলিকে অবলম্বন করেই এ অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়েছিল। বাঁকুড়ার প্রাচীনতম পুরাকীর্তি-গুলি এসব নদী, বিশেষতঃ দ্বারকেশ্বরের তীরেই অবস্থিত। এসব সংস্কৃতি-প্রবাহপথের আশেপাশেই যে সে যুগের কৃষ্টির ফসলগুলির দেখা মিলবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বাঁকুড়ার নদীতীরবর্তী পুরাকীর্তিগুলির কথা যখন আলোচনা করব তখন এ বিষয়ে আরও বিস্তৃতভাবে বলবার অবকাশ হবে।

বাঁকুড়া অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস ও মল্ল রাজবংশ : খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী অবধি বাঁকুড়া অঞ্চলের ধর্মীয় ইতিহাস মোটামুটিভাবে জৈনধর্মের বিকাশ ও অবনতির ইতিহাস। সে ধর্মের জীবদ্দশায় তার অঙ্গ থেকে পুরাকীর্তিরূপে যেসব আভরণ খসে পড়েছিল এখানে সেখানে, সেগুলির অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা থেকে সমকালীন

সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা কাঠামো তৈরি করা যায় মাত্র। তারপরে, প্রায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই ভূভাগের ইতিবৃত্ত খুবই অস্পষ্ট। এ অঞ্চলের ইতিহাস আলোচনাপ্রসঙ্গে এল. এস. এস. ও'ম্যালীর বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে একথা স্পষ্টই স্বীকার করা হয়েছে যে নির্ভরযোগ্য উপাদানের অভাবে বৃটিশ আমলের পূর্ববর্তী বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস স্থানীয় মল্ল রাজবংশের উত্থান-পতনের ইতিহাসের সমার্থক। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন—"বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজারা দাবী করেন যে তাঁদের রাজবংশের উৎপত্তিকাল সেই সময়ে যখন দিল্লীতে হিন্দু রাজারা সমাসীন এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের নামগন্ধও শোনা যায়নি। বস্তুতঃ, বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর বঙ্গবিজয়ের পূর্বে অন্যূন পাঁচ শতাব্দীকাল ধ'রে এ রাজবংশ যে বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে প্রভুত্ব করেছেন, সেটিই তাঁদের বক্তব্য। বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের প্রবর্তনেও বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতাপের কোন তারতম্য হয়নি। বিষ্ণুপুরের সুদৃঢ় দুর্গ, দামোদর প্রভৃতির মত খরস্রোতা নদী ও সুবিস্তৃত শাল অরণ্য দ্বারা সুরক্ষিত এ অঞ্চলের রাজন্যবর্গের সঙ্গে বঙ্গদেশের উর্বর অংশের মালিক মুসলমানেরা কদাচিৎ বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেজন্য বিষ্ণুপুরের নৃপতিরা তাঁদের নিজ এলাকায় বহু শতাব্দীকাল রাজত্ব করতে পেরেছেন একচ্ছত্র প্রতাপে। মুসলমান শাসনের শেষভাগে যখন মুঘল শক্তি প্রায় সর্বব্যাপী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে, তখন রণোন্মুখ কোন মুঘল সেনাবাহিনী কালেভদ্রে হয়ত বিষ্ণুপুর অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে বশ্যতা-পণ দাবী করেছে এবং এ রকম নজরানা সম্ভবতঃ দেওয়াও হয়ে থাকবে। কিন্তু বর্ধমান ও বীরভূমের আধুনিক কালের দুটি রাজবংশের উপরে মুর্শিদাবাদের সুবাদারেরা যে পরিমাণ যথেচ্ছ কর্তৃত্ব করতে পেরেছেন, বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের উপর তা কখনই পারেননি। মুসলমান শাসনের অবসানকালে, বর্ধমান রাজকুলের ক্ষমতাবৃদ্ধির কারণে, বিষ্ণুপুর রাজবংশের পতন শুরু হয়। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদ বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ ক'রে বিস্তীর্ণ এলাকা নিজের জমিদারির শামিল করে নেন। তারপরে, মারাঠাদের অত্যাচারে প্রাচীন বিষ্ণুপুর রাজবংশের বিনাশ সম্পূর্ণ হয়। বর্তমানে, হৃতগৌরব বিষ্ণুপুর রাজ্য এক সামান্য দরিদ্র জমিদারী মাত্র।" সে জমিদারীও এখন নেই; ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জমিদারী বিলোপ আইনে তারও আয়ু ফুরিয়েছে বহুকাল। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, জামকুঁড়ি, কুচিয়াকোল,

ইঁদাস প্রভৃতি স্থানে মল্ল রাজপরিবারের বিভিন্ন শাখার বংশাবতংসেরা যৎসামান্য ভূসম্পত্তির আয় অবলম্বন ক'রে নিম্নমধ্যবিত্ত নাগরিক হিসেবে এখনও টিকে আছেন কোন গতিকে। খুব সংক্ষিপ্ত হলেও, মল্লভূম তথা বাঁকুড়া অঞ্চলের এই-ই হল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাস।

ধর্মীয় বিবর্তনের ছাপ বাঁকুড়ার পুরাকীর্তিগুলির উপর কিভাবে ও কতটা পড়েছে সেকথা আগেই কিছু কিছু বলেছি; পরেও বলব। রাজনৈতিক দিকের ফলাফলগুলিও বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যেতে পারে। খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের প্রায় শেষ অবধি মল্ল রাজবংশ একচ্ছত্র প্রতাপে নিজ রাজত্ব শাসন করবার সুযোগ পেয়ে বহুবিধ কৃষ্টিমূলক ও জনহিতকর কাজে হাত দিতে পেরেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এবং বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের অনুশীলন, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতসাধনা, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি নানা সৎ প্রয়াসে বঙ্গসংস্কৃতিভাণ্ডার পূর্ণ করবার যে সুযোগ এ রাজকুল পেয়েছেন তা যে দীর্ঘকালের সামরিক ও রাজনৈতিক শান্তি ও স্থায়িত্বের ফলস্বরূপ সেকথা কে অস্বীকার করবে? বলা বাহুল্য, কোন উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক কীর্তি, বিশেষতঃ ব্যয়সাধ্য পুরাকীর্তি প্রভৃতির নির্মাণ, প্রয়োজনীয় অবসর ও বিত্ত ভিন্ন সম্ভব নয়। মল্ল রাজবংশের অদৃষ্টে এ দুটিই জুটেছিল যথেষ্ট পরিমাণে। ফলে, পাল ও সেন যুগের পরে বাংলাদেশে যা কিছু মহৎ স্থাপত্যকীর্তি রচিত হয়েছে তার অনেকগুলির জন্য মল্ল রাজারাই দায়ী। সুলভ কিন্তু ভঙ্গুর ইটের বদলে ব্যয়বহুল অথচ দীর্ঘস্থায়ী পাথরের ব্যবহার এ রাজবংশ যতটা করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে আর কোন গোষ্ঠী তেমনটি করেছেন কিনা সন্দেহ। হিন্দু মন্দিরের একরত্ন স্থাপত্যশৈলীটিও এ রাজকুলের অবদান। বিষ্ণুপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের পাথরের দেবালয়গুলির বর্ণনাপ্রসঙ্গে এসব বিষয় আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার অবকাশ হবে। প্রসঙ্গতঃ, একথা অনায়াসেই বলা চলে যে চিরকালের দরিদ্র এ দেশে কেবল বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালীরাই মহৎ স্থাপত্যকীর্তি রচনার সুযোগ পেয়েছেন। ধর্মপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষও মন্দির মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণ করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যয়স্বল্পতার জন্য সেগুলি আয়তনে ছোট হয়েছে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশী দিন টেকেনি।

বাঁকুড়া অঞ্চলে ধর্মীয় বিবর্তন: সাধারণ মানুষ উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি রচনার যথেষ্ট সুযোগ না পেলেও তাঁদের ধ্যানধারণা, তাঁদের আচার-অনুষ্ঠান সমকালীন ধর্মচিন্তাকে কতখানি প্রভাবিত

করেছে সে প্রসঙ্গটিও আলোচনার যোগ্য। বস্তুতঃ, রাজারাজড়ার কাহিনীই যে জাতির ইতিহাসের সবখানি নয়, জনসাধারণেরও যে তাতে যথেষ্ট অবদান আছে, আধুনিক ঐতিহাসিকদের কাছে এ সত্য এখন স্বীকৃত। ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাব থেকে দেখা যায় যে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪২ ভাগ হয় আদিবাসী উপজাতি, নয় হিন্দু সমাজভুক্ত তফসিলী সম্প্রদায়। অতীতে এই অনুপাত যে আরও বেশী ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কেননা বাঁকুড়া জেলায় প্রভূত পরিমাণে বর্ণহিন্দুদের অনুপ্রবেশ মাত্র কয়েক শতাব্দীর ঘটনা। স্থানীয় আদিবাসীরাই এ এলাকায় বসবাস ক'রে এসেছেন চিরকাল। বহিরাগত উন্নততর সভ্যতা থেকে তাঁরা যেমন নিয়েওছেন অনেক তেমনি দিয়েওছেন কিছু কম নয়। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'দি অ্যাবরিজিন্যাল এলিমেন্ট ইন দি পপুলেসন অব বেঙ্গল' নামক প্রবন্ধে শুধু এই নেওয়ার দিকটাই বিশ্লেষণ ক'রে বলেছিলেন—"সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই অর্ধ-হিন্দু আদিবাসীরা প্রতিদিনই হিন্দুধর্মের নিকটবর্তী হচ্ছে। তাদের মধ্যে যারা বেশী অগ্রসর ও সম্মানিত, তারা যে ইতিমধ্যেই হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করেছে একথা বলা চলে। পক্ষান্তরে, যারা অতিশয় পশ্চাৎপদ, তারাও হিন্দুধর্মীয় আচার-বিচারের কিছু না কিছু গ্রহণ করেছে।" দেওয়ার দিকে, আদিবাসীরা বর্ণহিন্দুদের ধর্ম-জগতে তাঁদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা, এমন কি কিছু কিছু লৌকিক দেবদেবীকেও অনুপ্রবিষ্ট করাতে পেরেছেন। ধর্মরাজ, মনসা, পশুপতি (শিব), চণ্ডী প্রভৃতিরা এ অঞ্চলে বহুদিন ধরেই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদেরও আরাধ্য। স্থানীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ওপরেও যে এই সমীকরণের প্রভাব পড়েনি এমন নয়। সাবেক প্রথায় গাছতলায় বা মাটির বেদীতে উপাসিত এসব দেবদেবীর কৌলীন্যলাভের ফলে পৌরাণিক দেবদেবীরাও কিছুটা লৌকিকতার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হয়েছেন। একেবারে গাছতলায় স্থানান্তরিত না হলেও সাধারণ দালান মন্দিরে তাঁদের আরাধনায় কেউ ত্রুটি ধরেনি। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে, কি পৌরাণিক কি লৌকিক দেবতাদের জন্য সমতল ছাদের দালান মন্দিরের যে ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় তা যে আর্য ও আর্যেতর ধর্মসমন্বয়ের প্রত্যক্ষ ফল এমন মনে করা হয়ত অসমীচীন হবে না। এ সব অনাড়ম্বর দেবালয়ের দৃষ্টান্ত কাছেপিঠে থাকবার ফলে, অন্য শৈলীর মন্দিরাদিও আকার-প্রকারে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি, যদিও উপকরণগত বা অন্য-

কারণও তাদের নির্মাণ-প্রকরণকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত করেছে। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও এসব অ-কুলীন দেবদেবীমূর্তি কিছু কম সমাদৃত হয়নি। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তিগুলির ক্রমিক আলোচনাপ্রসঙ্গে এবিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে বলবার অবকাশ হবে।

আর্য-অনার্য ধর্মচিন্তার এহেন মিশ্রণ ছাড়াও এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মও যুগে যুগে বেশ কিছু বিবর্তিত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত শুশুনিয়া পাহাড়ের রাজা চন্দ্রবর্মার বিখ্যাত শিলালিপিটির নজিরে একথা প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই এ এলাকায় বিষ্ণু (বাসুদেব) পূজা সম্ভবতঃ সুপ্রচলিত ছিল। বাঁকুড়া জেলার ইতস্ততঃ প্রাপ্ত বহু বাসুদেব মূর্তি থেকেও মনে হয় জৈন ধর্মের প্রতাপের কালেও হিন্দু উপাসনার এই প্রাচীন ধারাটি কিছুমাত্র শুখিয়ে যায়নি। প্রসঙ্গতঃ, এ জেলার সীমানার মধ্যে বৌদ্ধমূর্তি খুব কমই পাওয়া গিয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জয়পুর গ্রামে এক বুদ্ধমূর্তিকে ধর্মরাজজ্ঞানে পূজা করা হয় বলে উল্লেখ করেছিলেন। এ জেলার দূরদূরান্তে বিস্তৃত সফরকালীন আমিও দু'তিনটির বেশী বৌদ্ধমূর্তি দেখিনি। এ থেকে পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষিত বৌদ্ধধর্মের স্থানীয় প্রভাব যে বেশী ছিল না এমনই মনে হয়। সে যাই হোক, খ্রীষ্টীয় বারো শতক নাগাদ জৈনধর্মের লোপ ও ষোল-সতের শতক নাগাদ শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠার মাঝখানের চার-পাঁচ শতাব্দী-কাল এ এলাকার হিন্দুরা যে প্রধানতঃ শিব, বিষ্ণু (বাসুদেব) ও শক্তির আরাধনাই করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। স্বভাবতঃই, সে সময়ে এসব দেবদেবীর বহু নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ছাড়াও পূর্বতন জৈনকেন্দ্রের অনেকগুলিই তাঁদের উপাসনাস্থলে পরিণত হয় ও এখনও সেই অবস্থাতেই আছে। তারপরে, চৈতন্য-পরবর্তী কালে, বাসুদেবভক্তির প্রাচীনতর ধারাটি ধীরে ধীরে শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত রাধাকৃষ্ণের লীলামূর্তির উপাসনায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে। যে ঘটনা এই ধর্মীয় দিক্-পরিবর্তনে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করে তা হল ষোড়শ শতকের শেষ দিকে প্রবলপ্রতাপ মল্ল রাজা বীর হম্বীরের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা ও এ ধর্মে তাঁর বংশধরদের স্থায়ী ও অচলা ভক্তি। প্রধানতঃ তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় সে সময়ে নতুনতর আঙ্গিকে বহু মন্দির নির্মিত হয় মল্লভূমের সর্বত্র। সেগুলির অধিকাংশই এখনও বর্তমান। ধর্মের গতি-পরিবর্তনের প্রভাব যে ধর্মীয় ইমারতগুলির ওপর কতখানি পড়ে সে প্রশ্নের আর একটু বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বাসুদেব দূর স্বর্গলোকবাসী এক মহামহিমান্বিত দেবতা জ্ঞানেই কল্পিত ও পূজিত হয়ে এসেছেন। চৈতন্যদেব এই দূরস্থিত দেবতাকে সুরলোকের নির্বাসন থেকে উদ্ধার ক'রে, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার নিগড় থেকে মুক্ত ক'রে, বাঙালীর ঠাকুর-ঘরে, তার স্নেহপ্রীতিবাৎসল্যময় অন্তরের একেবারে মাঝখানটিতে বসিয়ে দিলেন। গদা, চক্র প্রভৃতি ভীষণ আয়ুধ খসে প'ড়ে তাঁর হাতে দেখা দিল মোহন বাঁশরী। এতদিন তিনি একক পূজিত হয়েছেন ; এখন তাঁর হ্লাদিনী শক্তির মূর্তিমতী প্রকাশরূপে রাধিকা এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। যাঁর নাম এতদিন ছিল বাসুদেব, নারায়ণ, জনার্দন, তাঁরই নাম হল কালোসোনা, ননীচোরা, শ্যামরায়। শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির প্লাবন যখন শান্তিপুরকে ডুবিয়ে ন'দে তথা বাংলাদেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তখন সমকালীন অন্য লোকপ্রিয় দেবদেবীরাও তাঁদের মন্দির-কারাগার ত্যাগ ক'রে বাঙালীর অন্দর মহলের অন্তরঙ্গতায় এসে প্রবেশ করলেন। মুণ্ডমালাশোভিতা, লোলজিহ্বা, ভীষণদর্শনা কালী পরিণত হলেন সাধকের মা অথবা মেয়েতে। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধিকর্তা শিব জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গেলেন এক আত্মভোলা, বাউণ্ডুলে খ্যাপার বেশে। আর দুর্গা? বৎসরান্তে মাত্র তিন দিনের জন্য সে দুলালীর পিতৃগৃহে আসবার আশায় বাঙালী দিন গুণতে আরম্ভ করল। এত যাঁরা কাছের, এত যাঁরা আপন, তাঁদের পাষাণে রচিত মজুবত কয়েদখানায় বন্দী ক'রে রাখতে বাঙালীর প্রাণ চায়নি। তার মন্দিরাদি সেজন্য তার নিজ বাসগৃহের অনাড়ম্বর ও লঘু আকৃতির সাদৃশ্যেই গ'ড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে, বিশেষ ক'রে বাঁকুড়া এলাকায়, বহিরাগত মন্দির-স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব যে পড়েনি এমন নয় ; বরং বেশী ক'রেই পড়েছে। কিন্তু তা সত্বেও ঈশ্বরকে কাছের মানুষ, প্রাণের মানুষ ভেবে বাঙালীর মনীষা যে 'চালা-স্থাপত্য' শৈলীর সৃষ্টি করেছিল তারও অগণিত দৃষ্টান্ত আজকের বাঁকুড়া জেলায় বর্তমান। রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে পশ্চিমবঙ্গের এ অঞ্চলকে বারংবার উড়িষ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে হয়েছে। ফলে, বহিরাগত এক স্থাপত্যরীতি সহজেই ছাড়পত্র পেয়েছে এই ভূখণ্ডে। সেজন্য, ভৌগোলিক ও কৃষ্টিগত উভয় অর্থেই সীমান্তবর্তী এ জেলায় উড়িষ্যা-রীতির ও বাংলা-রীতির বহু মন্দিরের যুগপৎ দেখা মেলে।

বাঁকুড়া অঞ্চলের মন্দির-স্থাপত্য রীতি : ভারতীয় দেবালয়-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে 'নাগর', 'বেসর' ও 'দ্রাবিড়' নামে যে তিনটি প্রধান

শৈলী স্বীকৃত, তার মধ্যে প্রথমটি, মোটামুটিভাবে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী ভূভাগে, দ্বিতীয়টি বিন্ধ্য পর্বত থেকে কৃষ্ণা নদী অবধি অঞ্চলে ও তৃতীয়টি কৃষ্ণার দক্ষিণে বিকশিত হয়েছিল। এই ভৌগোলিক সীমারেখা অবশ্য খুবই আনুমানিক; এক বিভাগের শৈলী যে অন্য বিভাগে প্রবেশ করেনি এমন নয়, বরং বহুক্ষেত্রেই করেছে। উড়িষ্যায় অনুসৃত 'নাগর' শৈলীটি কিন্তু আদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলায় অনুপ্রবেশ করেনি। সে নির্মাণ-প্রকরণের প্রধান লক্ষণগুলি হল সুউচ্চ শিখর-সংলগ্ন জগমোহন, তার সামনের নাটমণ্ডপ ও ভোগমণ্ডপ, একাধিক উপ-মন্দির ও প্রাকারবেষ্টিত প্রশস্ত অঙ্গন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের পশ্চিম অংশে খিচিং-এ পরবর্তীকালে যে মন্দিরস্থাপত্যশৈলীটি পুষ্টিলাভ করেছিল তাতে এই অনাবশ্যক আড়ম্বরের দিকটি বর্জিত; খ্রীষ্টীয় এগারো ও বারো শতকে নির্মিত সেখানকার দেবালয়গুলি আকারে অনেক ছোট ও কোনটিরই জগমোহন ইত্যাদি নেই। তুলনায় সরলীকৃত এই স্থাপত্যরীতিটি বাঁকুড়া অঞ্চলের মন্দির-প্রতিষ্ঠাতাদের ঈশ্বরচিন্তার পরিপোষক ও ব্যয়ের দিক থেকে সাধ্যানুযায়ী হওয়াতে সেটিই এখানে সমাদৃত হয়েছে। বাঁকুড়ার রেখ-দেউলগুলির ক্রমিক আলোচনার সময় দেখা যাবে যে সেখানে এই অনাড়ম্বর রীতিটির ব্যতিক্রম কয়েকটির বেশী নেই। পার্সি ব্রাউনের মতে উড়িষ্যার সাবেক 'নাগর'শৈলী আর রাঢ়দেশের মন্দিরনির্মাণপদ্ধতির মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছে খিচিং-এর এই দেবালয়গুলি। আবার, রমাপ্রসাদ চন্দ মনে করেন, বাহুল্যবর্জনের এই প্রয়াস শুদ্ধাভক্তি বিকাশের বেশী সহায়ক। ('নোট অন দি এনসিয়েন্ট মনুমেন্টস অব ময়ূরভঞ্জ': জর্নাল অব বিহার অ্যাণ্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি: জুন, ১৯২৭)।

উড়িষ্যার এই প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিকে পর্যায়ক্রমে কতদূর স্পর্শ করেছে সে প্রসঙ্গও চিত্তাকর্ষক। মেদিনীপুর একেবারে কাছের জেলা ব'লে প্রভাবিত হয়েছে সবচেয়ে বেশী। সেখানে উড়িষ্যা-রীতির রেখ-দেউলের ছড়াছড়ি এবং সে রীতি অনুযায়ী তাদের অধিকাংশই আবার পাথরে নির্মিত। বাংলাদেশের চালা-শৈলীর দেবগৃহ যে সেখানে নেই তা নয়, তবে তাদের সংখ্যা তুলনায় কম। বস্তুতঃ, মেদিনীপুরকে এ বিষয়ে উড়িষ্যার অঙ্গীভূত বললে খুব অত্যুক্তি করা হয় না। কিন্তু উড়িষ্যা থেকে দূরত্ব যতই বেড়েছে এ প্রভাব ততই কমেছে দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলা অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী হওয়ায় সেখানে বাংলা-রীতির প্রাধান্য অনেক বেশী। আরও দূরের জেলা, হাওড়া, হুগলী ও

বর্ধমানে, উড়িষ্যার রেশ খুবই কম এবং বহু তফাতে, বীরভূম, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে নেই বললেই চলে। মন্দির-স্থাপত্যে এই দুই পদ্ধতির মিলনক্ষেত্র হিসাবে বাঁকুড়া সেজন্য এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

বাংলাদেশের নিজস্ব মন্দির-স্থাপত্যশৈলীকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) চালা মন্দির (এ শ্রেণীতে দোচালা, জোড়-বাংলা, চারচালা, আটচালা, বারোচালা সবই পড়ে), (২) রত্ন-মন্দির (এই পর্যায়ের দেবগৃহে এক বা একাধিক চূড়া থাকে) ও (৩) দালান মন্দির (সামনে খিলানযুক্ত বারান্দাসমেত সমতল ছাদের দেবালয়)। এছাড়া অভিনব গঠনের দৃষ্টান্তও কিছু কিছু মেলে, যেমন বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ বা মল্লেশ্বর শিবের মন্দির। কিন্তু সংখ্যায় তারা এতই নগণ্য যে তাবা ব্যতিক্রম মাত্র, বিশেষ কোন স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন নয়। বাংলাদেশে পাথর যে খুবই অপ্রতুল সেকথা সকলেই জানেন। ইটের মন্দিরের সেজন্যই এখানে আধিক্য। সহজলভ্য এই মূল উপকরণের ব্যবহার যখন শুরু হল, তখন বাঙালীর চিরকালের বাসগৃহ কুঁড়েঘরের সবচেয়ে সরল রূপ দোচালার আদলেই যে প্রথম মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল এমনই মনে হয়। তারও আগে বাঁশ-খড়-কাঠের তৈরী অনুরূপ দেবালয়ই সম্ভবতঃ বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। দোচালা শৈলীর দেবগৃহ বাঁকুড়া জেলায় এখন অল্পই আছে। বিষ্ণুপুরের গোঁসাইপাড়ায় শ্যামচাঁদ মন্দির ও কয়েকটি পাথরের দেবালয়ের ভোগ-মণ্ডপ এই আকৃতির হলেও এ জাতীয় মূল মন্দির বর্তমানে এ জেলায় আর আছে কিনা সন্দেহ। দোচালা শ্রেণীর মন্দির যে একদা বাঁকুড়ায় কিছু কিছু তৈরি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রাচীনতম রীতির হওয়ার দরুণ ও বিন্যাসের দিক থেকে কম পোক্ত ছিল বলে তাদের অধিকাংশই হয়ত বিনষ্ট হয়েছে। এ শৈলীর প্রধান লক্ষণ চালার বাঁকানো শীর্ষ ও কার্নিস যা যাবতীয় চালা-স্থাপত্যের ইমারতেই অল্লাধিক অনুসৃত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, এই বিশেষ নির্মাণ-রীতিটি মুঘল স্থপতিদের কাছেও খুবই সমাদৃত হয়েছিল যার নিদর্শন মুঘল শক্তির কেন্দ্রগুলিতে ও রাজস্থানের বিভিন্ন শহরে এখনও দেখা যায়।

'জোড়-বাংলা' রীতিটি দোচালা বা 'এক-বাংলা' রীতিরই পরিবর্ধিত ও উন্নততর রূপ। পাশাপাশি দুটি দোচালাকে স্থাপন ক'রে তাদের শীর্ষে কখনও এক সংযোগকারী চূড়া নির্মাণ করা হ'ত, কখনও বা হ'ত না। ইমারতটি এতে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়বদ্ধ হলেও, কি বাঁকুড়ায় কি

পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র এ রীতিটি বিশেষ অনুসৃত হয়নি। আজকের বাঁকুড়ায় এহেন মন্দির দু'একটির বেশী নেই।

গ্রাম-বাংলার সর্বত্র খড়ের যে চারচালা কুটিরগুলি দেখা যায়, চারচালা মন্দির তারই অনুকরণে নির্মিত যদিও অঞ্চল ভেদে দেওয়াল-গুলির উচ্চতা বা চালাগুলির দৈর্ঘ্যপ্রস্থের বেশ পার্থক্য নজরে পড়ে। এখানেও চারটি চালের নীচের প্রান্ত বরাবর কার্নিসের বক্র রেখা লক্ষণীয়। বস্তুতঃ, বাংলা-মন্দিরের যাবতীয় শ্রেণীর প্রধান বিশেষত্ব এই বাঁকানো কার্নিস। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে বারিধারার অনায়াস-পতনের জন্যই এহেন কার্নিসযুক্ত ঢালু ছাদের প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু চালা-মন্দিরের ক্ষেত্রে বাস্তুবিদ্যাগত কারণে তার প্রয়োজন থাকলেও রত্ন-মন্দিরেও বাঁকানো কার্নিস ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও সেখানে তার বিশেষ উপযোগিতা ছিল না। চারচালা মন্দির বাঁকুড়া জেলায় এখন নেই বললেই চলে; বিষ্ণুপুর থানার অতি দুর্গম এক স্থানে, বাসুদেবপুরে, ও পাত্রসায়ের থানার নারিচা গ্রামে, পাথরের তৈরি এহেন দুটি দেবালয় ছাড়া আর কোন দৃষ্টান্ত আছে বলে আমার মনে হয় না।

আটচালা মন্দির চারচালারই পরিবর্ধিত রূপ; নীচের চারটি ঢালু চালের ওপরে অল্প উচ্চতার চারটি খাড়া দেওয়াল তুলে তার ওপর দ্বিতীয় স্তরের আর চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের চালা বিন্যস্ত করাই এখানে রীতি। অনেকটা এই ধরণের আটচালা কুঁড়েঘর আবহমান কাল ধরেই রাঢ়দেশের সর্বত্র নির্মিত হয়েছে এবং এ শৈলীর প্রেরণা যে সেখান থেকেই আহৃত তাতে সন্দেহ নেই।

রত্ন-মন্দিরে যে এক বা একাধিক চূড়া থাকতে পারে সেকথা আগেই বলেছি। চারদিকের ঢালু ও বাঁকানো কার্নিসযুক্ত ছাদের কেন্দ্রে একটি চূড়া থাকলে তাকে বলা হয় একরত্ন, আর ছাদের চার কোণে যদি অতিরিক্ত চারটি চূড়া থাকে তবে তার নাম পঞ্চরত্ন। বস্তুত 'রত্ন' কথাটি এখানে চূড়ারই সমার্থক। কিন্তু সব রত্নই একই আয়তনের নয়; কেন্দ্রীয় চূড়াটি সব সময়েই কোণের চূড়াগুলি থেকে অল্পাধিক বড় হয়ে থাকে। পঞ্চরত্ন মন্দিরের মাঝের চূড়াটির জায়গায় এক দোতলা কুঠরি বানিয়ে তার ছাদের চার কোণে চারটি ছোট চূড়া ও মাঝখানে কেন্দ্রীয় চূড়াটি বসালে তৈরি হবে এক নবরত্ন মন্দির। বাংলাদেশে এ রীতির সবচেয়ে পরিচিত দেবালয় বোধ হয় দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির। মন্দিরতলের সংখ্যা বাড়িয়ে চূড়ার সংখ্যা যে আরও বাড়ানো যেতে পারে সেকথা বলাই বাহুল্য। বাঁকুড়া জেলায় বহু-

শিখরযুক্ত রত্ন-মন্দির খুব কম নেই যদিও, তুলনায়, একরত্ন মন্দিরের সংখ্যা অনেক বেশী। প্রধানতঃ মল্ল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেকগুলি দেবালয় একদা এ জেলার সর্বত্র, বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরে, নির্মিত হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রথাগত রত্ন-মন্দিরশৈলী থেকে কিছুটা পৃথক্ এ রীতিটি কেন যে মল্ল রাজবংশের খুব ভাল লেগেছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

দালান মন্দিরগুলিকে আর্য ও আর্যেতর ধর্মচিন্তা-মিশ্রণের ফলশ্রুতি ব'লে আগেই উল্লেখ করেছি। বাঁকানো কার্নিস-বর্জিত, সমতল ছাদের এ দেবালয়গুলি অনেক বেশী সাদাসিদে বলে তাদের নির্মাণ-প্রকরণে যে উন্নত কারিগরির ব্যবহার হয়নি এমন নয়। এদের ফুলকাটা (পত্রাকৃতি) প্রবেশ-খিলানগুলি যেসব থামের ওপর ন্যস্ত হত তাদের স্তম্ভগুচ্ছ বলাই সমীচীন। গোল ইটের চাকতি পরপর সাজিয়ে অনেকগুলি সরু থামের সমন্বয়ে সেগুলি তৈরি হত। এ জাতীয় মন্দিরের সামনের দেওয়ালে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচুর অলংকরণও দেখা যায়।

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তিগুলি নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব ছাড়াও বাংলাদেশের নিজস্ব মন্দির-স্থাপত্যশৈলী দ্বারা কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছে, এতক্ষণ সংক্ষেপে তার আলোচনা করেছি। কিন্তু নির্মাণ-প্রকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক, ব্যবহৃত উপকরণের গুণাগুণ ও উপযোগিতার দিকে এখনও নজর দেওয়া হয়নি। এবার সে বিষয়ে কিছু বিচার-বিবেচনা করা যেতে পারে।

যে কোন ইমারত তৈরির রীতি ও প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে কী ধরণের উপাদান কাছেপিঠে ও সহজে পাওয়া যায় তার ওপরে। ভারতবর্ষের অন্যত্র পাথরের সৌধ যত বড় আকারে ও বেশী সংখ্যায় নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশে তা হতে পারেনি এইজন্য যে পাথরের এখানে বড়ই অভাব। এ রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তের জেলাগুলিতে স্থানীয় ভাবে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাথর হয়ত কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু তার সংগ্রহে ও পরিবহনে এত খরচ পড়েছে যে রীতিমত বিত্তশালী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তার ব্যবহারের কথা চিন্তাও করতে পারেননি। শ্বেত-পাথর তো দূরের কথা, সাধারণ বেলে পাথরের জন্যও আমাদের দূর রাজমহল বা চুনারে ছুটতে হয়েছে। ফলে, মল্ল রাজাদের মতো ধনীরাই কেবল যথেষ্ট সংখ্যায় পাথরের মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ পেয়েছেন। গ্রানিট প্রভৃতি কঠিন জাতীয় পাথরের স্থায়িত্ব ও ভার-বহন ক্ষমতা যে পোড়ামাটির ইটের থেকে অনেক বেশী সে কথা না

বললেও চলে। সেজন্য, উড়িষ্যা-শৈলীর সাবেক দেবালয়গুলি—যেমন পুরীর জগন্নাথ বা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির—যে রকম বিপুল আয়তনে নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে, কমজোরী ইটের উপাদানে তাদের সমকক্ষ ইমারত কদাচিৎ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ বা পূর্ব-ভারতে। কদাচিৎ বলছি এই জন্য যে দূর অতীতে নালন্দা, পাহাড়পুর বা মহাস্থানগড়ে যেসব ইটের তৈরী সৌধ একদা নির্মিত হয়েছিল, আয়তনে তারা উড়িষ্যার আদি মন্দিরগুলি থেকে হীন ছিল না। কিন্তু পূর্ব-ভারতের এই বিশাল এলাকা জুড়ে ইট-স্থাপত্যের বৃহৎ নিদর্শন যখন এতই মুষ্টিমেয় তখন এদের ব্যতিক্রম বলে গণ্য করাই হয়ত সমীচীন। এগুলির ক্ষেত্রে স্থপতিদের সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতাদের অমিত বিত্তের মণিকাঞ্চন যোগ সাধিত হয়েছিল, যা আর কোথাও বড় একটা হয়নি। বাংলাদেশে ইটের তৈরি ইমারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে কয়েকটি এখনও অবশিষ্ট আছে, যেমন সুন্দর-বনের জটার দেউল, মেদিনীপুর জেলার এগরার হট্টনাগর শিবের মন্দির, বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির, বর্ধমান জেলার ইছাই ঘোষ ও সাতদেউলিয়ার দুটি দেবালয় এবং পুরুলিয়ার পাড়া ও দেউলঘাট-বড়ামের তিন-চারটি মন্দির, সর্বভারতীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বালখিল্য মাত্র। প্রাকৃতিক কারণে বাঙালী স্থপতিরা স্বল্পস্থায়ী ভঙ্গুর ইট ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন ব'লে, ইমারতের পরিকল্পনায় তাঁদের কঠোরভাবে সংযত হতে হয়েছে। বাস্তুবিদ্যাগত এই কারণ ছাড়াও, সে সংযমের অন্য হেতুগুলির আলোচনা আগেই করেছি।

ঢালু ছাদ ও বাঁধানো কার্নিস যেমন বাংলা-মন্দিরের বাইরের দিকের বিশেষত্ব, তেমনি এ সৌধগুলির অন্যান্য গঠন-পদ্ধতিরও কয়েকটি বিশিষ্ট রীতি ছিল। যেমন, অল্পবিস্তর উঁচু ভিত্তিবেদীর ব্যবহার সর্বত্রই দেখা যায়। মন্দিরের মুখ কোন্ দিকে হবে সে বিষয়ে কোন বাঁধাধরা নিয়ম না থাকলেও, বাংলাদেশের অধিকাংশ ইটের দেবালয় হয় পুবমুখী নয় দক্ষিণমুখী। শুধু গর্ভগৃহ বা ঠাকুরঘর নিয়েই গোটা মন্দির এহেন দৃষ্টান্তের যেমন অভাব নেই, তেমনি এক বা একাধিক দিকে গর্ভগৃহের সংলগ্ন ঢাকা বারান্দাও বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। এ জাতীয় বারান্দা সাধারণতঃ শুধু সামনের দিকে স্থাপিত হলেও অন্য দিকেও তাদের সন্নিবেশের নজির একেবারে বিরল নয়। এছাড়া অতিরিক্ত ঢাকা প্রদক্ষিণ-পথও দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে। বারান্দায় ঢোকবার প্রবেশ-তোরণগুলির খিলানে যে কয়েক প্রস্থ ঢেউখেলানো স্তর

ব্যবহার করা হ'ত তাকে 'পত্রাকৃতি' না ব'লে, সহজ বাংলায় হয়ত 'ফুলকাটা' বলাই ভাল। এ জাতীয় এক বা একাধিক নকাশি থাকের সংস্থান বাংলা-মন্দিরের আর এক বৈশিষ্ট্য। খিলানের নীচের থামগুলির বিন্যাসেও বিধিবদ্ধ রীতি ছিল; তিনটি খিলান ধারণের জন্য মধ্যের দুটি হত পূর্ণ-স্তম্ভ ও ধারের দুটি অর্ধ-স্তম্ভ। সাধারণতঃ আটকোণা এ থামগুলির স্থূলত্ব ও দৃঢ় গঠনের উচ্চ প্রশংসা ক'রে পার্সি ব্রাউন তাঁর 'ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার' গ্রন্থে (১ম খণ্ড : ৩১ অধ্যায়) বলেছেন যে ভারতবর্ষের কোথাও এরকম থামের ব্যবহার দেখা যায় না এবং এগুলি পূর্ব-ভারতের নিজস্ব সৃষ্টি। বাইরের গড়ন যেমনই হোক না কেন, বাংলা-মন্দিরের গর্ভগৃহ বা ঠাকুরঘরটি কিন্তু সব সময়েই বর্গ বা আয়তক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। সাধারণতঃ সে ঘরে প্রবেশ করবার একটি মাত্র দরজা থাকত সামনের দিকে, যদিও পিছন ছাড়া অন্য দেওয়ালে এক বা একাধিক ছোট দরজার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সামনের ঢাকা বারান্দাটি কখনও কখনও মূল মন্দিরের দুই, তিন, এমন কি চারদিক প্রদক্ষিণ ক'রে আসত এবং সে প্রদক্ষিণ-পথের কোণে কোণে দুদিকে খোলা দরজাযুক্ত চারটি ছোট কুঠরিও নির্মিত হত। অন্য শ্রেণীর মন্দিরে কদাচিৎ সে ব্যবস্থা থাকলেও, রত্ন-মন্দিরের ওপর তলায় ওঠবার জন্য কোন্ কোন ক্ষেত্রে সিঁড়ির সংস্থান করা হত। সে সিঁড়ি সাধারণতঃ ঠাকুরঘরের এক কোণ থেকে অথবা ঢাকা বারান্দার প্রান্তবর্তী প্রকোষ্ঠ-গুলির কোনোটি থেকে ওপরে উঠে যেত। গর্ভগৃহের দূরের দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে বা সংলগ্ন বেদীতে বিগ্রহ স্থাপন করাই রীতি ছিল। কখনও কখনও সে কুলুঙ্গির চার পাশ নানা অলংকরণে মণ্ডিত হত। এ প্রথা মসজিদের বহুঅলংকৃত মিহ্‌রাব রচনার প্রভাব, না প্রাণের ঠাকুরকে এক শোভিত কক্ষে স্থাপনের বাসনা থেকে উদ্ভূত, বলা যায় না।

পুরাকীর্তির স্থাপত্য প্রসঙ্গে এতক্ষণ শুধু হিন্দু-রীতি ও হিন্দু স্থপতিদের কথাই বলেছি। মসজিদ বা মিহ্‌রাবের কথা এই প্রথম তুললাম। সৌধ নির্মাণে মুসলিম রীতিনীতির কথাও এবার কিছু বলা যাক।

গুহা-মন্দির ছাড়া প্রাচীনতম ভারতীয় দেবালয়গুলিতে চার দিকের দেওয়াল কিছুদূর অবধি তুলে, তাদের শীর্ষে লম্বা লম্বা পাথরের পাটা আড়াআড়ি ভাবে রেখে ছাদ তৈরি হত। ছাদ তৈরির এই আদিম রীতিটি গুপ্ত-যুগের কিছু কিছু মন্দিরে এখনও দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এই রীতিতে ইমারত খুব সামান্যই উঁচু হত; গর্ভগৃহটিকে আচ্ছাদিত

করতে পারলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হত কোন রকমে। এর পরে মন্দিরের উচ্চতা বিধানের জন্য চূড়া তৈরি করবার কথা যখন ভারতীয় স্থপতিদের মনে এল তখন দেওয়ালগুলিকে কিছুদূর অবধি খাড়া তুলে, তারপর ধাপে ধাপে তাদের পরস্পরের সমীপবর্তী ক'রে এক শীর্ষবিন্দুতে মিলিয়ে দেবার প্রথাটি গৃহীত হল। মুসলমানী আমলের আগে, ছাদ ধারণের জন্য এই পদ্ধতিটিই সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। বাঁকুড়া জেলা তথা বাংলাদেশের অন্যত্র প্রাক্-মুসলিম যুগের মন্দিরগুলিতে এ রীতিটি প্রায়ই অনুসৃত হয়েছে দেখা যায়। তারপরে এলেন মুসলমান স্থপতিরা তাঁদের খিলান ও গম্বুজ নির্মাণের বিদেশী দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে। দু'এক শ বছরের মধ্যে তাঁদের হিন্দু সহকর্মীরা হাতেকলমে এ বিদ্যা শিখে নিলেন যে খাড়া দেওয়ালের চার কোণে, প্রয়োজনীয় উচ্চতায়, লহরার বিন্যাস ক'রে তার ওপর বৃত্তাকার গম্বুজের মূল স্থাপন করা চলে। অতঃপর প্রতি স্তর ইট ধাপে ধাপে একটু একটু ক'রে এগিয়ে দিয়ে গম্বুজের চারিদিকের বৃত্তাকার দেওয়ালকে এক শীর্ষবিন্দুতে মিলিয়ে দিতে তাঁদের খুব অসুবিধা হয়নি এজন্য যে মোটামুটি এই ভাবেই তাঁরা আগেও ছাদের চার দেওয়ালকে চারটি পৃথক্ চালার আকারে একত্র করতেন। মুসলিম-পরবর্তী কালে ইটের তৈরি অধিকাংশ হিন্দু মন্দিরের ছাদ এভাবেই নির্মিত হয়েছে যদিও প্রাচীনতর চালা-গড়নের 'ধাপ-পদ্ধতিটি' একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি; বেশ আধুনিক কালের কিছু কিছু মন্দিরেও সে রীতিটির দেখা মেলে। গর্ভগৃহের লহরাযুক্ত চার দেওয়ালের ওপর সরাসরি গম্বুজ না বসিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দেওয়ালসংলগ্ন দুই বা ততোধিক চওড়া খিলান বানিয়ে তার ওপরেও অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ স্থাপিত হ'ত।

বাংলাদেশের মন্দির-স্থাপত্যের এই সমীক্ষা যে অতি সংক্ষিপ্ত হল তাতে সন্দেহ নেই। মসজিদ-স্থাপত্য বা সাধারণভাবে মুসলিম-স্থাপত্য সম্বন্ধেও এ ছোট বইটিতে বিশেষ কিছু বলবার অবকাশ নেই, কারণ পরবর্তী অধ্যায়ে বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তিগুলির ক্রমিক আলোচনার সময় সে জাতীয় ইমারতের সামান্যই উল্লেখ করা সম্ভব হবে। এ অক্ষমতা লেখকের অভিরুচিপ্রসূত নয়, ঐতিহাসিক কার্যকারণপ্রসূত। মল্ল রাজবংশের ইতিবৃত্ত বর্ণনার সময় দেখেছি যে প্রাক্-মুসলিম কাল থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের প্রায় শেষ অবধি তাঁরাই এ অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন দোর্দণ্ড প্রতাপে। তাছাড়া বন জঙ্গলে পূর্ণ এ এলাকায় মুসলমান রাজশক্তি কোনদিন কোন ঘাঁটি গাড়বার

প্রয়োজনও অনুভব করেননি। ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকেও এ তল্লাটের নাম ছিল 'জঙ্গল মহাল'। এসব বিবিধ কারণে, আজকের বাঁকুড়া জেলায় মুসলিম স্থাপত্যের খুব উল্লেখযোগ্য কোন নিদর্শন আছে বলে আমার জানা নেই। তবু হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্য সম্বন্ধে যাঁরা জানতে আগ্রহী তাঁরা সে বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ নানান পুস্তক থেকে তাঁদের অনুসন্ধিৎসা মেটাতে পারেন। বর্তমান লেখকের শুধু এটুকু কাম্য যে পরের পরিচ্ছেদে স্থাপত্য-নিদর্শনগুলির ধারাবাহিক আলোচনার সময় তাদের আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রকরণকে সংক্ষেপে 'খাপ-যুক্ত চারচালা ছাদ' বা 'কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজ' ইত্যাদি বলে উল্লেখ করলে এ বই-এর পাঠক-সাধারণের যেন বুঝতে অসুবিধা না হয়।

মুসলমান স্থপতিদের অবদান যে কেবল মূল মন্দিরের ছাদ নির্মাণ-কৌশলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন মনে করা ভুল হবে। প্রায় সর্বত্রই ঢাকা বারান্দাগুলির ছাদ ও, বিরল ক্ষেত্রে হলেও, গর্ভগৃহের ছাদও যে খিলান বা 'ভল্টে'-এর ওপর স্থাপিত হয়েছে, তাও মুসলিম রীতি-প্রভাবিত। প্রবেশ-খিলানগুলির চোখা কৌণিক গড়ন ও ফুলকাটা স্তরবিন্যাস এবং আটকোণা থামগুলির গঠন-প্রকরণে মুসলমানী প্রভাব পড়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে বাংলাদেশের বহু অধুনাতন ইটের মন্দিরের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 'টেরাকোটা' বা পোড়ামাটির অলংকরণ যে অব্যবহিত পূর্বের মুসলিম রীতি দ্বারা প্রভাবিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানে 'অধুনাতন' কথাটি কেন ব্যবহার করলাম, সেকথা হয়ত সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন আছে।

মন্দির মসজিদে পোড়ামাটির অলংকরণ: ভারতবর্ষে মুসলমান স্থপতি বা ভাস্করেরাই যে ধর্মীয় ইমারতে 'টেরাকোটা' অলংকরণের প্রথম সূত্রপাত করেন তা বলা যায় না। এ বই-এর বিবেচ্য না হওয়ায়, প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার বিকাশস্থলগুলিতে এ জাতীয় সজ্জার প্রচলন সম্পর্কে আলোচনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে। বাংলাদেশে মুসলিম অনুপ্রবেশের বহু পূর্বেই, গুপ্ত-যুগে, পোড়ামাটির অলংকরণ যে অজ্ঞাত ছিল না তা ভিটা, অহিচ্ছত্র, রাজগীর, ভিতরগাঁও প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাপ্ত সেকালের বহু মৃৎফলকের নজিরে প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশেও, পাল-যুগে, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ বিহারের গায়েও এহেন অলংকরণের বহুল ব্যবহার হয়েছিল। পাল-যুগের প্রথম দিকের এ নিদর্শনগুলিতে পশুপাখি, নরনারী ও দেববেদীমূর্তির যথেষ্ট প্রয়োগ হলেও সে যুগের শেষের দিকের ধর্মীয়

ইমারতগুলিতে কিন্তু মূর্তি-ভাস্কর্য আর বড় দেখা যায় না। তখনও 'টেরাকোটা' সজ্জার ব্যবহার হয়েছে সত্য কিন্তু সেগুলি প্রধানতঃ কীর্তিমুখ, চৈত্য-গবাক্ষ, মালার অনুকৃতি অথবা নানাবিধ জ্যামিতিক নকশার ভিত্তি হিসাবে উৎকীর্ণ হয়েছে, যা পরে আবৃত হয়েছে মিহি চুনের দৃঢ় পলস্তারায়। আজকের বাঁকুড়া জেলায় খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকে নির্মিত বহুলাড়া ও সোনাতপলের মন্দির দুটিতে এজাতীয় অলংকরণ এখনও বেশ স্পষ্ট। প্রসঙ্গতঃ, বহুলাড়া মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের তিনদিকে তিনটি কুলুঙ্গির মধ্যে রক্ষিত পোড়ামাটির মূর্তিগুলি বিশেষ গুরুত্বের দাবি করতে পারে। তারা সমসাময়িক কালের এক বিস্ময়কর কীর্তি। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে 'টেরাকোটা' মূর্তির ঢালাহী ব্যবহার হয়েছে অগণিত বাংলা-মন্দিরে। তুলনায় অনেক অল্প হলেও, পাল-যুগের নবম শতক অবধিও হয়ত তাই। কিন্তু মধ্যবর্তী প্রায় ছ'-সাত শ বছরে সৃষ্ট পোড়ামাটির এহেন মূর্তি-ভাস্কর্যের কোন নজির আজ আর অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ। কিছু কিছু নিশ্চয়ই উৎকীর্ণ হয়েছিল সমকালীন মন্দিরে কিন্তু সেসব দেবালয় এখন একেবারে লোপ পেয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের প্রতিনিধিস্থানীয় সম্ভবতঃ একমাত্র অবশিষ্ট দৃষ্টান্ত ব'লে বহুলাড়া মন্দিরের ঐ ভাস্কর্যগুলির মূল্য অপরিসীম।

খ্রীষ্টীয় তেরো শতকের শুরুতে বাংলাদেশে মোসলেম আবির্ভাবের পরবর্তী প্রায় দু'শ বছরে সম্ভবতঃ খুব কম মন্দিরই নির্মিত হয়েছে এ অঞ্চলে। সে আমলকে প্রধানতঃ মুসলমানী স্থাপত্যের কাল বলতে বাধা নেই যার প্রধান ফসলগুলির এখনও দেখা মেলে মালদহ জেলার গৌড়, আদিনা ও পাণ্ডুয়ায়। এসব ইমারতের গঠনকৌশল থেকে সমকালীন হিন্দু স্থপতিরা যে অনেক কিছু নতুন পদ্ধতি শিখেছিলেন সেকথা আগেই বলেছি। কিন্তু সবচেয়ে উপকৃত হন বোধ হয় হিন্দু ভাস্করেরা যাঁদের কাছে ইটের তৈরী মোসলেম সৌধের অলংকরণের কাজ এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। নতুন বলছি এই জন্য যে হিন্দু যুগে পোড়ামাটির সজ্জা-প্রকরণে তাঁদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকলেও মাঝখানের কয়েক শ বছরের অনভ্যাসে সে দক্ষতা প্রায় লোপ পেয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে এ কারুকর্মে তাঁরা যখন হাত দিলেন তখন আদর্শ হিসেবে পেলেন সদ্য-নির্মিত বহু মোসলেম ইমারতের জ্যামিতিক বা ফুললতা-পাতার নকশা। কঠিন ধর্মীয় নিষেধে মুসলমান শিল্পীরা নরনারী এমন কি পশুপাখিরও মূর্তি রচনা করতে পারেননি; দেবদেবীর কথা তাঁদের ক্ষেত্রে তো ওঠেই না। কিন্তু হিন্দু ভাস্করদের হাতে প'ড়ে

'টেরাকোটা' অলংকরণ-শিল্পের মরা গাঙে যেন দুকূল ছাপানো বান এল। ফুললতাপাতা বা জ্যামিতিক নকশার ক্ষেত্রেও তাঁদের যেমন কোন নিগড় ছিল না, তেমনি ছিল না রামায়ণ, মহাভারত তথা অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীর কল্পলোকে অবাধ বিচরণের। চৈতন্যদেবের জীবদ্দশার কাল ১৪৮৬ থেকে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। এর পরেই নব-বৈষ্ণব ধর্মের শক্তিশালী প্রেরণায় বাংলাদেশের সর্বত্র যে অগণিত ইটের মন্দির নির্মিত হতে আরম্ভ করল, বহু ক্ষেত্রেই তারা সজ্জিত হয়েছে এই নতুন পর্যায়ের 'টেরাকোটা' অলংকরণে। গুপ্ত-যুগে ভারতবর্ষের অন্যত্র কিছু কিছু মন্দির-'টেরাকোটা'র সন্ধান পাওয়া গেলেও, মধ্যযুগের শেষ দিকে এ শিল্পের চর্চা হয়েছে শুধুমাত্র বাংলাদেশে। সেজন্য বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান ভাস্করদের এই অপরূপ শিল্পসৃষ্টি সমকালীন ভারতবর্ষে তুলনাবিহীন।

ভারতে পোড়ামাটির ব্যবহারের ঐতিহ্য বহুকালের। হরপ্পা ও মোহেনজোদড়ো থেকে পোড়ামাটির খেলনা, পুতুল, তৈজসপত্র, সীলমোহর প্রভৃতি অনেক পাওয়া গেছে। লক্ষণীয় এই যে, মন্দির-মসজিদে ব্যবহৃত 'টেরাকোটা' অলংকরণ-শৈলীটি সে প্রাচীন ধারা থেকে মোটেই বিযুক্ত নয় এবং সাবেক রীতি অনুযায়ীই পোড়ামাটির ফলক বা টালিগুলিকে ছাঁচে ফেলে বা খোদাই ক'রে তৈরি করা হত। বাংলা-মন্দিরের 'টেরাকোটা' সজ্জার বিস্তৃত সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ছাঁচের ব্যবহার হলেও, খোদাই পদ্ধতিটিই সম্ভবতঃ বেশী প্রচলিত ছিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্পাধিক উচ্চতার 'বা-রিলিফ'-এর আকারে মূর্তি বা নকশাগুলিকে কাঁচা মাটির টালির উপর উৎকীর্ণ ক'রে তাদের চির-প্রচলিত পোণ বা ভাটিতে পোড়ানো হত। ব্যবহৃত মাটিকে এ কাজের উপযোগী করতে বা পোড়ানোর সময় প্রয়োজনীয় আঁচের ব্যবস্থা করতে যে বিশেষ (ও সম্ভবত গোপনীয়) ধরণের কারিগরির প্রয়োগ করা হত তাতে সন্দেহ নেই। নোনা ধ'রে ক্ষয়ে যেতে আজকের সাধারণ পোড়ামাটির ইটের লাগে বড় জোর তিরিশ-চল্লিশ বছর। কিন্তু 'টেরাকোটা' অলংকরণগুলিকে অবাধ রৌদ্রবৃষ্টির মধ্যেও যখন দু'তিন শ বছর কি তারও বেশী সময় অক্ষত থাকতে দেখি, তখন স্বভাবতঃই মনে হয় তাদের নির্মাণে নিশ্চয়ই উঁচু দরের দক্ষতা ও কলাকৌশল ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। সে কুশলতার খুঁটিনাটি এক চিত্তাকর্ষক গবেষণার বিষয়-বস্তু, কেননা সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা নানা কারণে পঞ্চাশ বছর কি তারও

কিছু বেশী আগে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন হয়ত চিরদিনের মতো।

কোথায় কোথায় এসব শিল্পীদের ঘাঁটি ছিল এবং কি ভাবেই বা তাঁরা মন্দির তৈরি করে বেড়াতেন সে বিষয়ে বিস্তৃত সমীক্ষার প্রয়োজন। আমার অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান থেকে বলতে পারি, মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া-দাসপুর; হাওড়া জেলার থলিয়া-রসপুর; হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগর, রাজহাটি, সেনহাটি; বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, বালসী ও বর্ধমান জেলার গুসকরা ও কেতুগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এসব শিল্পীরা প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত ছিলেন। এই মূল ঘাঁটিগুলির কাছাকাছি বহু ছোট বড় গ্রামেও তাঁদের বসতি ছিল। আমার-দেখা অনেক মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে তাঁদের 'সূত্রধর', 'রাজ' বা 'মিস্ত্রী' ব'লে ও তাঁদের পদবী পাল, শীল, চন্দ্র, দত্ত, কুণ্ডু, দে, মাইতি, রক্ষিত, পতিত প্রভৃতি ব'লে উল্লিখিত হয়েছে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অনেকটা ভ্রাম্যমাণ যাত্রাদলের মতো তাঁরা পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন। বিখ্যাত দলগুলি হয়ত ঘরে বসেই বায়না পেতেন। দলের অধিকারীর দেবালয় নির্মাণ-কলার সব বিভাগেই অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকত ও নানা জাতীয় মন্দিরের নকশা বা 'ব্লু-প্রিণ্ট' সঞ্চিত থাকত তাঁর কাছে। এগুলি দেখে ও দরদাম ঠিক ক'রে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা যখন বিশেষ কোন আকৃতি ও আয়তনের দেবালয় নির্মাণের ফরমায়েস করতেন, তখন গাঁথনির জন্য পাতলা ইট ও সজ্জার জন্য 'টেরাকোটা' অলংকরণ তৈরির কাজে অধিকারী ও তাঁর দলবল লেগে পড়তেন। এ সময়টা তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা। এভাবে একটি মন্দির তৈরি হলে, শিল্পীগোষ্ঠী স্থানান্তরে যেতেন নতুন পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে। প্রসঙ্গতঃ, বাংলা-মন্দিরের ভিত্তির গভীরতা ও দেওয়ালের স্থূলত্ব সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা যেতে পারে। চার পাশের মাটি বন্যায় ক্ষয়ে যাবার ফলে, মাত্র কুড়ি ফুট উঁচু মন্দিরের ভিত্তিও যে অন্ততঃ ন'দশ ফুট গভীর হত এমন দু'একটি দৃষ্টান্ত দেখেছি। অন্যান্য মন্দিরে এর ব্যতিক্রম হবার কথা নয়; বরং উচ্চতা অনুসারে সে গভীরতা যে আরও বেশী হত তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গের শত শত মন্দিরের দেওয়ালের মাপ থেকে দেখেছি তাদের স্থূলত্বও খুব কম ক্ষেত্রেই আড়াই-তিন ফুটের কম হত। নিরেট ছাদের গুরুভার বহন করবার জন্যই এসব ইমারতের ভিত্তি ও দেওয়াল খুব পাকাপোক্তভাবে তৈরি করতে হত।

ইটের মন্দিরের গঠন-প্রকরণ নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করেছি। এবার পোড়ামাটির অলংকরণগুলির বিষয়বস্তু ও প্রথাগত সংস্থান সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। তারপরে, পাথরের দেবালয়গুলির স্থাপত্য ও সজ্জার কথাও সংক্ষেপে বলব।

বাংলাদেশে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির উপসত্ত্ব-ভোগী বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন; সুবে বাংলার নবাব সুলতানদের মতো বা মল্লভূমের মল্লরাজাদের মতো অর্থস্বাচ্ছল্য তাঁদের ছিল না। নির্মাণের ব্যয় তাঁদের সেজন্য বেশ সীমিতই রাখতে হত। ফলে, নিছক গুনতির হিসাবে, চুনবালির পলস্তারা-আবৃত মন্দিরের থেকে 'টেরাকোটা'-সজ্জিত মন্দিরের সংখ্যা অনেক কম হলেও তাদের গুরুত্ব অনেক বেশী এই কারণে যে সমসাময়িক কালে পোড়ামাটির ভাস্কর্য ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তের ধর্মীয় ইমারতে একেবারেই ব্যবহৃত হয়নি। সে সময়ের জনমানসের প্রভাব যে এই অভিনব অলংকরণ পদ্ধতির ওপর পড়বে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের ইহলীলা সংবরণের ষাট-সত্তর বছরের মধ্যেই শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে মল্লরাজ বীর হম্বীর চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। তারপরে বাঁকুড়া জেলায় যত দেবালয় নির্মিত হয়েছে তার অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের। নব পর্যায়ে এই বিষ্ণু-উপাসনার স্রোতে যখন মল্লভূম ভেসে গেল তখন প্রেমভক্তিধর্মের নতুন উন্মাদনায় 'টেরাকোটা' শিল্পীরাও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। অব্যবহিত পূর্বের মোসলেম পদ্ধতিতে রচিত ফুললতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশায় হাত পাকাতে না পাকাতেই কৃষ্ণলীলার সীমাহীন চিত্রকল্পের ভাণ্ডার খুলে গেল তাঁদের সামনে। রামায়ণ-মহাভারতের কালজয়ী ঐশ্বর্য ও পৌরাণিক কাহিনীর অসংখ্য চিত্ররূপ তো ইতিপূর্বেই তাঁদের কাছে অবারিত ছিল; এখন, অনুকূল পরিবেশে, নব নব মন্দির আচ্ছাদিত হতে লাগল এই অপরিমেয় শিল্পসম্পদের রূপায়নে। 'অনুকূল পরিবেশ' বলতে শুধু ধর্মীয় প্রেরণার কথাই বলছি না, সমকালীন মুসলমান রাজশক্তির কথঞ্চিৎ উদার মনোভাবের কথাও বোঝাতে চাইছি। বস্তুতঃ, মুসলমান আমলের প্রথম দিকের তীব্র ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা যদি শেষের দিকেও সমভাবেই অব্যাহত থাকত তবে এত অসংখ্য 'টেরাকোটা' মন্দির বাংলাদেশে নির্মিত বা রক্ষিত হত কিনা সন্দেহ। সে যাই হোক, রামায়ণ-মহাভারত না পৌরাণিক না কৃষ্ণলীলাবিষয়ক না ফুললতাপাতা বা জ্যামিতিক—কোন্ জাতীয় অলংকরণ 'টেরাকোটা'

মন্দিরে প্রাধান্য পেয়েছে, এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সব শ্রেণীর চিত্ররূপেরই অল্পবিস্তর মিশ্রিত ব্যবহার দেখা যায়, যদিও দুর্বোধ্য কারণে মহাভারতের কাহিনীগুলি খুব কম দেবালয়েই রূপায়িত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মে গীতার উদ্‌গাতা কৃষ্ণের বীর্যবান রূপটি উপাসিত না হয়ে তাঁর লীলামূর্তিটিই আরাধিত হয়েছে। সেজন্য কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অলংকরণগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত, কংসবধ, পুতনাবধ, কালীয়দমন, ননীচুরি, গোষ্ঠলীলা, বকাসুর প্রভৃতি অশুভ শক্তির নিধন, গোপীদের সঙ্গে জলকেলি, নৌকাবিলাস, বস্ত্রহরণ, দানলীলা, মানভঞ্জন, রাইরাজা, মাথুর ইত্যাদি ভাস্কর্যেরই বেশী ব্যবহার দেখা যায়। এসব কাহিনীর রূপায়নে শিল্পীদের ওপর কোন রকম নিগড় আরোপিত হয়নি বলে তাঁরা খুশিমতো মূর্তি নির্মাণ করেছেন। সেজন্য এই শ্রেণীর ভাস্কর্যে অঞ্চলভেদে ও শিল্পীগোষ্ঠীর ভিন্নতার দরুন বেশ তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু 'রাসমণ্ডল' (কৃষ্ণের বহুরূপ ধারণ ক'রে গোপীগণসঙ্গে বৃত্তাকারে যুগপৎ নৃত্য) অথবা 'নবনারীকুঞ্জর' (রাধাকৃষ্ণের গজপৃষ্ঠে ভ্রমণের জন্য রাধিকার ন'টি সখীর জড়াজড়ি ক'রে এক হাতির রূপ ধারণ) প্রভৃতি ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে প্রথাগত শৈলীর প্রয়োগের জন্য সেগুলি মোটামুটি একইভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে বিভিন্ন মন্দিরে।

'টেরাকোটা' অলংকরণে কৃষ্ণের লীলাকাহিনী প্রাধান্য পেলেও সাবেক বাসুদেব উপাসনার ধারাটি যে একেবারে পরিত্যাগ করা হয়েছে এমন মনে করা ভুল হবে। বাঁকুড়া তথা বাংলাদেশের বহু মন্দিরে বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তিও যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা যায়। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এহেন দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরগুলিতে একাধারে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব—সব রকম ভক্তিভাবই স্থান পেয়েছে। প্রবেশতোরণের খিলানের বক্ররেখা বরাবর শিবলিঙ্গযুক্ত ছোট ছোট প্রতীক শিবমন্দির উৎকীর্ণ করা একদা প্রথায় পরিণত হয়েছিল মনে হয়। শুধু শিবমন্দিরেই নয়, বৈষ্ণব বা শাক্ত মন্দিরেও এই সজ্জা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কৃষ্ণ বা শিবের মন্দিরে দশমহাবিদ্যা, মহিষমর্দিনী বা কালীর মূর্তি ব্যবহারে কোন বাধা হয়নি। বাংলাদেশে রামসীতার আরাধনা বিশেষ জনপ্রিয় না হলেও সভাসীন রামসীতার পোড়ামাটির মূর্তি বহু অলংকৃত মন্দিরে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। বিবিধ ধর্মমতের প্রতীক এই 'টেরাকোটা' মূর্তিগুলি শুধু কারিগরির দিক দিয়েই অপূর্ব নয়, ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতারও

তারা বিশিষ্ট নিদর্শন। ধর্ম-নিরপেক্ষতার এসব দৃষ্টান্তে আরও প্রমাণিত হয় যে শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাকৃষ্ণপূজার প্লাবনে প্রাচীনতর শৈব ও শাক্ত উপাসনার ধারাগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। বাঁকুড়া তথা বাংলা-দেশের এই মন্দির-'টেরাকোটা' সম্পদ সেজন্য শুধু ধর্মীয় উদারতার প্রতিচ্ছবিই নয়, সমকালীন অধ্যাত্মচিন্তার বিভিন্ন স্রোতগুলিরও মূল্যবান দলিল।

রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীগুলির মধ্যে মন্দির-ভাস্করদের কাছে প্রথমটিরই অনেক বেশী সমাদর হয়েছে দেখা যায়। শ্রেষ্ঠ অলংকরণগুলি প্রবেশখিলানের ঠিক ওপরে নিবদ্ধ করাটা একদা প্রায় প্রথায় পরিণত হয়েছিল। মাঝখানের খিলানশীর্ষে রাম-রাবণ যুদ্ধদৃশ্যের বহুল ব্যবহার 'টেরাকোটা' শিল্পীদের কাছে রামায়ণের গুরুত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। খিলানের ওপরের এই অংশগুলিতে কখনও কখনও দেবীযুদ্ধ, কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক উপাখ্যান বা ফুললতাপাতা প্রভৃতির সন্নিবেশ দেখা গেলেও সংখ্যায় তাদের যে কোন একটি লঙ্কাযুদ্ধের 'মোটিফ' থেকে অনেক কম। রামায়ণের অন্যান্য চিত্ররূপের মধ্যে হরধনুভঙ্গ, রামসীতার বনগমন, সূর্পনখার নাসিকাছেদন, মারীচবধ, রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ ও জটায়ুবধ, অশোক বনে সীতা, যুদ্ধরত কুম্ভকর্ণ ও ত্রিশিরা, পাত্রমিত্রপরিবৃত সভাসীন রামসীতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহাভারতের উপাখ্যানগুলির মধ্যে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, শকুনির পাশাখেলা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধদৃশ্য, ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতিই প্রধান।

অগণিত পুরাণ ও উপপুরাণের অফুরন্ত কাহিনী-ভাণ্ডার থেকে 'টেরাকোটা' শিল্পীরা যেমন অজস্র চিত্ররূপের সন্ধান পেয়েছেন তেমনি দরাজ হাতে তাদের উৎকীর্ণও করেছেন দেবালয়ের দেওয়ালে দেওয়ালে। এই ঐশ্বর্যময় উৎস থেকে যে পরিমাণ বৈচিত্র্যের অবতারণা করা সম্ভব হয়েছে, রামায়ণ-মহাভারত, এমন কি কৃষ্ণলীলা থেকেও তা সম্ভব হয়েছে কিনা সন্দেহ। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি—বিষ্ণুর এই দশাবতারের প্রয়োগই হয়েছে সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া দশ দিক্‌পাল (ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ঈশ, ব্রহ্মা ও অনন্ত), দশমহাবিদ্যা (কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা) ও যোগেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মণী, কৌমরী, ইন্দ্রানী, দণ্ডধারিণী, বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি মাতৃকামূর্তিরও অল্পাধিক ব্যবহার হয়েছে বিভিন্ন মন্দিরে। জনপ্রিয় পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির চিত্ররূপও, যথা—

শিববিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, শিব-অন্নপূর্ণা, গঙ্গাবতরণ, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, সমুদ্রমন্থন, অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণু, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব, পারিজাত বৃক্ষের দখল নিয়ে ইন্দ্র ও কৃষ্ণের যুদ্ধ, দেবীর শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, মহিষাসুরমর্দিনী প্রভৃতিও যথেষ্ট সংখ্যায় উৎকীর্ণ হয়েছে।

ধর্মীয় প্রেরণামূলক এসব সজ্জা যথেষ্ট প্রাধান্য পেলেও, 'টেরাকোটা' শিল্পীরা আশ্চর্য সংযমবোধের সঙ্গে সমকালীন বহু সমাজচিত্রও রূপায়িত করেছেন বাংলা-মন্দিরগুলির দেওয়ালে। উড়িষ্যার প্রভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও বাঁকুড়ার মন্দির-ভাস্করেরা যে মিথুন-ভাস্কর্যের দিকে অল্পই ঝুঁকেছেন, এ কম প্রশংসার কথা নয়। পাশের জেলা হুগলীর কোন কোন অঞ্চলে এ জাতীয় অলংকরণ যতটা স্ফূর্তিলাভ করেছে বাঁকুড়ায় তা করেনি। তবে তখনকার সমাজে বাইজী-নাচ বা বারাঙ্গনা-বিলাস এমন কিছু গর্হিত ছিল না বলে, প্রমোদভ্রমণের নানাবিধ চিত্ররূপের প্রয়োগ দেখা যায়। তাকিয়ায় হেলান-দেওয়া ফরসিসেবী বাবু, লোকলস্কর সমেত শিবিকাবাহিত জমিদার, হাতি-ঘোড়ার পিঠ থেকে বন্য জন্তু শিকার, পদাতিক যোদ্ধা, উটের পিঠে সামরিক বাজিয়ের দল, বেদে-বেদেনীদের কসরৎ, মোহন্ত-সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ প্রভৃতিও যথেষ্ট সংখ্যায় চিত্রিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দিরগুলিতে সমকালীন ফিরিঙ্গী-জীবনের রূপায়নও খুবই চিত্তাকর্ষক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বন্দুকধারী বা গোলন্দাজ সৈন্য কিংবা সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিক হিসাবে দেখানো হলেও, ফরসিসেবী, প্রমোদভ্রমণরত বা চাটুকার-পরিবৃত সাহেবদেরও প্রায়ই দেখা মেলে। বাঙালীর অন্দরমহলের বিবিধ ঘরোয়া দৃশ্যও বাদ পড়েনি ; পাশাখেলা, উৎসব-পার্বণ, কন্যা-সম্প্রদান, বধূবরণ, সিঁদুরদান, যুবতীদের প্রসাধন, সাজসজ্জা ও বাদ্যযন্ত্র অনুশীলনও 'টেরাকোটা' শিল্পীদের অজস্র চিত্ররূপের সন্ধান দিয়েছে। অপসৃত এক সমাজজীবনের সেগুলি মূল্যবান আলেখ্য।

বাঁকুড়ার কোন কোন দেবালয়ে, বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরের কেষ্ট রায়ের জোড়-বাংলা মন্দিরে, বন্য পশুর অনায়াস বিচরণভঙ্গি ও সাবলীল গতিবেগ যে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দিরের একসারি হাঁস ও কয়েকটি ড্রাগনের মুখও অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। লঙ্কা-যুদ্ধের দৃশ্যে ব্যবহৃত অগণিত বানরসৈন্যের বিক্রমও সাধারণতঃ খুবই প্রাণবন্তভাবে চিত্রিত। এছাড়া, হাতি, ঘোড়া, উট, ষাঁড়, গরু,

কুকুর, ছাগল, হাঁস, টিয়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে শবভোজী শিয়াল ও শকুনও উৎকীর্ণ হয়েছে আশ্চর্য সততার সঙ্গে। পোড়ামাটির মতো সামান্য উপকরণে এহেন উচ্চাঙ্গের রূপসৃষ্টি যথার্থই অভিনন্দনযোগ্য।

প্রাচীনতর মন্দিরগুলিতে ফুললতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশার যে আপেক্ষিক প্রাধান্য দেখা যায় তাতে আকস্মিকতার কিছু নেই। পূর্বতন মোসলেম 'টেরাকোটা'-শৈলীর শিক্ষানবিসীর কাল শেষ হলেও, হিন্দু ভাস্করেরা সে রীতিনীতির প্রতি তখনও হয়ত কিছুটা অনুরক্ত ছিলেন। কালক্রমে, তেত্রিশ কোটি দেবতা-অধ্যুষিত হিন্দু দেবলোকের অফুরন্ত রূপচিত্রের প্লাবনে সে আসক্তি তলিয়ে যেতে থাকে। এ জন্যই ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরে এ জাতীয় অলংকরণ যে পরিমাণে দেখা যায়, পরবর্তী কালের মন্দিরগুলিতে তত দেখা যায় না। ষোলো-সতের শতকে স্থাপিত বহু দেবালয়ের এহেন নকাশি কাজের সঙ্গে মোসলেম 'টেরাকোটা' অলংকরণের সাদৃশ্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দিরে জ্যামিতিক নকশা বেশ কমে এলেও, মোসলেম প্রভাবমুক্ত ফুলকারি কাজের বিশেষ হ্রাস হয়নি; খিলানের বক্ররেখা-বরাবর, মূর্তি-ফলকগুলির চারদিক ঘিরে অথবা স্থান-বিভাজক উন্নত রেখাগুলির গায়ে এদের অজস্র ব্যবহার দেখা যায়। সূক্ষ্মতায়, বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্যে তারা যে কোন অলংকৃত মন্দিরের বিশিষ্ট সম্পদ।

'টেরাকোটা' টালিগুলি সাধারণতঃ বেশ ছোট আকারেই নির্মিত হত; দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ন'দশ ইঞ্চির বেশী নয়। এর চেয়ে বড় আয়তনের টালি কম ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। লঙ্কাযুদ্ধের মতো বিরাট দৃশ্য বা ফুলকারি কাজের বিস্তৃত নকশা রচনার সময় টালিগুলিকে পূর্বনির্দিষ্ট ছক অনুসারে পর পর সাজাতে হত এবং সেজন্য তাদের গায়ে সাংকেতিক চিহ্ন বা ক্রমিক সংখ্যা খোদাই করা থাকত। পুরো নকশার এই টুকরোগুলিকে নির্ভুলভাবে সাজানোর জন্য একটি খসড়া-চিত্র বা 'ব্লু-প্রিন্ট' সম্ভবতঃ আগেই তৈরি করে রাখা হত এবং তা দেখে দেখে খুব সাবধানে টালিগুলিকে বসানো হত পলস্তারা-লাগানো দেওয়ালের গায়ে। মন্দিরের দু'দিক, তিন দিক কি চার দিকই পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নকাশি কাজ নিবদ্ধ হত শুধু সামনের দেওয়ালে। ভিত্তিবেদী থেকে শুরু করে ছাদের বাঁকানো কার্নিসের তলা অবধি 'টেরাকোটা' টালি দিয়ে ছেয়ে দেওয়ার সময় কিন্তু সংস্থানগত কয়েকটি রীতি প্রায়ই

অনুসৃত হয়েছে দেখা যায়। যেমন, ভিত্তিবেদীর সমান্তরাল প্রথম সারিটিতে সাধারণতঃ শিকার, প্রমোদভ্রমণ, যুদ্ধযাত্রা, ফিরিঙ্গী-চিত্র প্রভৃতি সামাজিক দৃশ্যগুলি উৎকীর্ণ হত ও তার ওপরের সারিতে থাকত কৃষ্ণলীলার চিত্র। এ রকম আরও একটি সারি থাকলে তা মণ্ডিত হত ফুলকারি কাজে। থামগুলির গায়ে কৃষ্ণলীলা ও মহিষাসুরমর্দিনী, খিলানের বক্ররেখা-বরাবর ফুলকারি কাজ বা প্রতীক শিবমন্দির ও খিলানশীর্ষের প্রশস্ত অংশে লঙ্কাযুদ্ধ, দেবীযুদ্ধ, কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক কাহিনী বা ফুলকারি কাজ স্থান পেত অধিকাংশ ক্ষেত্রে। খিলানের দু'পাশের দেওয়ালে একটি, দুটি বা কদাচিৎ আরও বেশী, খাড়া সারিতে একক মূর্তিগুলি (যেমন দশাবতার, বিবিধ পৌরাণিক ও যুবতী-চিত্র প্রভৃতি) স্থাপিত হত ভিন্ন ভিন্ন খোপের মধ্যে। এই খোপের সারি কার্নিসের নীচ দিয়ে ঘুরে এসে মিলিত হত দু'পাশের লম্ব সারিগুলির সঙ্গে। কিছু কিছু মন্দিরে দেওয়ালের দুই প্রান্তে কয়েকটি খাড়া সারিতেও মূর্তি-ভাস্কর্য (মোহন্ত, প্রহরী ইত্যাদি) দেখা যায়। প্রধান অলংকরণগুলির এহেন সংস্থানের বাইরের খালি জায়গা-গুলি ভরাট হত নানাবিধ ফুলকারি কাজ বা জ্যামিতিক নকশা দিয়ে। 'টেরাকোটা'-সজ্জা স্থাপনের এই সংক্ষিপ্ত ও স্থূল বর্ণনা থেকে কেউ যেন না মনে করেন যে সব মন্দিরেই বুঝি বা একই বিন্যাসরীতি অনুসৃত হত। অঞ্চল ভেদে বহু ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

ইটের মন্দিরের গঠনপ্রকরণ ও সজ্জা সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলেছি তা, কিছু দীর্ঘ হলেও, নিরর্থক নয় এজন্য যে বাঁকুড়া জেলায় এ জাতীয় দেবালয়ের সংখ্যা প্রচুর। এ বর্ণনা থেকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলিকেও বুঝতে সুবিধা হবে। তাছাড়া, দোচালা, জোড়-বাংলা, চারচালা, আটচালা, রত্ন, দেউল বা দালান—যে শ্রেণীর মন্দিরই হোক না কেন, পাথরের হলে তাদের গঠনশৈলী ইটের মন্দিরের থেকে বিশেষ পৃথক্ হয়নি। উভয় ক্ষেত্রেই স্থপতিরা মোটামুটিভাবে একই স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করেছেন; উপকরণের ভিন্নতার জন্য বিশেষ কোন তারতম্য দেখা যায় না। পার্থক্য যা তা প্রধানতঃ অলংকরণের বিষয়বস্তু ও রচনা-পদ্ধতিতে। উপাদানের নমনীয়তা ও অন্যান্য সুবিধার জন্য পোড়ামাটির সজ্জায় যে পরিমাণ সূক্ষ্ম কারিগরির রূপসৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে, পাথরের মাধ্যমে (বাঁকুড়ায় ভাল জাতের পাথরও বরাবর দুষ্প্রাপ্য) তার তুল্য কিছুই করা যায়নি। তবু, কিছু কিছু পাথরের মন্দিরে, যেমন বিষ্ণুপুরের

রাধাশ্যাম বা ঘুটগেড়িয়ার পরিত্যক্ত দেউলটিতে যে উচ্চাঙ্গের প্রস্তর-ভাস্কর্যের সমাবেশ হয়েছে তার কথা পরবর্তী অধ্যায়ে যথাস্থানে বলব।

*

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি সম্বন্ধে লিখতে বসে কেন যে এতক্ষণ হিন্দু স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ধারাগুলি নিয়েই প্রধানতঃ আলোচনা করেছি সে বিষয়ে হয়ত একটু কৈফিয়তের প্রয়োজন আছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংজ্ঞা অনুসারে অন্ততঃ এক শ বছরের বেশী পুরাতন ইমারতকে আমরা পুরাকীর্তি বলে গণ্য করেছি। এহেন প্রাচীন মসজিদ, গীর্জা বা আদিবাসী-দেবগৃহ বাঁকুড়া জেলায় নেই বললেই চলে। প্রথমে আদিবাসীদের কথাই বলি। তাঁদের দেবতারা গাছতলাতেই উপাসিত হয়েছেন চিরকাল। কালেভদ্রে যদি বা তাঁদের জন্য মন্দির নির্মিত হয়েছে, সে সৌধের গঠন-প্রকরণ ও অলংকরণ খাস হিন্দু-মন্দিরের থেকে বিশেষ ভিন্ন হয়নি। সেখানকার অধিষ্ঠিত দেবতারাও, কি আদিবাসী কি বর্ণহিন্দু সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করেছেন। সেজন্য এসব দেবালয়ের স্থাপত্য-ভাস্কর্যকে বর্ণহিন্দু-ইমারতের গঠন-প্রকরণের শামিল বলেই ধরা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে, দালান-কোঠা নেই অথচ দেবদেবী আছেন এ রকম আদিবাসী উপাসনাস্থলের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে; সেখানে আদিবাসীদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার ও কিংবদন্তীর আলোচনাই প্রধান, ইমারতের আলোচনা গৌণ। মোসলেম পুরাকীর্তির স্বল্পতার কারণ আগেই বিশ্লেষণ করেছি। পাঠান রাজত্বের কাল থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আবির্ভাব অবধি মল্লভূমে স্থায়ী মুসলমান অনুপ্রবেশ একেবারেই ঘটেনি, যেমন ঘটেছিল সংলগ্ন মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমান জেলায়। বাঁকুড়ার মুসলিম ইমারতগুলি সেজন্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। কিন্তু কিছু কিছু প্রাচীন দরগা প্রভৃতিকে ঘিরে যেসব লোকশ্রুতি, উপাখ্যান প্রভৃতি প্রচলিত তার বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টান সৌধগুলি সম্বন্ধেও সেই একই কথা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার থেকে দেখা যায় যে সে জেলার প্রথম গীর্জাটি ওয়েসলিয়ান মিশনের রেভারেণ্ড জে. আর. ব্রডহেড ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ বা তার অব্যবহিত পরে বাঁকুড়া শহরে নির্মাণ করেন। একই মিশনারী সম্প্রদায়ের সারেঙ্গা বা অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত আর কয়েকটি গীর্জা আরও পরবর্তী কালের। সংজ্ঞা অনুসারে সেগুলি পুরাকীর্তির পর্যায়ে

না পড়লেও, যথাস্থানে তাদের সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু কিছু বলব। বৌদ্ধ পুরাকীর্তি বাঁকুড়া জেলায় কিছু আছে বলে আমার জানা নেই; বৌদ্ধ ভাস্কর্যও যা পাওয়া গেছে তার সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বস্তুতঃ, পাল-যুগে বৌদ্ধ ধর্ম যে অজয় নদের দক্ষিণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেনি সে কথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। বাঁকুড়া জেলার দূর দূরান্তরে পরিভ্রমণের সময় আমি মাত্র তু'একটি বুদ্ধমূর্তি দেখেছি—একটি জয়পুরে এক গাছের তলায় (এটি পরে অন্তর্হিত হয়েছে) ও আর একটি সোনামুখীর সুবর্ণমুখী দেবীর মন্দিরে। শেষেরটি যে পরিমাণে সিঁদুরলিপ্ত তাতে সেটি উপবিষ্ট কোন জৈন তীর্থংকর মূর্তির কিনা সঠিক বলা যায় না। কূর্মমূর্তি ধর্মরাজের পূজা যে বৌদ্ধ স্তূপপূজা থেকে উদ্ভূত এই মত প্রমাণ করবার জন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঁকুড়া জেলায় তাঁর-দেখা তু'একটি বুদ্ধমূর্তির উল্লেখ করেছিলেন। আমি যেগুলির উল্লেখ করেছি তিনিও সেগুলি দেখেছিলেন কিনা জানি না। সে যাই হোক্, তাঁর ও আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ কথা জোর করেই বলা যায় যে বাঁকুড়া জেলায় বৌদ্ধ ভাস্কর্য বিশেষ পাওয়া যায়নি। এই শ্রেণীর পুরাবস্তু সম্বন্ধে সেজন্য লেখবার অবকাশ খুব কমই হবে। জৈন পুরাকীর্তি ও পুরাবস্তুর কথা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাঁকুড়া জেলার প্রধান নদীপথগুলির তীরে তীরে জৈন সংস্কৃতিকেন্দ্রগুলি যে একদা গড়ে উঠেছিল তা আগেই বলেছি। এখনও দামোদরের ধারে বিহারীনাথ, দ্বারকেশ্বরের কূলে বহুলাড়া ও ধরাপাট, শিলাবতীর তীরে হাড়মাসড়া ও কিছু দূরের দেউলভিড়া, কংসাবতীর তীরে পরেশনাথ ও অম্বিকানগর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর জৈন নিদর্শন দেখা যায়। পরের পরিচ্ছেদে যথাস্থানে এদের সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে বলবার অবকাশ হবে।

*

'পুরাকীর্তি পরিচিতি' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়টি শুরু করবার আগে আর তু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা এ বইটিতে বাঁকুড়া জেলার যাবতীয় পুরাকীর্তি যে স্থান পেয়েছে, এ দাবী আমি করি না। চেষ্টার ত্রুটি না থাকলেও, সময় এবং সুযোগের অভাবে অল্প কিছু দ্রষ্টব্য যে বাদ পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। উৎসাহী পাঠক সেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন, তাদের বিবরণ পুস্তক বা প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করবেন এই আমার একান্ত কামনা। পাঠকসাধারণ যাতে এ গ্রন্থে বর্ণিত পুরাকীর্তিগুলি স্বচক্ষে দেখতে পারেন তার জন্য পথঘাটের নির্দেশ সর্বত্রই দেওয়া হয়েছে, ফোটোগ্রাফীর সুবিধার জন্য

ইমারতগুলির মুখ ও অলংকরণ কোন্ দিকে তারও উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের মাপজোখ বোঝবার সুবিধার জন্য মেট্রিক ও ব্রিটিশ উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগ এ রাজ্যের জীর্ণ পুরাকীর্তিগুলির সংরক্ষণের জন্য সম্প্রতি এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সে কার্যক্রম অনুসারে এই অবহেলিত সৌধগুলির কিছু অংশও যদি সংরক্ষিত হয়, তা হলে বঙ্গকৃষ্টির বহু অমূল্য সম্পদ অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে।

পুরাকীর্তি পরিচিতি

অবন্তিকা : বিষ্ণুপুর শহরের ৪ মাইল (৬·৪ কিলোমিটার) উত্তরে, বিষ্ণুপুর-সোনামুখী পিচ-রাস্তার পাশে, দ্বারকেশ্বর নদের দক্ষিণ তীরে, বিষ্ণুপুর থানায় অবস্থিত এ ছোট গ্রামটিতে বিষ্ণুপুর থেকে বাস বা সাইকেল রিক্‌শয় পৌঁছনো যায়। এখানকার ইটের তৈরি নবরত্ন রাসমঞ্চটির গায়ে যে অভিনব জাফরির কাজ আছে তার তুলনা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু দেবালয়ে বিরল।

অম্বিকানগর : কংসাবতী ও কুমারী নদীর সঙ্গমস্থলের ঠিক দক্ষিণে, রাণীবাঁধ থানার এ সমৃদ্ধ গ্রামটি রাণীবাঁধের প্রায় ৬ মাইল (৯·৭ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। কংসাবতী নদীর দক্ষিণে (বর্ষাকালে পারাপারের জন্য নৌকা লাগে), বাঁকুড়া-রাণীবাঁধ পিচের সড়ক (শীতগ্রীষ্মে সরাসরি বাস চলে) থেকে পশ্চিম দিকে যে কাঁচা রাস্তা বার হয়েছে তাতে প্রায় ৩½ মাইল (৫·৬ কিলোমিটার) দূরে এ গ্রামে পৌঁছতে হলে শেষের অংশটুকু হেঁটে, সাইকেলে বা গরুর গাড়িতে আসতে হয়। সে পথে জীপ চলে, মোটরগাড়িও চলতে পারে কষ্টেসৃষ্টে। অদূরের কংসাবতী বাঁধের কাজ শেষ হলে, বাঁধের ওপরের রাস্তা দিয়ে সহজেই এ গ্রামে পৌঁছনো যাবে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ব্যবহৃত কিছুকিছু পাথরের আয়ুধ এখান থেকে পাওয়া গেলেও গ্রামের খ্যাতি দেবী অম্বিকা ও তাঁর ভৈরব শিবের পাশাপাশি দু'টি পাথরের মন্দিরের জন্য। অম্বিকার আদি মন্দিরের শুধু ভিত্তিবেদীটি অবশিষ্ট আছে ; তার ওপরে নির্মিত বর্তমান ইটের মন্দিরটি আধুনিক কালের। এ ভিত্তিবেদীর আয়তন, উচ্চতা ও ব্যবহৃত প্রস্তরখণ্ডের বিশালতা থেকে সম্ভবতঃ দেউল-রীতির সাবেক সৌধটি যে বেশ বড় ছিল এমনই মনে হয়। অম্বিকানগরের ২ মাইল (৩·২ কিলোমিটার) পশ্চিমে পরেশনাথে একদা এক সমৃদ্ধ জৈন কেন্দ্র ছিল। সেখানকার জৈন দেবী অম্বিকা কালক্রমে হিন্দু দেবী অম্বিকায় পরিণত হয়ে এখন হিন্দু মতে উপাসিত হচ্ছেন, এ অনুমান অসঙ্গত নয়। বিগ্রহটি সম্ভবতঃ পাথরের তৈরি, কিন্তু তার সিঁদুর-লেপা মুখ ও উজ্জ্বল দু'টি নকল চোখ ছাড়া সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা। সে আবরণ কিছুতেই উন্মোচনযোগ্য নয় বলে মূর্তিটির আকার সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না।

শিবলিঙ্গের জন্য নির্মিত ভগ্ন-শিখর পাথরের জীর্ণ দেউল মন্দিরটি মুসলিম-পূর্ব কালের বলে মনে হয়। উচ্চতায় প্রায় ১৫ ফুট (৪.৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি (২.৫ মিটার) মাপের এ দেবালয়টির দেওয়ালের উদ্গত অংশগুলির সঙ্গে বিষ্ণুপুর থানার ডিহরের বিখ্যাত শিব-মন্দির দু'টির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গের পাশে পাথরের এক ঋষভনাথের মূর্তি থেকে অনুমান করা চলে এই প্রাচীন জৈন মন্দিরটি কালক্রমে হিন্দু মন্দিরে পরিণত হয়েছে। এহেন বিবর্তনের নজির বহুলাড়া, বিহারীনাথ, ধরাপাট প্রভৃতি আদিম জৈন কেন্দ্রগুলিতেও দেখা যায়।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে (খণ্ড-২৪; সংখ্যা-২) প্রকাশিত শ্রীমতী দেবলা মিত্রের 'সাম জৈন অ্যান্টিকুইটিস ফ্রম বাঁকুড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল' শীর্ষক প্রবন্ধে অম্বিকানগরের কাছাকাছি পরেশনাথ, চিৎগিরি, বড়কোলা, চিয়াদা ও কেন্দুয়াতে প্রাপ্ত বহু জৈন নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে।

অযোধ্যা : খড়্গপুর-আদ্রা রেলপথের রামসাগর স্টেশনে (বিষ্ণুপুরের পরের স্টেশন) নেমে কাঁচা রাস্তায় দ্বারকেশ্বর নদ পার হয়ে (শীত-গ্রীষ্মে জল থাকে না বললেই চলে) ৩ মাইল (৪.৮ কিলোমিটার) দূরের বড় গ্রাম অযোধ্যায় পৌঁছনো যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের এক নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও প'ড়ে আছে গ্রাম প্রান্তে। সংস্কৃত শিক্ষার একদা-বিখ্যাত এ কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি, দর্শন ও জ্যোতিষের বহু পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখায় রক্ষিত আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী স্থানীয় জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুরাকীর্তিগুলি গ্রামের প্রধান দ্রষ্টব্য। এক বৃহৎ অঙ্গনের উত্তর সীমানায় ইটের তৈরি ও পলস্তারা-আবৃত দক্ষিণমুখী বারোটি শিবমন্দির পাশাপাশি স্থাপিত। পঞ্চরথ দেউল-রীতির এ দেবালয়গুলি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০ ফুটের (৩ মিটার) বেশী নয় ও উচ্চতায় আনুমানিক ১৫ ফুট (৪.৫ মিটার)। অঙ্গনের উত্তর-পূর্ব কোণের ইটের তৈরি পশ্চিমমুখী গিরিগোবর্ধন মন্দিরটি এক অভিনব নির্মাণ-রীতির নিদর্শন, যে বিষয়ে ইতিপূর্বে কিছু বলা হয়নি। কৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন ধারণের সুপরিচিত কাহিনীটির অনুসরণে দেবগৃহের চালা প্রচলিত কোনও পদ্ধতিতে তৈরি না ক'রে বড় বড় শিলাখণ্ডের আকারে বিন্যস্ত। মন্দিরের বিগ্রহও সাধারণত গিরিগোবর্ধনধারী কৃষ্ণ। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী, কোতুলপুর, রাজগ্রাম প্রভৃতি স্থানেও

এহেন দেবালয় দেখা যায়। মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট (৭·৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫ ফুট (৪·৫ মিটার)। অঙ্গনের পুব ও দক্ষিণ সীমানা-বরাবর দোলমঞ্চ, ঝুলনমঞ্চ ও উৎসব-দালানগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম কোণের সতরো-চূড়াযুক্ত, আটকোণা রাসমঞ্চটি বাঁকুড়া জেলায় এ জাতীয় ইমারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ হতে পারে। (বীর হম্বীর প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের অতুলনীয় রাসমঞ্চটির কথা অবশ্য স্বতন্ত্র)। প্রতি দিকের দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮ ফুট (২·৪ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট (৭·৫ মিটার), এ রাসমঞ্চে গিরিগোবর্ধনের বিগ্রহ রাসের সময় এনে রাখা হয়। পুরাকীর্তিগুলির কোনটিতেই প্রতিষ্ঠাফলক নেই; তবে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কুলপঞ্জী থেকে দেখা যায়, আনুমানিক ১৬০ বছর আগে এ বংশের গদাধর, কৃষ্ণমোহন, রামমোহন ও লালমোহন নামে চার সহোদর তাঁদের মা রঙ্গমণির নামে রাসমঞ্চটি প্রতিষ্ঠা করেন। অন্য ইমারতগুলি একই সময়ে তাঁদের দ্বারাই নির্মিত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি প্রায় ৮ ফুট (২·৪ মিটার) উচ্চতার এক পিতলের রথও অঙ্গনে রক্ষিত আছে। তার গায়ে উৎকীর্ণ দশাবতার, নানা দেবদেবীমূর্তি, সার্কাসী খেলা ও ফুলকারি কাজের নক্শাগুলি মন্দ নয়। গ্রামের অন্যত্র পাথরের এক চারচালা মন্দির আছে বলে শুনেছি।

আকুই: ইঁদাস থানার পূর্ব প্রান্তের এ গ্রামে পৌঁছতে হলে বাঁকুড়া-দামোদর রিভার রেলপথের বর্ধমান জেলায় অবস্থিত বনওয়াই স্টেশনে নেমে ক্রোশখানেক পথ হেঁটে আসাই প্রশস্ত। এই ছোট মাপের রেলপথে বনওয়াই, সেহারাবাজারের দু'স্টেশন পশ্চিমে; বর্ধমান শহর থেকে সেহারাবাজার অবধি নিয়মিত বাস চলে।

আপাতঃ-দুর্গম এ গ্রামে কষ্ট ক'রে আসা নিরর্থক নয় এজন্য যে এখানকার দক্ষিণ পাড়ায় অবস্থিত, পুবমুখী, পঞ্চরত্ন, রাধাকান্ত জীউর ইটের মন্দিরটি নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদের দেওয়ান কান্নুরাম দাস (বর্তমানে এ কায়স্থ পরিবারটি 'রায়' উপাধি ব্যবহার ক'রে থাকেন) ১৬৮৩ থেকে ১৬৮৬ শকাব্দের (১৭৬১-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) মধ্যে এটি নির্মাণ করান। উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০·৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২২ ফুট (৬·৬ মিটার), এ দেবালয়ের সামনের দেওয়ালে ও থামে অসংখ্য 'টেরাকোটা' অলংকরণ নিবদ্ধ আছে। সামাজিক, পৌরাণিক, রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত সে বিপুল সজ্জার কারিগরি-দক্ষতা ও বৈচিত্র্যের তুলনা বাঁকুড়া জেলায় বিরল। স্থাপত্যের দিক

থেকেও ইমারতটি বিশেষত্ববর্জিত নয়। পুব দিকের ত্রি-খিলান ঢাকা বারান্দা অতিক্রম ক'রে গর্ভগৃহের প্রধান প্রবেশ দরজা ছাড়াও উত্তর দিকে আর একটি প্রবেশপথ আছে। ঢাকা বারান্দার ছাদ উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের ছু'টি চওড়া খিলান ও মধ্যবর্তী 'ভল্ট'-এর ওপর বিন্যস্ত; গর্ভগৃহের ছাদও অনুরূপ ছু'টি খিলান ও মধ্যবর্তী গম্বুজের ওপর স্থাপিত। ঠাকুরঘরের দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর ওপরে যাবার সিঁড়ি আছে।

এ মন্দিরের পাথরে ক্ষোদিত নয় পংক্তির প্রতিষ্ঠাফলকটির কিছু অংশ ক্ষয়িত হলেও, ছু'শ বছর আগেকার এহেন লিপির এক প্রতীকী নিদর্শন হিসাবে নীচে সেটিকে উদ্ধৃত করা হল।

"শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জিউ······
অশীতিতম শকাব্দে শ্রীল শ্রীরাধাকান্তস্য
শ্রীমন্দিরারম্ভ ইতি। সুভমস্তু সকাব্দা।·
১৬৮৩ মাহ মাঘ ১৭ রোজ মন্দির আরম্ভ।
মহারাজা শ্রীযুত তিলোকচন্দ্র রায়স্য অধি-
কার পরিচারক শ্রীকানুরাম দাস সাকিম
আকুই তস্য জায়া শ্রীমতি চাপা দাসি শ্রীশ্রী
চরণে য়র্পণ করিলেন। কারিগর শ্রী ইস্বরি...
সাকিম বল্যাড়া সংপুর্ন্ন সকাব্দা ১৬৮৬॥"

লিপিটিতে বাংলা ও সংস্কৃতের অবাধ সংমিশ্রণ ও আধুনিক বাংলা বানানের থেকে তারতম্য লক্ষণীয়। কারিগরের নিবাস 'বল্যাড়া' সম্ভবতঃ আজকের বহুলাড়া—যে শব্দটিকে স্থানীয় লোকে এখনও 'বোল্যাড়া' বলে উচ্চারণ ক'রে থাকেন। একদা সেখানে যে বহু বিশিষ্ট মন্দির নির্মিত হয়েছিল, 'বহুলাড়া' নিবন্ধে সেকথা বলেছি। স্বাভাবিক কারণেই সেখানে হয়ত এক মন্দির-গড়া কারিগর গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল যাদের মধ্যে ঈশ্বরী নামধারী কাউকে কানুরাম দাস এ মন্দির নির্মাণের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

আটবাইচণ্ডী: বাঁকুড়া-খাতড়া সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), ইঁদপুরের কিছু আগে, দশম মাইল-পোস্টের কাছ থেকে, বাঁ-হাতি কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৫ মাইল (৮ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পুবে ছোট গ্রাম আটবাইচণ্ডী। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য, মুসলিম-পূর্ব যুগে নির্মিত বাসুলী, চণ্ডী ও শিবের তিনটি মন্দির। প্রথমটি ১০ ফুট (৩ মিটার) দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ও ২২ ফুট (৬·৬ মিটার) উচ্চতার ভগ্নশিখর এক পাথরের

ত্রি-রথ রেখ-দেউল। পুরুলিয়া জেলার তেলকুপির বিখ্যাত প্রাক্-মুসলিম দেউলগুলির সঙ্গে নিকট সাদৃশ্যের জন্য এটি প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পাথরের মন্দিরের ভিত্তিতে অভিনবভাবে ব্যবহৃত ইটগুলির মাপ বিস্ময়কর—১৬"×১০"×২¼"। জনশ্রুতি, এ মন্দিরের বাসুলী বিগ্রহই নাকি খ্রীষ্টীয় ষোলো শতকে ছাতনায় স্থানান্তরিতা হন। গর্ভগৃহে এখন কোন মূর্তি নেই; উইঢিবি ও ভাঙা পাথরের টুকরো ছড়ানো। সেখানেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূজা নিবেদন করেন অন্তর্হিতা বাসুলীর উদ্দেশে। চণ্ডী মন্দিরটি একেবারে ভেঙে পড়েছে; ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে দশভুজা এক চামুণ্ডামূর্তি খোলা আকাশের নীচে এখনও উপাসিতা। তাঁকে ভুল ক'রে অষ্টভুজা মনে করবার ফলে, এ দেবীর নাম থেকেই গ্রামের নামকরণ হয়ে থাকবে (অষ্টবাহুচণ্ডী>আটবাইচণ্ডী)। অনুচ্চ এক ঢিবির ওপরে সাবেক শিবমন্দিরটির ঝামা-পাথরের ভিত্তি-চিহ্ন দেখা যায়; তার ওপরে ইটের এক দালান-মন্দির নির্মিত হয়েছে সম্প্রতিকালে।

ইঁদাস: বিষ্ণুপুর মহকুমার উত্তর-পুব প্রান্তে অবস্থিত ইঁদাস থানার সদর। বাঁকুড়া থেকে সংবৎসর ও বিষ্ণুপুর থেকে শীতগ্রীষ্মে বাসে আসা যায়। প্রধান দ্রষ্টব্য, হরিপুর-পণ্ডিতপাড়ায় বিখ্যাত ধর্মঠাকুর 'বাঁকুড়া রায়'-এর দক্ষিণমুখী দালান-মন্দির ও গ্রামের অন্যত্র আর তিনটি বর্ণহিন্দু-দেবালয়। মধ্যযুগীয় ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মানিকরাম এই 'বাঁকুড়া রায়'-এর বন্দনা গেয়েছেন ও সীতারাম দাস দু'পাশে দুই অশ্বশোভিত এ দেবতার সুন্দর সিংহাসনের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিয়েছেন। ইঁদাস ও অন্যান্য স্থানের 'বাঁকুড়া রায়'দের থেকেই যে বাঁকুড়া জেলার নামকরণ হয়েছে সেকথা পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত। স্থাপত্যের দিক থেকে দালান-মন্দিরটি অকিঞ্চিৎকর কিন্তু ৭×৭×২ ইঞ্চি (১৭·৮×১৭·৮×৫·১ সেন্টিমিটার) মাপের এক কালো পাথরের ওপরের দিকে ধর্মরাজের কূর্মমূর্তি বিগ্রহটি অভি-নিবেশযোগ্য। এই পাথরের নীচের দিকে খুব সুন্দর এক প্রস্ফুটিত পদ্ম খোদাই করা আছে। পুরোহিত ছুতোর সম্প্রদায়ভুক্ত, বংশানু-ক্রমিকভাবে উপাধি—'পণ্ডিত'। জনশ্রুতি, আট পুরুষ আগে এ পরিবারের কর্তা অনতিদূরের খণ্ডঘোষ গ্রামে (বর্ধমান জেলা) চিঁড়ে বিক্রী করতে যেতেন। তাঁর চিঁড়ের সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর তাঁকে স্বপ্নাদেশ করেন ও পরে খণ্ডঘোষের 'উদয় পুকুর' থেকে উঠে এখানে প্রতিষ্ঠিত হন। পৌষ সংক্রান্তির সময় যে

পাঁচদিনব্যাপী মেলা বসে তার প্রথম দিনে নাকি লোক হয় আট-দশ হাজার। এছাড়া রথযাত্রা ও ঝুলন উপলক্ষেও উৎসব হয়ে থাকে।

বাজার-পাড়ায় রক্ষিত পরিবারের (তাম্বুলি) ত্রিলোচন রক্ষিত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী, পরিত্যক্ত (আগে নাকি নারায়ণ-শিলা ছিল) দালান-মন্দিরটি স্থাপত্য-ভাস্কর্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে প্রায় ১৫ ফুট (৪'৫ মিটার) ও একই উচ্চতার এ দেবালয়ের তিন-খিলানযুক্ত সামনের বারান্দা ও গর্ভগৃহের ছাদ খিলানের ওপর স্থাপিত। গর্ভগৃহের দু'পাশে ও পিছনে সরু, ঢাকা প্রদক্ষিণ-পথটি দালান-মন্দিরের ক্ষেত্রে খুব অভিনব। সামনের দেওয়ালে খোপের মধ্যে নিবদ্ধ 'টেরাকোটা' মূর্তিগুলির কারিগরিও সুন্দর। পাথরের প্রতিষ্ঠাফলকটি ক্ষয়িত বলে ঠিকমত পড়া না গেলেও, আকারপ্রকারে মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষার্ধে নির্মিত বলে মনে হয়।

কৃষ্ণবাটি-পাড়ায় শালগ্রামরূপী দামোদরের উত্তরমুখী, আংশিক ভগ্ন, নবরত্ন ইটের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায়, ১৬৭১ শকাব্দে (১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) জনৈক গদাধর দাস (কায়স্থ) সেটির প্রতিষ্ঠা করেন। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি (৫'৩ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২ মিটার) এ মন্দিরটির গঠন-প্রকরণ বেশ চিত্তাকর্ষক। বহু নবরত্ন মন্দিরের মতো এখানেও ওপরের তলগুলিতে ওঠবার সিঁড়ি আছে। এক দিকের দেওয়াল ভেঙে পড়ায় আভ্যন্তরীণ স্থাপত্য পর্যবেক্ষণ করবার সুবিধা হয়েছে। 'টেরাকোটা' সজ্জা এখন অল্প হলেও, দু'একটি কৃষ্ণলীলার দৃশ্য বেশ সুন্দর।

সরকার-পাড়ায় সরকার পরিবারের (কায়স্থ) প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী, নবরত্ন ইটের মন্দিরটি ও তার সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির অলংকরণগুলি এখনও মোটামুটি অক্ষত আছে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬ ফুট ৮ ইঞ্চি (৫ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার), এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে দেখা যায়, শ্রীরাধাদামোদরের প্রীতির জন্য ১৭১৮ শকাব্দে (১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) এটি নির্মিত হয়। নবরত্ন মন্দির হলেও গর্ভগৃহ থেকে ওপরে ওঠবার কোন সিঁড়ি নেই ; সেজন্য বাইরে, বহুদূর থেকে ধাপ ক'রে এনে দক্ষিণের দেওয়ালের দোতলা অবধি উচ্চতার যে ইটের সিঁড়িটি সম্ভবতঃ পরে নিবদ্ধ হয়েছে তার তুল্য অভিনব ব্যবস্থা অল্পই দেখেছি। 'টেরাকোটা' সজ্জাগুলি প্রচলিত বিষয়ের ও সাধারণ কারিগরির।

একেশ্বর : বাঁকুড়া শহরের দু'মাইল দক্ষিণ-পুবে, দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে, এক্তেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দিরটি অবস্থিত। বাঁকুড়া থেকে সাইকেল রিক্‌শয় বা বাসে আসা যায়। জেলার সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ দেবালয়গুলির অন্যতম এই পশ্চিমমুখী, পাথরের মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট (১৩.৫ মিটার) এবং দৈর্ঘ্যপ্রস্থ, যথাক্রমে, ২৮ ফুট ৪ ইঞ্চি (৮.৫ মিটার) ও ২৭ ফুট ৪ ইঞ্চি (৮.২ মিটার)। বহুবার সংস্কারের ফলে, সাবেক শিখর-দেউলের আকৃতি থেকে এটি এখন অনেকটা পীঢ়া বা ভদ্র-দেউলের আকার নিয়েছে। অত্যন্ত পুরু দেওয়াল, পাদদেশের বলিষ্ঠ উদগত অংশ ও মন্দিরগাত্রে শিখর-দেউলের ছোট ছোট প্রতীক নকশা থেকে সন্দেহ থাকে না যে আদিতে এটি এক সুউচ্চ শিখর-দেউল ছিল ; এখন খাড়া দেওয়ালগুলির গড়ন আগের মত থাকলেও, ছাদটি দু'টি ধাপে বিভক্ত হ্রস্বাকৃতি পীঢ়া-দেউলের মত আর তার ওপরে আমলক ও কলস স্থাপিত। সম্প্রতিকালে, পলস্তারা-আবৃত এ সৌধটির সামনের দিকে উগ্র রঙে রঞ্জিত কিছু অলংকরণ যোগ করা হয়েছে, মূল মন্দিরের গাম্ভীর্যের সঙ্গে যাদের কোনই সঙ্গতি নেই। প্রাঙ্গনে, ছোট ছোট উপমন্দিরের মধ্যে, এক ভগ্ন বাসুদেব মূর্তির নিম্নাংশ ; ৪ ফুট উচ্চতা ও ২½ ফুট প্রস্থের এক দ্বাদশভূজ লোকেশ্বর-বিষ্ণু ; ৩½ ফুট উচ্চতা ও ১¾ ফুট প্রস্থের এক গণেশ ও ২½ ফুট উচ্চতা ও ৩ ফুট দৈর্ঘ্যের এক নন্দী-বৃষের মূর্তি আছে। সব ক'টিই পাথরের এবং খুব সুন্দর। অনুমান হয়, আদিতে বিগ্রহগুলি সাবেক মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে অধুনা-শূন্য কুলুঙ্গিগুলিতে রক্ষিত ছিল।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে কুণ্ডমধ্যে স্থাপিত এখানকার শিবলিঙ্গটি নাকি দেখতে অনেকটা মানুষের পায়ের মতো। তা থেকে তিনি অনুমান করেন এটি বেদে উল্লিখিত একপাদেশ্বরের প্রতীক, যে-নামটি অপভ্রংশে এক্তেশ্বরে এসে দাঁড়িয়েছে। একপাদেশ্বরের শাস্ত্রোক্ত মূর্তির থেকে শিবলিঙ্গটির আকৃতি এতই ভিন্ন যে এ মতবাদ যুক্তিসহ মনে হয় না। কিংবদন্তী-আশ্রিত আর একটি অনুমান—দূর অতীতে মল্লভূম ও সামন্তভূমের মধ্যে সীমানা নিয়ে যে বিরোধ বাধে স্বয়ং মহাদেব তার মীমাংসা ক'রে দেন বলে দুই রাজ্যের সীমানায় প্রতিষ্ঠিত হয় একতা-সম্পাদনকারী 'একতেশ্বর' বা এক্তেশ্বরের মন্দির। বাঁকুড়ার শৈবতীর্থগুলির মধ্যে এক্তেশ্বরের স্থান খুব উঁচুতে। চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনের সময় এখানে খুব বড় মেলা বসে, লোকে লোকারণ্য

হয়। (উৎসাহী পাঠক আরও তথ্যের জন্য আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া রিপোর্টের অষ্টম খণ্ডে মিঃ জে. ডি. বেগলারের বিবরণীটি দেখতে পারেন)।

এল্যাটি: বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া পিচের সড়ক থেকে বার হয়ে যে মোরামের রাস্তা, ওঁদার পরবর্তী রেল-স্টেশন ভেদুয়াসোলের সামান্য পুবের লেভেল-ক্রশিং পার হয়ে উত্তরে গেছে, সে পথে হরিহরপুর গ্রাম (মৌজা পাহাড়পুর; জে. এল. নং ১০৮) অতিক্রম ক'রে দ্বারকেশ্বরের ওপারে (শীতগ্রীষ্মে হেঁটে পার হওয়া সম্ভব) নদীতীরবর্তী গ্রাম এল্যাটিতে (জে. এল. নং ১১৪) পৌছনো যায়। গ্রামের বাইরে, শ্যামসুন্দর বিগ্রহের জন্য নির্মিত কিন্তু অধুনা পরিত্যক্ত, ইটের দেউলটির স্থাপত্য খুবই অভিনব। উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২ মিটার) ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি (৫ মিটার), পুবমুখী, এক-দুয়ারী, নবরথ এ দেবালয়ের দেওয়ালগুলি ও শিখর সমান্তরালভাবে খাঁজকাটা এবং দীর্ঘায়ত পিরামিডের ন্যায় উন্নত; প্রথম দৃষ্টিতে, উর্ধ্বে সম্প্রসারিত খুব চোখা ভদ্র-দেউলের মত দেখায়। অল্প উচ্চতার রথগুলি ঘণ্টাশোভিত চূড়া অবধি বিস্তৃত। দেওয়াল বেশ পুরু—৪ ফুট ৩ ইঞ্চি (১.৩ মিটার)—যদিও ভুমি বরাবর এর তলদেশ এখন বেশ ক্ষয়ে গেছে। প্রবেশদ্বারের ওপরের ও গর্ভগৃহের ছাদ ধাপযুক্ত চারচালা পদ্ধতিতে নির্মিত। সামনের জগমোহন এখন ভেঙে পড়েছে; তার ভিত্তিক্ষেত্রটুকু শুধু অনুমান করা যায়। মন্দিরগাত্রের নীচের অংশে ও বরণ্ডের তলায় কয়েক সারি পুরাতন শৈলীর জ্যামিতিক ও ফুলকারি 'টেরাকোটা' অলংকরণ আছে যার নজিরে প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ দেবালয়টি খ্রীষ্টীয় সতের শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত বলে মনে হয়। কাছাকাছি পুরনো ইট-বিছানো দু'টি ঢিবি দেখিয়ে গ্রামবৃদ্ধেরা বলেন সেখানেও নাকি অনুরূপ দু'টি মন্দির ছিল যেজন্য এ জায়গার সাবেক নাম ছিল 'তে-দেউলী'। লুপ্ত মন্দির দু'টির আকার ও আয়তন ঠিক কি রকম ছিল, এখন তা আর জানবার উপায় নেই। খ্রীষ্টীয় সতের শতকের প্রথমার্ধে প্রথম বীর সিংহ ও তারপরে প্রথম রঘুনাথ সিংহ মল্ল-সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এঁদের মধ্যে মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে, রঘুনাথ সিংহের অবদান অনেক বেশী। এল্যাটিতে একত্রে তিনটি মন্দির স্থাপনের ব্যাপারে তিনিই যে বীর সিংহের থেকে বহুগুণে যোগ্যতর ব্যক্তি ছিলেন এমন অনুমান মোটেই অসঙ্গত নয়। অতএব, বর্তমান দেউলটি প্রথম রঘুনাথ সিংহের নির্মিত হওয়াই সম্ভব। বিগ্রহ,

কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ ও অষ্টধাতুর রাধিকা, বহুকাল আগে অপহৃত হয়েছে।

এ মন্দিরের সিকি মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইটের তৈরি ছোট আটচালা শিব-মন্দিরটি হালে পুনর্নির্মিত হলেও সেটি এক পুরাতন দেবালয়ের ভগ্নস্তূপের ওপর স্থাপিত বলে মনে হয়। লুপ্ত মন্দিরটির মাকড়া পাথরের ভিত্তিমূল ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে দশ-এগারো ইঞ্চি মাপের বড় বড় প্রাচীন ইটের অবশেষ এখনও এখানে দেখা যায়।

কাদাসোল : বড়জোড়া থানার সদর বড়জোড়া থেকে মালিয়াড়াগামী উত্তর-পশ্চিমমুখী পিচ-রাস্তায় মাইলখানেক (১'৬ কিলোমিটার) গিয়ে ডান-হাতি (পুবে) মোরামের রাস্তায় আরও আধ মাইল গেলে বেশ বড় গ্রাম কাদাসোলে পৌঁছনো যায়। বাঁকুড়া-দুর্গাপুর বাসে বড়জোড়ায় নেমে বাকি পথটুক হেঁটে বা সাইকেল রিকৃশয় যাওয়া চলে। প্রধান দ্রষ্টব্য, ঘড়ুই পরিবারের (মাহিষ্য) প্রতিষ্ঠিত এক ইটের তৈরি, দক্ষিণমুখী, অলংকৃত, পঞ্চরত্ন মন্দির ; বিগ্রহ শালগ্রামশিলারূপী বিষ্ণু। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪ ফুট ৬ ইঞ্চি (৪'৪ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০'৫ মিটার), এ দেবালয়ের পোড়ামাটির অলংকরণগুলি তিন-খিলানযুক্ত সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ ও খুবই সজীব। প্রতিষ্ঠালিপি নেই ; কিন্তু আকারপ্রকারে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে তৈরি মনে হয়। সামনের দেওয়ালের দু'পাশে ও কার্নিসের নীচ-বরাবর দু'সারি মূর্তি-ভাস্কর্য খোপের মধ্যে নিবদ্ধ ; বিষয়—নানান সামাজিক দৃশ্য, কৃষ্ণলীলা ও দশাবতার। কেন্দ্রীয় খিলানশীর্ষের রাসমণ্ডলটি খুবই সুন্দর ; পাশের খিলানশীর্ষ দু'টি বহু উদগত পদ্মের নকশায় সুশোভিত। দালান ও গর্ভগৃহের ছাদ, তিনটি ক'রে প্রশস্ত খিলানের ওপর স্থাপিত ; তাদের মধ্যেরটি পাশের দু'টির চেয়ে উঁচু। ছাদের ভার ধারণের জন্য এহেন ব্যবস্থা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ওপরে যাবার সিঁড়ি আছে।

কাস্তোড় : পাত্রসায়ের থেকে পিচের সড়কে ৭ মাইল (১১'৩ কিলো-মিটার) দক্ষিণ-পশ্চিমে জামকুঁড়ি ; সেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় আরও ৩ মাইল (৪'৮ কিলোমিটার) দক্ষিণে, দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে, পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত কাস্তোড় গ্রাম (জে. এল. নং ১২৩)। এখানকার গোপপাড়ায় বড়চক্রবাহিনী বা চক্রেশ্বরী দেবীর পাথরের মূর্তিটি এক অত্যাশ্চর্য পুরাবস্তু। ২৮½ ইঞ্চি ব্যাসের ও ৭½ ইঞ্চি পুরু পাথরের এক চক্রের দু'পিঠে 'রিলিফ' পদ্ধতিতে ক্ষোদিত, নৃত্যরত, অষ্টভুজ দু'টি নটরাজ মূর্তিকে গ্রামবাসীরা এখন দেবীজ্ঞানে, দুর্গার ধ্যানে

পূজা করেন। এহেন ভাস্কর্য তাবৎ ভারতবর্ষে দুর্লভ ; আমার-জানা ক্ষুদ্রতর আর একটিমাত্র আছে ছাতনা থানার দেউলভিড়্যায় (সংশ্লিষ্ট নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। জনশ্রুতি, কান্তোড়ের এ 'দেবী'মূর্তি আদিতে নাকি প্রদ্যুম্নপুরের রাজ পরিবারের কুলদেবী ছিলেন। সে রাজবংশের শেষ রাজাকে পরাজিত ক'রে মল্ল নৃপতি জয়মল্ল তাঁর রাজ্য জয় ক'রে নেন। (সংশ্লিষ্ট ইতিহাসের জন্য বর্তমান লেখক প্রণীত 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থের পৃঃ ১৭-২০ দ্রষ্টব্য)। তারপর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে তিনি নাকি তাঁর নির্মিত আর এক মন্দিরে এ 'দেবী'কে প্রতিষ্ঠিত করেন। কান্তোড় গ্রামপ্রান্তে অবস্থিত 'দেবী'র সেই প্রাচীন মন্দিরটি বহুকাল আগে দ্বারকেশ্বরের গর্ভে বিলীন হলে, গ্রামবাসীরা সে দেবালয়ের বড় বড় ঝামা-পাথরের চাঁই দিয়ে ঘন কুঞ্জের মধ্যে এক বেদী বানিয়ে তার ওপরে এখন মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটির নীচের কীলক পাদপীঠের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকাতে মনে হয় আদিতে এ মূর্তিটি বিগ্রহ হিসাবেই উপাসিত হয়েছে, মন্দির-সজ্জার অংশ ছিল না। অদূরে, পুরনো ইট-ছড়ানো এক ঢিবির ওপর রক্ষিত শিবলিঙ্গটি ষড়চক্রবাহিনীর ভৈরব বলে পরিচিত।

কৃষ্ণনগর : পাত্রসায়ের থানায়, পাত্রসায়ের থেকে মাইলখানেক (১·৬ কিলোমিটার) উত্তর-পুবে অবস্থিত বেশ বড় গ্রাম কৃষ্ণনগর। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর থেকে বাসে আসা যায়। খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে নির্মিত ইটের তৈরি কয়েকটি অলংকৃত মন্দির এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের ক্রমাবনতির সময়ে মিহি চুনের পলস্তারায় ঢাকা এক ভিন্ন জাতীয় অলংকরণের সূত্রপাত হয়েছিল। এই দুই শ্রেণীর সজ্জার যুগপৎ প্রয়োগ থেকে প্রথমটির বিদায় ও দ্বিতীয়টির আবির্ভাব বোঝা যায় বলে এ গ্রামের দেবালয়গুলি মন্দির-অলংকরণের ইতিহাসের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ময়রাপাড়ায় নাগ পরিবারের দক্ষিণ-মুখী, আটচালা, দামোদর মন্দিরে চুন-পলস্তারার অলংকরণই বেশী, 'টেরাকোটা'র কাজ অল্প। তাঁতিপাড়ায় প্রামাণিকদের পুবমুখী, নবরত্ন, রাধা-দামোদর মন্দিরে পুব ও দক্ষিণের খিলানশীর্ষে শুধু পোড়ামাটির নকশাই দেখা যায়। আবার, কুণ্ডুদের পুবমুখী, আটচালা দামোদর মন্দিরে কেবল চুন-পলস্তারার কাজই আছে, 'টেরাকোটা' সজ্জা নেই। শেষের মন্দিরটির কাছে সতরো-চূড়াযুক্ত ইটের দোলমঞ্চটির মত ইমারত গত শতকে বাঁকুড়া জেলার অম্বিকানগর, অযোধ্যা, কোতুলপুর, বেলিয়াতোড়, বিষ্ণুপুর, রাজগ্রাম, সোনামুখী প্রভৃতি স্থানেও নির্মিত হয়েছিল।

কোঙারপুর : কোতুলপুর-জয়রামবাটী-কামারপুকুর পিচের সড়কে, জয়রামবাটীর অদূরে 'মায়ের দীঘি' নামে পরিচিত পুষ্করিণীর পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তায় মাইল খানেক (১'৬ কিলোমিটার) দূরে, কোতুলপুর থানার অন্তর্গত সিহর ('সিহর' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) ও কোঙারপুর (জে. এল. নং ১৯২) পাশাপাশি গ্রাম। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি, মুখুজ্জ্যে-পাড়ার কৃষ্ণকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ইটের, দক্ষিণমুখী, পঞ্চরত্ন, রঘুনাথ (শালগ্রাম) মন্দির। কৃষ্ণকান্তের জনৈক পূর্বপুরুষ নাকি মল্ল-রাজপরিবারের কুলপুরোহিতের জামাই ছিলেন। সেই সূত্রে এ পরিবার বেশ কিছু জমিজমার মালিক হন। প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার) উচ্চতা ও ১৮ ফুট (৫'৪ মিটার) দৈর্ঘ্যপ্রস্থের এ মন্দিরের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর ও গর্ভগৃহের ছাদ চারদিকের দেওয়াল-সংলগ্ন চারটি খিলানের শীর্ষে গম্বুজের ওপর স্থাপিত। খাঁজকাটা ত্রি-রথ চূড়াগুলির মধ্যে কেন্দ্রেরটি তুলনায় অনেক বড়। ১৩৭১ বঙ্গাব্দে বহুলসংস্কৃত, পোড়ামাটির সামান্য অলংকরণযুক্ত, এ দেবালয়ের পাঁচ পংক্তির প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ : "সন ১১৯২ সন | উদযোগী শ্রীকৃষ্ণকান্ত | মুখোপাধ্যায় | শ্রীরামমোহন মিস্ত্রি | সাং বাখাটি।" বাখাটি কোঙারপুরের প্রায় ৪ মাইল (৬'৪ কিলোমিটার) পশ্চিমে, হুগলী জেলার বদনগঞ্জের কাছের এক গ্রাম। দেড়শ-দু'শ বছর আগে সেখানে যে কিছু মন্দির-গড়া শিল্পীর নিবাস ছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।

কোতুলপুর : বিষ্ণুপুর-আরামবাগ পিচ-রাস্তায় (শহর দু'টির মধ্যে নিয়মিত বাস চলাচল করে), বিষ্ণুপুর থেকে ২০ মাইল (৩২'২ কিলোমিটার) পুবে, কোতুলপুর থানার সদর কোতুলপুর বেশ বড় গ্রাম। এখানকার অনেকগুলি ছোটবড় মন্দিরের মধ্যে গুটি ছয়েক উল্লেখযোগ্য। গ্রামের দক্ষিণাংশে জগন্নাথপুর পাড়ায় 'ক্ষুদি রায়'-এর অলংকরণবিহীন, পুবমুখী, আটচালা, ইটের মন্দিরটি আনুমানিক এক শ বছরের প্রাচীন ও আকারপ্রকারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কাছাকাছি অঞ্চলে এ ধর্মঠাকুরের প্রবল প্রতাপ। পুরোহিত ব্যগ্রক্ষত্রিয়, উপাধি 'পণ্ডিত'। হালদারপাড়ায় হালদারদের (গন্ধবণিক) ইটের দক্ষিণমুখী, দালান-মন্দিরের (বিগ্রহ শালগ্রামরূপী বিষ্ণু) সামনের দেওয়ালের দু'পাশে ও কার্নিসের নীচে ভিন্ন ভিন্ন খোপে নিবদ্ধ পাথরের ভাস্কর্যগুলি ইটের ইমারতে অভিনব তো বটেই, কারিগরির দক্ষতায়ও উচ্চ শ্রেণীর। এগুলির বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, সামাজিক দৃশ্য

প্রভৃতি। দৈর্ঘ্যে ২০ ফুট ৬ ইঞ্চি (৬.২ মিটার), প্রস্থে ১৭ ফুট (৫.১ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ১৫ ফুট (৪.৫ মিটার), এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় এটি ১৬৯১ শকাব্দে (১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) নির্মিত। ভদ্রপাড়ায় ভদ্র পরিবারের বসতবাটির সংলগ্ন অনেকগুলি মন্দিরের মধ্যে পুবমুখী, পঞ্চরত্ন, শ্রীধর (শালগ্রাম-বিষ্ণু) ও পশ্চিমমুখী গিরিগোবর্ধন—ইটের এই দু'টি মন্দিরই প্রধান। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫ ফুট ৯ ইঞ্চি (৪.৭ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার), শ্রীধর মন্দিরের নির্মাণকাল ১২৪০ বঙ্গাব্দ (১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) ব'লে প্রতিষ্ঠাফলকে উৎকীর্ণ আছে। সামনের দেওয়ালে যথেষ্ট সংখ্যায় সামাজিক, পৌরাণিক, কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ-ঘটিত 'টেরাকোটা' অলংকরণ থাকলেও সেগুলি বেশ নবীন ধরনের। দৈর্ঘ্যে ১৫ ফুট (৪.৫ মিটার), প্রস্থে ১১ ফুট (৩.৩ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট (৭.৫ মিটার) গিরিগোবর্ধন মন্দিরের পোড়ামাটির সজ্জা সাধারণ শ্রেণীর কিন্তু সামনের ও দু'পাশের দেওয়ালে নিবদ্ধ চুনবালির দ্বারপাল, মোহন্ত, ইন্দ্র, ষড়ভুজ-কৃষ্ণ, কালী, কৃষ্ণকালী, বৃষবাহনা পার্বতী প্রভৃতির অতিকায় মূর্তিগুলি অভিনব। গিরিগোবর্ধন মন্দিরের স্থাপত্য সর্বত্র মোটামুটি একই রকম এবং 'অযোধ্যা' নিবন্ধে এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। 'টেরাকোটা' ও চুনবালির সজ্জার যুগপৎ ব্যবহার সম্পর্কে 'কৃষ্ণনগর' নিবন্ধে বলেছি, এই মিশ্রিত রীতি পোড়ামাটির অলংকরণের অবনতি নির্দেশ করে। কোতুলপুরের গিরিগোবর্ধন মন্দিরটি থেকেও সেকথা সমর্থিত হয়। কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় অনুমান হয় এটি শ্রীধর মন্দিরের সমকালীন। উত্তরপাড়া বা বেনেপাড়ায় ময়রা সম্প্রদায়ভুক্ত নন্দী পরিবারের ইটের, দক্ষিণমুখী, নবরত্ন, দামোদর (শালগ্রাম-বিষ্ণু) মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি (৫ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০.৫ মিটার)। ঢাকা বারান্দাসমেত সামনের অংশ বহুদিন আগে ভেঙে পড়ায়, গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বারের দু'পাশে দু'টি বৃহৎ 'টেরাকোটা' দ্বারপাল ছাড়া এখন এ মন্দিরে অন্য অলংকরণ বিশেষ নেই। পূর্বপাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ইটের দক্ষিণমুখী, পঞ্চরত্ন, শালগ্রাম-বিষ্ণু মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬ ফুট (৪.৮ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩২ ফুট (৯.৬ মিটার)। সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ পোড়ামাটির অলংকরণগুলি অনেকাংশে ভগ্ন ও স্থানান্তরিত হলেও, অবশিষ্টগুলির কারিগরি বেশ সুন্দর। শেষোক্ত দু'টি দেবালয়ে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। কিন্তু আকারপ্রকারে তারা খ্রীষ্টীয় আঠারো

শতকের শেষে বা উনিশ শতকের প্রথমে নির্মিত বলে মনে হয়। হালদারপাড়ার দালান-মন্দিরটি ছাড়া, অন্য সব ক'টিতে সামনের দালানের ছাদ 'ভল্ট'-এর ও গর্ভগৃহের ছাদ দেওয়াল-সংলগ্ন খিলান ও লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর স্থাপিত।

খটনগর : কোতুলপুর থেকে অতি দুর্গম কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৭ মাইল (১১'৩ কিলোমিটার) উত্তরে ন'নগরের ঘাটে দ্বারকেশ্বর নদ পার হয়ে আরও ১ মাইল গেলে ইঁদাস থানার অন্তর্গত খটনগর গ্রাম (জে. এল. নং ১০১)। গ্রামের দক্ষিণে, খোলা মাঠের মধ্যে, ইতস্তত-স্থাপিত ন'টি একরত্ন, আটচালা ও দেউল-রীতির ছোট ছোট ইটের মন্দির এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। পরিত্যক্ত এ দেবালয়গুলির অধিকাংশের গর্ভগৃহই এখন উইঢিবিতে সমাচ্ছন্ন ; শুধু একটির সংস্কার ক'রে এক শিবলিঙ্গ ও ছোট একটি বাসুদেবমূর্তির উপাসনার জন্য এক দালান-মন্দির নির্মিত হয়েছে সম্প্রতিকালে। সবচেয়ে যেটি বড় সেটি একরত্ন ও তার উচ্চতা ১৮ ফুট (৫'৪ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ৯ ফুট (২'৭ মিটার)। এ মন্দিরের সামনের দেওয়ালে বেশ কিছু 'টেরাকোটা' সজ্জা আছে (অন্য চারটির প্রবেশখিলানের ওপরেও সামান্য ফুলকারি অলংকরণ দেখা যায়) কিন্তু সেগুলি খুবই ক্ষয়িত ও সাধারণ কারিগরির। অপর একটি মন্দিরে, উইঢিবি-কবলিত, উপবিষ্ট এক পাথরের পুরুষমূর্তি (১৮ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি) আছে কিন্তু সেটি কুবেরের না অন্য কোন বিগ্রহের বলা শক্ত। একটিমাত্র দেবালয়ে নিবদ্ধ তিন পংক্তির প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ | সকাব্দাঃ | ১৬৯৬।" মনে হয়, সব ক'টি মন্দিরই ১৬৯৬ শকাব্দ (১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) বা তার কাছাকাছি সময়ে নির্মিত হয়েছিল। জনশ্রুতি, কোতুলপুরের জমিদার মজুমদার বংশের পূর্বপুরুষেরা এগুলির প্রতিষ্ঠাতা। অদূরে এক নীলকুঠির বসতবাটি ও কারখানার যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, সে সম্পর্কেও গ্রামবাসীরা সঠিক কিছু জানেন না।

গোকুলনগর : বিষ্ণুপুর-কোতুলপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) জয়পুর অতিক্রম ক'রে আরও মাইল তিনেক গিয়ে ডানহাতি কাঁচা রাস্তায় সলদা গ্রামের ভেতর দিয়ে প্রায় এক মাইল গেলে, জয়পুর থানার অন্তর্গত গোকুলনগর মৌজায় (জে. এল. নং ৪৩) অনুচ্চ এক প্রাচীন ঢিবির ওপর গন্ধেশ্বর শিবের পুবমুখী, সপ্তরথ, পাথরের দেউল-মন্দির। ইতস্তত-ছড়ানো পাথরের বড় বড় টুকরো ও ভগ্ন আমলকশিলা থেকে এখানে প্রাচীনতর এক পাথরের দেউলের অস্তিত্ব অনুমান করা

যায়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার) ও একই উচ্চতার এ দেবালয়ের শিবলিঙ্গ ও যোনিপট্টটি বাঁকুড়া জেলায় সর্ববৃহৎ হতে পারে। সংস্কারের ফলে বেশ আধুনিক দেখালেও, ছাদ চারচালা ধাপ-পদ্ধতিতে বিন্যস্ত। গর্ভগৃহের এক কোণে প্রায় ১½ ফুট (০·৫ মিটার) উচ্চতার পালযুগের এক অপূর্ব মহিষমর্দিনী মূর্তি রক্ষিত আছে।

এ মন্দির ছাড়িয়ে পায়েচলা পথে আরও সিকি মাইল গেলে পাথরের ভগ্নপ্রাচীর-ঘেরা অঙ্গনমধ্যে ল্যাটেরাইট-নির্মিত, পুবমুখী, পঞ্চ-রত্ন, গোকুলচাঁদের পরিত্যক্ত মন্দির। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৪৫ ফুট (১৩·৫ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪৫ ফুট (১৩·৫ মিটার), এ দেবালয়টি বাঁকুড়া জেলার পাথরের মন্দিরগুলির মধ্যে নানা দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, আয়তনে এটি সর্ববৃহৎ ; দ্বিতীয়তঃ, চারদিকে তিন-খিলানযুক্ত বারান্দা ছাড়াও গর্ভগৃহের চারদিকে এক প্রদক্ষিণপথ খুবই অভিনব ; তৃতীয়তঃ, পুব ও দক্ষিণের দেওয়ালে নিবদ্ধ দশাবতার প্রভৃতির বহু-সংখ্যক ভাস্কর্য খ্রীষ্টীয় সতরো শতকের অন্যান্য পাথরের মন্দিরে বড় একটা দেখা যায় না। ওপরে ওঠবার সিঁড়ি ছাড়াও লক্ষণীয় বিশেষত্ব আছে চূড়াগুলির গড়নে। কেন্দ্রেরটি তুলনায় অনেক বড় ও আটকোণা ; কোণেরগুলি চতুষ্কোণ, লঘু ও আশ্চর্য লাবণ্যযুক্ত। দালান চারটি ও প্রদক্ষিণপথের ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর এবং গর্ভগৃহ ও প্রধান চূড়াটির ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর ন্যস্ত। দক্ষিণের দেওয়ালে, কার্নিসের নীচে, খোদাই-পাথরের প্রতিষ্ঠালিপিটি থেকে জানা যায় যে বাঁকুড়া জেলার এই বৃহত্তম ল্যাটেরাইট মন্দিরটি প্রথম রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে, ৯৪৯ মল্লাব্দে (১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত হয়েছিল। এই বিশাল দেবালয় বীর হম্বীরের পূর্ববর্তী এক মল্ল রাজা চন্দ্রমল্লের প্রতিষ্ঠিত বলে যে জনশ্রুতি তা আরও অযৌক্তিক এইজন্য যে গোকুলচাঁদ অর্থাৎ কৃষ্ণের উপাসনার জন্য এত ব্যয়সাধ্য দেবালয় বীর হম্বীরের (রাজত্বকাল আনুমানিক ১৫৯১ থেকে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ) বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পরে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক।

অঙ্গনের দক্ষিণপ্রান্তের ভোগগৃহ অথবা অতিথিনিবাসটিও খুবই উল্লেখযোগ্য। ছাদ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লেও এর ৯ ফুট (২·৭ মিটার) পুরু পাথরের দেওয়ালগুলি এখনও অক্ষত আছে। তিনটি ৭ ফুট ৭ ইঞ্চি (২·৩ মিটার) চওড়া ফুলকাটা খিলান-সমন্বিত ও দৈর্ঘ্যে ৫৯ ফুট (১৭·৭ মিটার) ও প্রস্থে ৪১ ফুট (১২·৩ মিটার) এ ইমারতটির তুল্য বিশাল ভিত্তিবেদীর পাথরের সৌধ বাঁকুড়া জেলার কুত্রাপি

আর নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু জাতীয় উদাসীনতার ফলে, অতিথিশালা সমেত সমস্ত মন্দিরটিই এখন ধ্বংসের মুখে। গোকুলচাঁদের বিগ্রহ অন্তর্হিত হয়েছে বহুকাল। অন্যান্য পুরাবস্তুর মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখা কালো পাথরের যে বৃহৎ অনন্তবিষ্ণু মূর্তিটি এখান থেকে উদ্ধার ক'রে তাঁদের সংগ্রহশালায় রেখেছেন, তার তুল্য উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য এ জেলায় বিরল।

গোকুলচাঁদ মন্দিরের সামান্য উত্তরে এক ঘাটবাঁধানো পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে একটি ১৩ ফুট ৪ ইঞ্চি (৪ মিটার) প্রস্থচ্ছেদের সপ্তরথ ল্যাটেরাইট মন্দিরের ভিত্তির চিহ্ন দেখা যায়। পাশেই, ২ ফুট ৮ ইঞ্চি (০·৮ মিটার) উঁচু ও ১ ফুট ৮ ইঞ্চি (০·৫ মিটার) চওড়া সবুজ ক্লোরাইট পাথরের এক অপূর্ব বরাহ-অবতারের মূর্তি কিছুটা মাটিতে পোঁতা অবস্থায় পড়ে আছে। হাত-পা ভাঙা হলেও ভাস্কর্যটি উচ্চাঙ্গের ও খোদাই-করা অলংকরণগুলি এখনও খুব সজীব। মন্দিরটি হয়ত এ বিগ্রহের জন্যই নির্মিত হয়েছিল; স্থানীয় লোক তাঁকে ক্ষেত্রপালজ্ঞানে কালেভদ্রে দু'টো পুজোর ফুল দিয়ে যায়।

মূল মন্দিরের প্রায় আধ মাইল পশ্চিমে, গাছের গুঁড়িতে হেলান দেওয়া দু'তিনটি ক্ষয়িত, দিগম্বর, তীর্থংকরমূর্তি পড়ে আছে। কাছাকাছি কোন প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন নেই। মূর্তিগুলি কবে, কোথা থেকে, কিভাবে পাওয়া গেল, সে বিষয়ে কেউ কিছু জানে না।

ঘুটগেড়িয়া : বাঁকুড়া-দুর্গাপুর সড়কের (নিয়মিত বাস চলে) ধারে বড়জোড়া ; সেখান থেকে মালিয়াড়াগামী পিচের রাস্তায় প্রায় আড়াই মাইল (৪ কিলোমিটার) দূরে, বড়জোড়া থানার অন্তর্গত ঘুটগেড়িয়া গ্রামের (জে. এল. নং ২৪) বাইরে, রাস্তা থেকে সিকি মাইল পশ্চিমে, ধান ক্ষেতের মধ্যে এক ডাঙ্গা জমিতে, উড়িষ্যার খিচিং-স্থাপত্যশৈলীর হুবহু অনুকরণে নির্মিত পাথরের দক্ষিণমুখী রেখ-দেউলটি বাকুড়া জেলার এক বিশিষ্ট পুরাকীর্তি। নীচু ভিত্তিবেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত, উদ্গত অংশ সমেত দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি (৩·৫ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার), এ মন্দিরে গাঁথনির জন্য ল্যাটেরাইট ও অলংকরণের জন্য বেলেপাথর ব্যবহৃত হয়েছে। দেওয়াল ও শিখরের বিন্যাস পঞ্চরথ, চূড়ায় নিবদ্ধ চারদিকে চারটি লম্ফমান সিংহের মূর্তি ও শীর্ষে ছোট আয়তনের বেঁকি, আমলক ও কলস। প্রবেশপথের ওপরের ছাদ ও গর্ভগৃহের ছাদ ধাপযুক্ত চারচালা পদ্ধতিতে নির্মিত। ঠাকুরঘরের দেওয়ালে উৎকৃষ্ট পত্থের

পলস্তারা এখনও দেখা যায়। গাঁথনির জন্য মিহি চুনবালির মশলা পাতলা স্তরে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ দেবালয়টি খ্রীষ্টীয় সতরো শতক বা তারও পরে মল্লরাজকুলের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। দু'তিন শ বছর আগে এ অঞ্চলে এমন বিত্তবান কেউ ছিলেন না যাঁর একক প্রচেষ্টায় এহেন ব্যয়সাপেক্ষ কীর্তি স্থাপন সম্ভব ছিল। মল্লরাজারা তাঁদের রাজ্যসীমানার মধ্যে অধীনস্থ সামন্তদের অনুরোধে বা স্থানীয় জনসাধারণকে তুষ্ট রাখবার জন্য রাজধানী বিষ্ণুপুর থেকে বহু দূরেও যে কিছু কিছু মন্দির তৈরি করিয়ে দিয়েছেন এমন বহু নিদর্শন আছে। কোথাও প্রতিষ্ঠালিপিতে মল্ল নৃপতির নাম উল্লিখিত হয়েছে, যেমন ওঁদা থানার বিক্রমপুরে, গঙ্গাজলঘাটি থানার রণিয়াড়ায়, তালডাংরা থানার সাত্রাকোণে বা পাত্রসায়ের থানার বীরসিংহে; আবার কোথাও, অজ্ঞাত কারণে, প্রতিষ্ঠালিপি ব্যবহৃতই হয়নি (বা অপসৃত হয়েছে), যেমন ওঁদা থানার এল্যাটিতে, কোতুলপুর থানার সিহরে, তালডাংরা থানার হাড়মাসড়ায় বা বড়জোড়া থানার ঘুটগেড়িয়ায়। আলোচ্য দেউলটি বিষ্ণুপুরের কোন মল্ল রাজার তৈরি একথা মনে করবার আরও কারণ আছে। মন্দিরে এখন বিগ্রহ নেই কিন্তু ফুলকাটা-খিলানের উদ্গত প্রবেশদ্বারটিকে ঘিরে বেলে পাথরের যে সূক্ষ্ম ভাস্কর্যগুলি নিবদ্ধ আছে তা অবিকল 'টেরাকোটা'-শৈলীতে কল্পিত ও ইন্দ্র, ব্রহ্মা, অনন্তবিষ্ণু, দিক্‌পাল প্রভৃতির কিছু পৌরাণিক মূর্তি থাকলেও অধিকাংশই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক। এ থেকে অনুমান করা চলে, রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত কৃষ্ণপূজা প্রচলনের জন্যই বীর হম্বীরের পরবর্তী কোন মল্ল রাজা এটির প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকবেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ায় সৌধটি মোটামুটি ভাল অবস্থাতেই আছে।

ছাতনা: বাঁকুড়া-পুরুলিয়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বাঁকুড়া থেকে ৮ মাইল (১৩ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে, ছাতনা থানার সদর, ছাতনা গ্রাম। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য, প্রায় ১৬০ ফুট (৪৮ মিটার) দীর্ঘ ও ১৩৫ ফুট (৪০·৫ মিটার) প্রস্থ এক ভাঙা প্রাচীর-ঘেরা প্রাঙ্গনের মধ্যে চণ্ডীদাস-উপাসিত বাসলি দেবীর মন্দিরের ভিত্তিবেদী ও ইতস্তত-ছড়ানো প্রাচীন ইমারতের নানান ধ্বংসাবশেষ। চণ্ডীদাসের নিবাস প্রসঙ্গে একদা যে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছিল তা থেকে মোটামুটি সিদ্ধান্ত হয়েছে এই যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা বাসলি-

উপাসক বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন ছাতনার অধিবাসী আর সুললিত পদকর্তা, সহজসাধক দ্বিজ চণ্ডীদাসের নিবাস ছিল বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে। (সে সাহিত্যিক আলোচনার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় কিছুদিন আগে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন, দ্বিজ চণ্ডীদাস আদিতে বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং পরবর্তী কালে নান্নুরে এসে বসতি করেন)।

বাসলি মন্দিরের ভিত্তিবেদী ছাড়া এখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই ; তার পশ্চিম অংশে পাথরের সিঁড়ির কয়েকটি সমান্তরাল ধাপ আছে ও বাকী অংশ পাতলা ইট দিয়ে ঘেরা। বেদীর বর্তমান উচ্চতা চার ফুটের (১·২ মিটার) বেশী না হলেও এখানকার ইটগুলি অভিনিবেশ-যোগ্য। দু'ইঞ্চি (৫ সেন্টিমিটার) পুরু ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে প্রায় সাত ইঞ্চি (১৮ সেন্টিমিটার) মাপের এ ইটগুলির গায়ে '১৪৭৫ শক' ও 'উতর হমির রাজা' এই কথাগুলি অনেক ক্ষেত্রে ক্ষোদিত আছে। অতএব, মন্দিরটি যে ১৪৭৫ শকাব্দে, অর্থাৎ ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, নির্মিত হয়েছিল এমন প্রমাণ মেলে এবং তার ভিত্তিতে এটিকে বাঁকুড়া জেলার প্রাচীনতম ইটের মন্দিরগুলির অন্যতম বলে সাব্যস্ত করা যেতে পারে। মিঃ বেগলারের ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ভ্রমণের ভিত্তিতে, আর্কিঅলজি-ক্যাল সার্ভে রিপোর্টের অষ্টম খণ্ডে, এখানে একাধিক পাথরের মন্দিরের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে যদিও ইটের দেবালয়গুলি সে সময়ের পূর্বেই ধ্বংস হয়েছিল। ইটের ভিত্তিবেদীসম্বল বর্তমান মূল মন্দিরটি কি তবে বেগলারের দেখা পাথরের সৌধগুলির একটি ? তাহলে সিদ্ধান্ত করতে হয় ভিত্তিবেদীর গাঁথনিতে ইটের ব্যবহার হলেও এ ইমারতটি আদিতে পাথরের টালি দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল। গ্রামের মধ্যে একটি ও গ্রামপ্রান্তের রাজগড় এলাকায় আরও তিনটি পাথরের আমলক-শিলার অস্তিত্ব থেকে মিঃ বেগলারের উক্তির সমর্থন মেলে যে এখানে আদিতে একাধিক পাথরের দেউল ছিল। ভগ্ন ভিত্তিবেদীটির সামনে (পশ্চিমে) পাথরের দু'টি বড় চৌকাঠ ও পুব দিকে, কিছু দূরে, অনুরূপ আরও দু'টি চৌকাঠ একই সিদ্ধান্তের পরিপোষক। ভিত্তিবেদীটি এখন এতই অবিন্যস্ত যে রথ-পগের সংখ্যা অনুমান করা যায় না। পাথরের চৌকাঠগুলির গায়ে পদ্মের বড় বড় 'বা-রিলিফ' নকশা থেকে মনে হয় মন্দিরে অনুরূপ অলংকরণের হয়ত আরও ব্যবহার হয়েছিল। সম্প্রতিকালে, মূল মন্দিরের দক্ষিণ-পুবে হরিনাম সংকীর্তনের

জন্য এক খোলা দালান নির্মিত হয়েছে যার মেঝেতে কিছু পরিমাণ সাবেক ইট সাজানো আছে। প্রাঙ্গনের উত্তর-পুব কোণে এক আধুনিক ইটের কুঠুরিতে অবয়বহীন কয়েকটি পাথরের টুকরোর মধ্যে একটিকে বাসলি বলে পূজা করা হয়। 'আটবাইচণ্ডী' নিবন্ধে সেখানকার বাসলি দেবীই যে খ্রীষ্টীয় ষোল শতকে ছাতনায় স্থানান্তরিতা হয়েছিলেন এই মর্মে এক জনশ্রুতির উল্লেখ করেছি।

১ গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে, রাজগড় এলাকায়, ধ্বংসস্তূপে পরিণত এক ইটের মন্দির ও তার পাশে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আর একটি দক্ষিণমুখী ইটের পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা যায়। জনশ্রুতি, বাসলি-মূর্তি চণ্ডীদাস-ভিটার আদি মন্দির থেকে প্রথমে ভগ্ন দেবালয়টিতে এনে রাখা হয় ও সেটি বিনষ্ট হলে তাঁকে পঞ্চরত্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমান মূর্তিটি দেবী বাসলির আদি বিগ্রহ কিনা বলা যায় না। কালো পাথরের পাটার ওপর 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে ক্ষোদিত ভাস্কর্যটি কিছু ক্ষয়িত হলেও যে এক শাক্ত দেবীর তা বোঝা যায়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি (৫ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট (৭·৫ মিটার), বর্তমান মন্দিরটিতে কিছু 'টেরাকোটা' মূর্তি-সজ্জা নিবদ্ধ আছে। তাদের নিকৃষ্ট কারিগরি থেকে সন্দেহ থাকে না যে এ অঞ্চলে 'টেরাকোটা' শিল্পের তখনই অবনতির দশা শুরু হয়েছিল।

জগন্নাথপুর : বাঁকুড়া-দুর্গাপুর সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বেলিয়াতোড় অতিক্রম ক'রে প্রায় ৫ মাইল (৮ কিলোমিটার) যাবার পর, পুবমুখী কাঁচা রাস্তায় আরও ৪ মাইল (৬·৪ কিলোমিটার) গেলে, বড়জোড়া থানার অন্তর্গত জগন্নাথপুর গ্রাম (জে. এল. নং ১৮১)। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি রত্নেশ্বর শিবের মাকড়া পাথরের রেখ-দেউল, আকারপ্রকারে যেটিকে খ্রীষ্টীয় সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত বলে মনে হয়। শিখরের দেওয়াল, চূড়ার কিছু নীচে, হঠাৎ বেঁকে শীর্ষবিন্দুতে এসে মিলেছে ও তার ওপরে পলকাটা এক বৃহৎ আমলক-শিলা স্থাপিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫ ফুট ৬ ইঞ্চি (৪·৭ মিটার) ও উচ্চতায়, প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার), দক্ষিণমুখী এ মন্দিরের খুব পুরু দেওয়ালের পাদদেশে এক প্রস্থ ও তার কিছু ওপরে আর এক প্রস্থ উদ্গত অংশের বিন্যাস বেশ অভিনব। এক-দুয়ারী এ দেবালয়ের ছাদ ধাপযুক্ত চারচালা পদ্ধতিতে নির্মিত। কোন প্রতিষ্ঠালিপি বা অলংকরণ নেই ; ল্যাটেরাইট পাথরের গাঁথনির ওপর চুনবালির পলস্তারা। জনশ্রুতি, রত্নেশ্বর নামে এক শৈব-সাধক এখানে দীর্ঘকাল

কঠোর তপস্যা ক'রে দেহরক্ষা করেন বলে তাঁর নাম থেকে নাকি শিবের নামকরণ হয়েছে। কুণ্ডমধ্যে স্থাপিত লিঙ্গটি দেখতে বেশ প্রাচীন ও অনাদি-লিঙ্গ বলে খ্যাত। এ অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে রত্নেশ্বর শিবের প্রসিদ্ধি তাঁর বার্ষিক গাজন উৎসবের সমারোহের জন্য যখন এখানে বেশ বড় মেলা বসে ও শত শত ভক্ত্যা তীক্ষ্মমুখ লোহা বা বাঁশের শলা দিয়ে বুক, পিঠ বা হাতের চামড়া অথবা জিভ বিদ্ধ ক'রে 'বাণ-ফোঁড়া' অনুষ্ঠান পালন ক'রে থাকেন। পিঠে বঁড়শি বিঁধিয়ে চড়ক উৎসব এখন বন্ধ হয়ে গেলেও অনার্যরীতি-প্রসূত 'বাণ-ফোঁড়া' প্রথার জনপ্রিয়তা এখনও কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। এ অনুষ্ঠানের সময় ভক্ত্যাদের কেন যে নারীসুলভ রঙিন পরিধেয় ও সজ্জায় ভূষিত করা হয় তা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানযোগ্য। সরকারীভাবে সংরক্ষিত না হলেও, গাজন উপলক্ষে দীর্ঘকাল জন-সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে বলে মন্দিরটি এখনও বেশ ভাল অবস্থায় আছে।

জয়কৃষ্ণপুর: বিষ্ণুপুর-সোনামুখী পিচের রাস্তায় (শীতগ্রীষ্মে নিয়মিত বাস চলে), বিষ্ণুপুরের প্রায় ৪ মাইল (৬·৪ কিলোমিটার) দূরে, দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে, রাস্তার বাঁ পাশে, বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত জয়কৃষ্ণপুর (জে. এল. নং ১১২) ও পাইকপাড়া (জে. এল. নং ১১১) ভিন্ন নামে পরিচিত হলেও কার্যতঃ একই গ্রাম। এখানে যে পরিমাণ ছোট ছোট মন্দির আছে তার তুলনা, খোদ বিষ্ণুপুর ছাড়া, বাঁকুড়া জেলার অন্যত্র দুর্লভ। মল্ল রাজাদের আমল থেকেই রাজধানীর অদূরবর্তী এ গ্রামে বহু সম্পন্ন ভূস্বামীর বাস। ইট ও কোন কোন ক্ষেত্রে মাকড়া পাথরে নির্মিত দেউল, একরত্ন, পঞ্চরত্ন, দালান প্রভৃতি শ্রেণীর প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি মন্দির প্রধানতঃ তাঁদেরই কীর্তি। এদের মধ্যে বেশ কিছু যে 'মানতের মন্দির' এমনই মনে হয়। সস্তায়, মানসিকের পূজার অনুকরণে, সেকালের বিত্তবানেরা অভীষ্ট পূর্ণ হলে দেবতার নামে জলাশয় খনন বা ছোটখাট. মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিতেন। এতে যে খুব বেশী ব্যয় হত এমন মনে হয় না। বীরভূম জেলার নানুর থানার চারকলগ্রাম নামে এক দূরবর্তী পল্লীতে ১২৪৫ বঙ্গাব্দে নির্মিত বেশ বড় আয়তনের 'টেরাকোটা'-সজ্জিত এক পঞ্চরত্ন মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে উল্লিখিত আছে—"এই কারখানার খরচ হরেক দফায় ৪৪৫।৶৹"। সে তুলনায় আলোচ্য মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে এক শ টাকাও হয়ত লাগেনি। জয়কৃষ্ণপুরের মত

ছোট মন্দিরের সংখ্যাধিক্য কোতুলপুর ও সোনামুখীতেও অল্পবিস্তর দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে-গলিতে এজাতীয় মন্দির যে কত আছে তার সীমাসংখ্যা নেই অথচ সাধারণ দর্শক, এমন কি গবেষণা-অভিমানীরাও, সেখানকার প্রধান পুরাকীর্তিগুলি দেখেই ফিরে আসেন। এই অবহেলিত, অথচ সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, ছোট মন্দিরগুলির দিকেও প্রকৃত গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

জয়রামবাটীঃ উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি বিশেষ কিছু না থাকলেও, জেলার বাইরের লোকের কাছে জয়রামবাটীর খ্যাতি সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুরের পরেই। বিষ্ণুপুর-কোতুলপুব সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কোতুলপুরে এসে, দক্ষিণ-পুবমুখী পিচের রাস্তায় আরও ৫½ মাইল (৯ কিলোমিটার) গেলে, কোতুলপুর থানার অন্তর্গত ছোট গ্রাম জয়রামবাটী (জে. এল. নং ১৯৪)। কলকাতার দিক থেকে বরাবর পিচের রাস্তায় আরামবাগ, কামার-পুকুর হয়েও আসা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহধর্মিণী সারদামণি দেবী ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও অল্প বয়সেই ৩ মাইল (৪·৮ কিলোমিটার) দূরের কামারপুকুর গ্রামের গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পরমহংসদেব যাঁকে তাঁর যাবতীয় সাধনা ও সিদ্ধির মূল উৎস বলে বর্ণনা করেছেন, ভারতীয় নারীত্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিস্বরূপা সেই সারদামণি দেবীর স্মৃতির উদ্দেশে রামকৃষ্ণ মিশন এখানে এক আধুনিক স্মারক-সৌধ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন। সেখানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমা'র সুন্দর মর্মরমূর্তিটি দর্শনের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে লোকসমাগমের বিরাম নেই। গ্রামপ্রান্তে 'মায়ের দীঘি' নামে প্রশস্ত ঘাট-বাঁধানো এক বিরাট জলাশয়ও এখানকার আর এক দ্রষ্টব্য। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সংরক্ষিত শ্রীমা'র ব্যবহৃত দু'টি বসতবাটীর প্রথমটিকে, প্রাচীনত্বের দিক থেকে, পুরাকীর্তি বলা যায়। সে বাড়ির বিজ্ঞপ্তি-লিপিটি নিম্নরূপঃ "শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন বাড়ী। আনুমানিক ১২৭০ সাল হইতে ১৩২২ সাল পর্যন্ত, ইং ১৮৬৩ সাল হইতে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত, প্রায় বাহান্ন বৎসর কাল এই ঘরখানিতে শ্রীশ্রীমা বসবাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বহু সন্তানকে মহামন্ত্র, ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি দানে কৃপা করিয়াছিলেন।" অদূরের দ্বিতীয় কুটীরে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি-লিপিটি নিবদ্ধ আছেঃ "শ্রীশ্রীমায়ের নূতন বাড়ী (পুণ্যপুকুরের তীরে অবস্থিত)। ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সাল হইতে ১৩২৬ সাল পর্যন্ত, ইং ১৯১৬ সালের ১৫ই মে হইতে ১৯২০ সালের

২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, শ্রীশ্রীমা এই বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ এই গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।...”

গ্রামের আর এক প্রান্তে টিনের আটচালা-মন্দিরে এ অঞ্চলের বিখ্যাত লৌকিক দেবী সিংহবাহিনী অধিষ্ঠিতা। পুরাতন পাকা মন্দিরটি ভেঙে পড়ায় তাঁকে বর্তমান মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে কাঠের সিংহাসনে স্থাপিত পিতলের বড় ফুলদানির মত তিনটি পাত্রের গায়ে চোখ-নাক-আঁকা বিগ্রহ দুর্গার ধ্যানে উপাসিত হয়। পুরনো মন্দির-ভিত্তির মন্ত্রপূত মাটি সাপেকাটা, গরল, বিষাক্ত ঘা প্রভৃতি অলৌকিকভাবে আরোগ্য করে বলে ভক্তজনের বিশ্বাস।

জামকুঁড়ি: বিষ্ণুপুর-পাত্রসায়ের পিচের রাস্তায় (শীতগ্রীষ্মে নিয়মিত বাস চলে), পাত্রসায়েরের প্রায় ৭ মাইল (১১·৩ কিলোমিটার) আগে, বাঁ-হাতি, পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত গ্রাম জামকুঁড়ি (জে. এল. নং ৯৮)। খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষ দিকে, মল্ল-সিংহাসনের অন্যতম দাবীদার দামোদর সিং এখানে যে দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করেন আজ তার আর বিশেষ কোন চিহ্ন নেই। পুরাকীর্তি বলতে এখন কিছু না থাকলেও, এ প্রাচীন গ্রামটি থেকে অনেকগুলি পাথরের বাসুদেব ও তীর্থংকর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যার কয়েকটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখায় রক্ষিত আছে। ‘সূত্রধর’ উপাধি-ধারী এখানকার কিছু পটুয়া এখনও সাবেক পদ্ধতিতে চণ্ডী-পট এঁকে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গ্রামে গ্রামে বা মেলায় তা দেখিয়ে গান গেয়ে বেড়ান। মধ্যযুগীয় বাংলাদেশে এই ‘সূত্রধর’-শিল্পীরাই “কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্র” এই চারটি মাধ্যমে যুগপৎ কাজ করতেন। বহু বাংলা-মন্দিরে খোদাই-কাঠের নকাশি দরজা, বিগ্রহ ও পোড়ামাটির অলংকরণ আজও তাঁদের বহুমুখী নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করছে।

জিবটা: বিষ্ণুপুর-কোতুলপুর সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কোতুলপুরে এসে, কামারপুকুরগামী পিচের রাস্তায় জয়রামবাটী অতিক্রম ক'রে আরও আধ মাইল গেলে, পথের ডান পাশে (পশ্চিমে), কোতুলপুর থানার অন্তর্গত জিবটা গ্রাম (জে. এল. নং ১৯৭) বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার প্রায় সীমানায় অবস্থিত। কামার-পুকুরের দিক থেকে এলে, জয়রামবাটীর ঠিক আগের বাঁ-হাতি গ্রাম। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি, ১২৪০ বঙ্গাব্দে (১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রতিষ্ঠিত, স্থানীয় রায় পরিবারের (সদগোপ) দক্ষিণমুখী, পঞ্চরত্ন, দামোদর (শালগ্রাম) মন্দির। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫ ফুট (৪·৫ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট (৭·৫ মিটার), ইটের তৈরি এ দেবালয়ের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর ও গর্ভগৃহের ছাদ পুব-পশ্চিম প্রান্তের 'ভল্ট' ও খিলান এবং কেন্দ্রীয় গম্বুজের ওপর স্থাপিত। কৃষ্ণলীলা, লঙ্কাযুদ্ধ, দশাবতার, পৌরাণিক কাহিনী ও দেবদেবী-সম্পর্কিত পোড়ামাটির অলংকরণগুলি শুধু সামনের দেওয়ালেই নিবদ্ধ। সেগুলি এজাতীয় প্রাচীনতর সজ্জার সূক্ষ্মতা ও লালিত্য-বর্জিত স্থূল কারিগরির পরিচায়ক।

এ দেবালয়ের সংলগ্ন পশ্চিমে চুনবালির পলস্তারা-আবৃত দু'টি ছোট আটচালা শিবমন্দির বা পুবের এক দুর্গা-দালান অনুল্লেখযোগ্য হলেও শেষের ইমারতটির প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে ৮০ বছর আগেও বাংলাদেশে হিন্দুর দেবালয় নির্মাণে মুসলমান মিস্ত্রী নিয়োজিত হত। লিপিটির সংশ্লিষ্ট অংশের পাঠ নিম্নরূপ: "এই দালান জগন্নাথ রায়ের যত্নে প্রস্তুত হইল। সমাপ্ত ১২৯৭ সাল। মিস্ত্রি শ্রীপানাউল্লা কাজি দিং। সাং তাজপুর।"

জোতবিহার: খটনগরের ('খটনগর' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) ২ মাইল (৩·২ কিলোমিটার) পুবে ইঁদাস থানার অন্তর্গত জোতবিহার গ্রাম (জে. এল. নং ১০২)। এ পথটুকু দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীর বরাবর কাঁচা রাস্তায় হেঁটে যাওয়াই প্রশস্ত। এখানকার পুরাকীর্তি, নদীতীরে অবস্থিত, পাথরের দু'টি ভগ্ন রেখ-দেউল। এছাড়া, গ্রামের মধ্যে দু'একটি ছোট 'টেরাকোটা' মন্দিরও আছে। (এ নিবন্ধের উপাদান বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীমানিকলাল সিংহের কাছ থেকে প্রাপ্ত)।

জোড়দা: ইঁদপুর থেকে পুরুলিয়া জেলার মানবাজারগামী মোরামের রাস্তায় (বাস চলে) প্রায় ৬ মাইল (৯·৭ কিলোমিটার) পশ্চিমে, ইঁদপুর থানার অন্তর্গত জোড়দা গ্রাম (জে. এল. নং ৪৬)। পল্লীর পশ্চিমপ্রান্তে 'ব্রহ্মাথান' নামে পরিচিত জায়গায় গাছের নীচে অনেকগুলি পাথরের মূর্তি (সম্ভবতঃ জৈন) জড়ো ক'রে রাখা আছে বলে নির্ভরযোগ্যসূত্রে শুনেছি।

টুজি: জোড়দা থেকে মানবাজারগামী রাস্তায় (বাস চলে) প্রায় ৩ মাইল (৪·৮ কিলোমিটার) পশ্চিমে, ইঁদপুর থানার অন্তর্গত, অপেক্ষাকৃত পরিচিত ব্রাহ্মণডিহার পাশের গ্রাম টুজি (জে. এল. নং

৪১)। বিশ্বস্তসূত্রের খবর, সেখানেও কিছু পাথরের মূর্তি (সম্ভবতঃ জৈন) পল্লীর ইতস্ততঃ রক্ষিত আছে।

ডিহর : বিষ্ণুপুর-সোনামুখী পিচের সড়কে (শীতগ্রীষ্মে বাস চলে), বিষ্ণুপুর থেকে ৪ মাইল (৬·৪ কিলোমিটার) দূরে, দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে জয়কৃষ্ণপুর গ্রাম ; সেখান থেকে পুবমুখী কাঁচা রাস্তায় নায়ের ও জনতা গ্রাম অতিক্রম ক'রে প্রায় ৩ মাইল (৪·৮ কিলোমিটার) গেলে, বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ডিহর (জে. এল. নং ১৩৬)। কঙ্কর জাতীয় নিকৃষ্ট ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত এখানকার ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিব-মন্দির দু'টি বাঁকুড়া জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে এক উচ্চ ভূমির উত্তর অংশে অবস্থিত ষাঁড়েশ্বর মন্দিরটি আয়তনে বড় ; উদ্গত অংশ বাদ দিয়ে, পাদদেশের মাপ দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯ ফুট (৫·৭ মিটার) আর দক্ষিণ দিকের শৈলেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ মাপ ১৪ ফুট ৬ ইঞ্চি (৪·৪ মিটার)। মন্দির-মূলের সমান্তরাল শিরগুলি খুবই বলিষ্ঠ ; আসল দেওয়াল থেকে প্রায় আড়াই ফুট (·৮ মিটার) বাইরে প্রসারিত। পশ্চিমমুখী দু'টি মন্দিরই এখন প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার) উচ্চতায় শিখরের গোড়া থেকে ভগ্ন বলে, কেউ কেউ অনুমান করেন এগুলি আদিতে হয়ত সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হয়-নি। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত মনে হয়। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মিডিভ্যাল স্কালপচার' গ্রন্থে লিখেছেন— "মন্দির দু'টির নিম্নাংশে বিশেষ কোন অলংকরণ নেই, শুধু কেন্দ্রীয় 'রথ'গুলির গায়ে, এক একটি কুলুঙ্গির ঠিক ওপরে, রেখ-দেউলের ছোট ছোট অনুকৃতি উৎকীর্ণ আছে। এসব প্রতীক-চিহ্ন থেকেই ইমারতের সাবেক রূপটি ধরা পড়ে।" বহুলাড়ার রেখ-দেউলের গায়ে এরকম প্রতীক-মন্দিরের ভাস্কর্য নিবদ্ধ আছে ; এক্তেশ্বর মন্দিরেও তাই। এক্তেশ্বর মন্দিরের বর্তমান চেহারা ভিন্ন হলেও এই সূত্র থেকেই পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে আদিতে এটিও রেখ-দেউলই ছিল। একই নজিরে, ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিব-মন্দির দু'টি যে রেখ-দেউল পদ্ধতিতেই নির্মিত হয়েছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। কোন অজ্ঞাত কারণে এদের চূড়া ভেঙে পড়েছে বলে, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের রক্ষণাধীনে বর্ষার জল নিরোধের জন্য এদের ছাদ এখন সিমেন্ট পলস্তারা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মন্দির দু'টির বয়স নিয়ে মতভেদ আছে। স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিশ্লেষণ ক'রে শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এদের নির্মাণকাল খ্রীষ্টীয়

এগারো শতকের প্রথমার্ধে। কাছাকাছি অবস্থিত একই স্থাপত্য-পদ্ধতির সোনাতপল ও বহুলাড়ার ইটের দেউলগুলিও সমসাময়িক কালের বলে স্বীকৃত হওয়ায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তির হয়ত কিছু সমর্থন মেলে। কিন্তু আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের পূর্ব-বিভাগের তৎকালীন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডি. বি. স্পুনার তাঁর ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে, ষাঁড়েশ্বর মন্দিরের প্রবেশখিলানের ওপর নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠা-ফলক (সংস্কারের সময় এটি নাকি ঢাকা পড়েছে) ও তাঁর পরিচিত জনৈক শিবদাস ভট্টাচার্যের কাছে রক্ষিত বিষ্ণুপুর রাজবংশের কুলপঞ্জীর নজিরে দেখিয়েছেন যে মল্ল নৃপতি পৃথ্বী মল্ল ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি এ মন্দির দু'টি নির্মাণ করেন। মোটামুটি একই সময়ে সুলতান সিকন্দর শাহ্ বাংলাদেশে মুসলিম রাজত্ব ভালভাবে কায়েম ক'রে বিশাল আদিনা মসজিদটি তৈরি করছিলেন পাণ্ডুয়ায়। সে সময়ে সুবে বাংলায় পরধর্মসহিষ্ণুতা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাওয়ায় ও রাজনৈতিক স্থায়িত্বের জন্য হিন্দু রাজাদের পক্ষে তখন বড় স্থাপত্যকীর্তিতে হাত দেওয়ার বিশেষ কোন বাধা ছিল না। শৈলেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে সম্প্রতি-আবিষ্কৃত এক বেনুকৃষ্ণের মূর্তিও এবিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারের ৫৩৭ পৃষ্ঠায় এ আবিষ্কারের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ষোল শতকের শেষে বীর হম্বীরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পরে মল্লভূমে কৃষ্ণপূজার সবিশেষ প্রচলন হয়। কিন্তু তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই কৃষ্ণভক্তি, ভাগবতপাঠ প্রভৃতি যে এ অঞ্চলে সমাদৃত হচ্ছিল এমন প্রমাণ আছে। সেক্ষেত্রে, মিঃ স্পুনার-কথিত ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মন্দিরে যদিও বা বেনুকৃষ্ণের মূর্তি উৎকীর্ণ হতে পারে, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়-কথিত এগারো শতকের প্রথমার্ধের মন্দিরে তা কখনই সম্ভব নয়। এসব সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মন্দির দু'টির বয়স সম্পর্কে মিঃ স্পুনারের মতটিই বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

ডিহর বাঁকুড়া জেলার প্রধান শৈব-তীর্থগুলির অন্যতম। প্রতিষ্ঠা-কাল থেকেই শিবলিঙ্গ দু'টির পূজা ও মন্দির-প্রাঙ্গনে বার্ষিক গাজন উৎসব একাদিক্রমে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আজও শিবই যে বাঁকুড়ার সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা তার প্রমাণস্বরূপ এখানে লোকে লোকারণ্য হয় চৈত্র-সংক্রান্তির পুণ্যদিনে।

যোগাযোগ : ইঁদাস থানার সদর ইঁদাস থেকে (বাঁকুড়া শহরের সঙ্গে নিয়মিত বাস-সার্ভিস দ্বারা যুক্ত) কাঁচা রাস্তায় ৬ মাইল (৯·৭

কিলোমিটার) পুবে ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি তৈরির সুপরিচিত কেন্দ্র সাসপুরের সংলগ্ন গ্রাম ডোঙ্গালন (থানা-ইঁদাস; জে. এল. নং ৯১)। বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলপথের সাসপুর স্টেশনে নেমে মাইল তিনেক (৪·৮ কিলোমিটার) পথ কাঁচা রাস্তায় হেঁটে আসাই প্রশস্ত। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি, রায় (কায়স্থ) পরিবারের পুবমুখী, আটচালা, রাধাবল্লভ জীউর মন্দির। বিগ্রহ কৃষ্ণরাধিকা নিত্যউপাসিত ও সেই কারণে দেবালয়টি একবার সংস্কৃত হয়েছে ও মোটামুটি ভাল অবস্থায় আছে। প্রতিষ্ঠালিপিটি অস্পষ্ট, কিন্তু আকারপ্রকারে মন্দিরটিকে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলে মনে হয়। উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬ ফুট ৪ ইঞ্চি (৫ মিটার), এ ইমারতের ভিত্তি, থাম ও দেওয়ালের নীচের অংশে ইট ও মাকড়া পাথরের যুগপৎ ব্যবহার অভিনব। ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর ও গর্ভগৃহের ছাদ ধাপযুক্ত চারচালার ওপর রক্ষিত। খোপে নিবদ্ধ এক সারি পোড়ামাটির ভাস্কর্য সামনের দেওয়ালের দু'পাশে ও কার্নিসের নীচ বরাবর ঘুরে এসেছে। কারিগরির দিক থেকে আধুনিক ও স্থূল, এ 'টেরাকোটা' মূর্তিগুলিতে কৃষ্ণলীলা, নানাবিধ সমাজিক ও পৌরাণিক বিষয়বস্তু রূপায়িত।

তেজপাল : বিষ্ণুপুর শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ২ মাইল (৩·২ কিলোমিটার) পশ্চিমে, কালিন্দী বাঁধের তীরে তেজপাল পল্লী। বিষ্ণুপুর থেকে বাঁকুড়াগামী বাসে বা সাইকেল রিক্শয় যাওয়া যায়। এখানকার পশ্চিমমুখী, ঝামা পাথরের আটচালা রাধাকৃষ্ণ মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৬ ফুট (৭·৮ মিটার)। বাঁকুড়া জেলায় পাথরের আটচালা মন্দির খুব কমই নির্মিত হয়েছে; সাত্রাকোণ, সিমলাপাল, পাত্রসায়ের, বালসী প্রভৃতি স্থানে মুষ্টিমেয় আর কয়েকটি নিদর্শন মেলে। খাস বিষ্ণুপুরে এ জাতীয় মন্দির একটিও নেই; খড়বাংলা পাড়ায় ভাঙা যে একটিমাত্র আছে, তা ইটের তৈরি। সেদিক থেকে তেজপালের এ পলস্তারা-আবৃত ঝামা পাথরের পরিত্যক্ত মন্দিরটির গুরুত্ব আছে। আরও গুরুত্ব এইজন্য যে এক প্রখ্যাত মল্ল নৃপতি এটির নির্মাতা এবং দেওয়ালে উৎকৃষ্ট পঙ্খের প্রলেপ ছাড়াও গর্ভগৃহের দু'পাশে ও পিছনের দিকে তিনটি অন্তরাল-কক্ষ আছে। সামনের দেওয়ালে ফুলকাটা খিলান তিনটির ওপরে নিবদ্ধ পাথরের প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

"বসুমুক্তকগেশাকে | শ্রীরাধাকৃষ্ণযোমুদে | রঘুনাথসুতঃ সৌধ |

বীরসিংহনৃপোদদৌ | ৯৭৮।" অর্থাৎ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার জন্য রঘুনাথের পুত্র রাজা বীরসিংহ ৯৭৮ মল্লাব্দে (১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দ) এ সৌধটি নির্মাণ করেন। একই মল্ল নৃপতি ৯৮৩ মল্লাব্দে (১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) তালডাংরা থানার সাত্রাকোণের পাথরের আটচালা মন্দিরটিরও প্রতিষ্ঠা করেন বলে এ শৈলীর মন্দিরের প্রতি তাঁর কিছু পক্ষপাতিত্ব হয়ত সূচিত হয়।

থুমকোঁড়া : বাঁকুড়া-গঙ্গাজলঘাটি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বাঁকুড়া থেকে প্রায় ১০ মাইল (১৬ কিলোমিটার) উত্তরে অমরকানন। সেখানকার হাসপাতালের পাশ দিয়ে বাঁ-হাতি যে মোরামের রাস্তা বার হয়েছে, তাতে ২ মাইল (৩·২ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে, গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত থুমকোঁড়া গ্রাম (জে. এল. নং ১০২)। গ্রামের পুব সীমানায় মাকড়া-পাথরের বড় বড় চাঁই ও কয়েকটি লম্ফমান সিংহের অল্পবিস্তর ভগ্নমূর্তি থেকে প্রমাণ হয় যে এখানে একদা উড়িষ্যারীতির এক শিখর-দেউল নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এ জীর্ণ অবশেষগুলি থেকে আজ আর সে দেবালয়ের সঠিক গঠন-প্রকরণ, প্রতিষ্ঠাকাল বা প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করা সম্ভব নয়। গোটা গঙ্গাজলঘাটি থানায় শুধু রণিয়াড়া ছাড়া ('রণিয়াড়া' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) আর কোথাও যেহেতু পাথরের মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়নি, সেজন্য এখানকার লুপ্ত দেবালয়টির আঞ্চলিক গুরুত্ব কম নয়।

দেউলভিড়্যা (তালডাংরা থানা) : বিষ্ণুপুর রেল স্টেশনের কাছ থেকে যে মোরামের রাস্তা মাজুরি-প্রসাদপুর, জয়পুর প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গিয়েছে, তাতে প্রায় ১৪ মাইল (২২·৫ কিলোমিটার) দূরে পাঁচমুড়া—পোড়ামাটির 'বাঁকুড়ার ঘোড়া' নির্মাণের বিখ্যাত কেন্দ্র। পাঁচমুড়ার সংলগ্ন দক্ষিণের গ্রামই তালডাংরা থানার অন্তর্গত দেউলভিড়্যা (জে. এল. নং ১১০)। বিষ্ণুপুর-পাঁচমুড়া সড়কে, রাস্তা ভাল থাকলে, অল্পসংখ্যক বাস চলে। তবু, বাঁকুড়া শহর থেকে তালডাংরা হয়ে যাওয়ার থেকে এপথে যাওয়াই সুবিধা। গ্রামপ্রান্তে ধান ক্ষেতের পাশে, উঁচু জমির ওপরে, কালো ল্যাটেরাইট পাথরের পুবমুখী রেখ-দেউলটি বাঁকুড়া জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪ ফুট (৪·২ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২ মিটার) এ মন্দিরের শিখরের বিন্যাস ত্রিরথ তবে সামনের দিকের উদ্গত অংশ তুলনায় অনেক বেশী বলিষ্ঠ। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে, বরণ্ডের গায়ে, মাটি থেকে প্রায় ৬।৭ ফুট (২ মিটার) উচ্চতায়, তিনটি বড়

কুলুঙ্গি আছে, আদিতে যেগুলির মধ্যে হয়ত মূর্তি স্থাপিত ছিল। গ্রামের মধ্যে, গাছতলায়, পাথরের এক পুরুষ-মূর্তির এক হাতে তলোয়ার, অন্য হাত বুকের ওপর স্থাপিত। আয়তনে ঠিক কুলুঙ্গির মাপের, এ ভাস্কর্যটিকে মন্দির থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়ে থাকতে পারে। তার নাসিকা ভগ্ন বলে সে সাধারণ্যে 'খাঁদুরাণী' নামে পরিচিত। আমলক-শিলা ও শিখরশীর্ষের কিছু অংশ ভেঙে পড়া ও গণ্ডীর কয়েক জায়গায় বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হওয়া ছাড়া দেউলটি মোটামুটি অক্ষত আছে। তবে, ঠিক সামনের ঢিবিটি দেখে সন্দেহ থাকে না যে সাবেক জগমোহনেরই সেটি ধ্বংসাবশেষ। চূড়ার, শুধু পুবদিকে, এখনও খুব সুন্দর এক লম্ফমান সিংহ নিবদ্ধ আছে। ইতস্তত-ছড়ানো আমলক-শিলার খণ্ডগুলি থেকে দেখা যায় যে তার ব্যাস ছিল ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি (২·৩ মিটার)। ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি (১·১ মিটার) পুরু দেওয়ালের এ মন্দিরটির ছাদের বিন্যাসে খুবই অভিনব রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। ছাদের আমলকসংলগ্ন সর্বোচ্চ স্তরটির নীচে, কিছু ব্যবধানে, আরও দু'টি দশ-ধাপযুক্ত চারচালা ছাদ তৈরি ক'রে, প্রতি দু'টির অন্তবর্তী অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছিল, ভরাট করা হয়নি। এরকম আচ্ছাদনের নীচের দু'টির পুবদিকের কিছু অংশ ভেঙে পড়ায় গর্ভগৃহের মেঝে থেকে জোরালো টর্চলাইটের আলোয় সে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এ বিন্যাস বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। বলা বাহুল্য, ওপরের অংশ যাতে 'মাথাভারী' না হয়ে পড়ে সেজন্যই এ অভিনব ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চারপাশের দেওয়ালের সঙ্গে এভাবে দু'বার সংযোগ সৃষ্টি ক'রে ইমারতটির অধিকতর দৃঢ়তাও সম্পাদিত হয়েছিল মনে হয়। মুসলিম-পূর্ব কালের বহু মন্দিরের মত এখানেও প্রবেশ-পথটির ছাদ ধাপযুক্ত (ছ'টি ধাপ আছে), খিলানের ওপর রক্ষিত নয়। গাঁথনিতে ব্যবহৃত পাথরের চাঁইগুলিও বেশ বড় আয়তনের ; বাঢ় অংশে চব্বিশটি ও গণ্ডী অংশে আরও চব্বিশ স্তর পাথর সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

মন্দিরটি কতদিনের প্রাচীন? কেউ কেউ যে এটিকে ডিহরের মন্দিরের সমকালীন, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বলে মতপ্রকাশ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। দেউলটি যে জৈনদের দ্বারা জৈন উপাসনার জন্যই নির্মিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযত্নে কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত এখানকার প্রধান বিগ্রহটি জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের। বাঁকুড়া জেলার তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ

জে. সি. ফ্রেঞ্চের সহায়তায় তিনি এখান থেকে আরও কিছু জৈন মূর্তি ও ভাস্কর্য সংগ্রহ করেন ও সবগুলিকেই আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতকের বলে নির্ণয় করেন।

এ বই-এর প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, খ্রীষ্টীয় বারো শতক নাগাদ বাঁকুড়া অঞ্চল থেকে জৈনধর্মের প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়েছিল। অতএব, এ পুরাকীর্তিটি নিশ্চয়ই তার আগের তৈরি। শিখরের ত্রিরথ বিন্যাসটিও লক্ষণীয়। ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ত্রিরথ বিন্যাসটিই যে সর্বপ্রাচীন, পঞ্চরথ সপ্তরথ প্রভৃতি ব্যবস্থা যে পরবর্তীকালের, সেকথা সকলেই জানেন। সেদিক থেকেও মন্দিরটির প্রাচীনত্বই সূচিত হয়। সেজন্য শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে বিশেষ ভুল আছে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে, দেউলভিড়্যার এই পাথরের দেউলটিকে বাঁকুড়া জেলার সম্ভবতঃ প্রাচীনতম দণ্ডায়মান মন্দির বলে সাব্যস্ত করতে হয়। কেননা, বহুলাড়া, সোনাতপল, ডিহর প্রভৃতি স্থানের অতি-পুরাতন মন্দিরগুলি সবই পরবর্তী কালের।

দেউলভিড়্যা (ছাতনা থানা)ঃ বাংলাদেশে দেউলি, দেউলিয়া, দেউলবাড়ি, দেউলপোতা, দেউলভিড়্যা প্রভৃতি নামের বহু গ্রামে, গ্রামের নাম থেকেই মন্দিরাদির অস্তিত্ব সূচিত হয়। ইঁদপুর থানার সদর ইঁদপুর থেকে উত্তর-পশ্চিমমুখী যে মোরামের রাস্তা নোয়াডিহি, ভীমপুর হয়ে হাটগ্রাম গিয়েছে তাতে, ইঁদপুর থেকে প্রায় ১১ মাইল (১৭·৭ কিলোমিটার) দূরে ও হাটগ্রামের মাইল-খানেক আগে, বাঁকুড়া জেলার আর এক দেউলভিড়্যা গ্রাম (জে. এল. নং ২৫৩) আছে যেখানেও প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন মেলে। রাস্তা ভাল থাকলে অল্পসংখ্যক বাস চলে এপথে। গ্রামের দক্ষিণ-পুবে এক উঁচু ভূখণ্ডকে তিনদিক দিয়ে ঘিরে, দ্বারকেশ্বরের শাখানদী অরকুশা ('অরিকেশী') প্রবাহিত আর এই উচ্চভূমির কেন্দ্রে, ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত বহু প্রাচীন ইটের মধ্যে, ১৩৪৩-৪৪ বঙ্গাব্দে নির্মিত, চুনবালির পলস্তারা-করা, পুবমুখী এক আধুনিক মন্দির দেখা যায়। পুরাকীর্তি হিসাবে সেটির কোন গুরুত্ব না থাকলেও, গর্ভগৃহে রক্ষিত তিনটি পাথরের মূর্তির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। প্রথমটি কুবেরের ; উচ্চতা ২ ফুট ২ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১ ফুট ২½ ইঞ্চি (০·৭ × ০·৪ মিটার)। দ্বিতীয়টি সপ্তনাগফণার শিরোভূষণযুক্ত লোকেশ্বর-বিষ্ণুর ; উচ্চতা ৩ ফুট ২ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১ ফুট ৭½ ইঞ্চি (১ × ০·৫ মিটার)। তৃতীয়টি এক পাথরের চাকতির (ব্যাস ১ ফুট ৪½ ইঞ্চি : ০·৪ মিটার) দু'পিঠে 'রিলিফ' পদ্ধতিতে ক্ষোদিত

অষ্টভূজ দুই নটরাজের। সেনযুগের শৈলীতে রচিত এ মূর্তিগুলি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের হওয়া সম্ভব। মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক গাছের গুঁড়িতে হেলান-দেওয়া পাথরের কয়েকটি চৌকাঠ ও বাজু থেকে মনে হয় ইটের তৈরী সাবেক হিন্দু মন্দিরটির প্রবেশপথে সেগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল। বাঁকুড়া জেলার দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, কংসাবতী প্রভৃতি প্রধান নদীতীরবর্তী ধর্মকেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর গবেষণা হয়েছে ; বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম সীমানায়, অখ্যাত অরকুশা নদীতীরের এই প্রাচীন কেন্দ্রটি সম্বন্ধে বিস্তৃততর অনুসন্ধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দেউলভিড়্যা (ইঁদপুর থানা) : ইঁদপুর ডাকবাংলো থেকে মোরামের রাস্তায় দেড় মাইল (২·৪ কিলোমিটার) পশ্চিমে, দেউলভিড়্যা গ্রামে (জে. এল. নং ১৩৫), রাস্তার পাশে এক অনুচ্চ ঢিবির ওপর, গাছ-তলায় দু'তিনটি পাথরের মূর্তি (সম্ভবতঃ জৈন) রক্ষিত আছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে শুনেছি। ঢিবিটিতে খননকার্য চালালে, অন্য পুরাকীর্তি বা পুরাবস্তুও আবিষ্কৃত হতে পারে।

দেউলেশ্বর : বাঁকুড়া-বর্ধমান পিচের সড়কের পাশে, পাত্রসায়ের থানায় অবস্থিত, বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলপথের দাঘরিয়া স্টেশন থেকে উত্তরমুখী কাঁচা রাস্তায় ৬ মাইল (৯·৭ কিলোমিটার) গেলে, দেউল-পাড়া মৌজায় (জে. এল. নং ২) দেউলেশ্বর শিবমন্দিরে পৌঁছনো যায়। পশ্চিমমুখী ইটের রেখ-দেউলটি আকারে ছোট ও স্থাপত্যের দিক থেকে অনুল্লেখযোগ্য হলেও, অধিষ্ঠাতা অনাদিলিঙ্গ শিব হাঁপানি, কুষ্ঠ ও বন্ধ্যাত্বের নিরাময়কারী দেবতা হিসাবে এ অঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ। চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনের সময় শতাধিক ভক্ত্যার উপস্থিতিতে 'বাণ-ফোঁড়া' ও গামছায় ঝুলিয়ে চড়ক অনুষ্ঠিত হয় এবং বড় মেলা বসে।

দেশড়া : কোতুলপুর-কামারপুকুর পিচের রাস্তার পাশে, জয়রাম-বাটীর মাইলখানেক (১·৬ কিলোমিটার) উত্তরে, কোতুলপুর থানার বৃহত্তম গ্রাম দেশড়া (জে. এল. নং ১৩২)। ৪ মাইল (৬·৪ কিলোমিটার) দূরের কোতুলপুর বা কামারপুকুর থেকে বাস অথবা সাইকেল রিক্শয় আসা যায়। লৌকিক দেবদেবীর বিবরণ এতক্ষণ বড় একটা দেওয়া হয়নি ; দেশড়ার মনসা দেবীর খ্যাতি এ অঞ্চলে দূরবিস্তৃত। মন্দির বলতে কিছু নেই ; খুব প্রাচীন ও বিরাট এক সিজ-মনসা গাছের তলায় মাটিলেপা প্রশস্ত বেদীর ওপর তিনটি ঘটে দেবীর অধিষ্ঠান। সাপেকাটা রোগীকে মনসাতলায় এনে গুণীনের নির্দেশে ক্ষতস্থানে

বেদীর মাটি মাখালে আরোগ্য নাকি অবধারিত। বর্তমান গুণীন বা ওঝা তাঁতি সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনিই গ্রামবাসী ভক্তজনের কাছে চাঁদা তুলে ভাইফোঁটার দিন মনসার বার্ষিক উৎসবের ব্যবস্থা করেন। তখন পৌরহিত্য করেন জনৈক ব্রাহ্মণ। ভাইফোঁটার মত বর্ণহিন্দু-অনুষ্ঠানের সঙ্গে আর্যেতর দেবী মনসার বাৎসরিক পরবের সংমিশ্রণ খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। গ্রামে অলংকরণ ও প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন যে ছোট কয়েকটি আটচালা মন্দির আছে সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

দ্বাদশবাড়ি : বিষ্ণুপুর রেল স্টেশনের কাছ থেকে, সেগুনবনের মধ্য দিয়ে, দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী যে মোরামের রাস্তা পাঁচমুড়ার দিকে গিয়েছে, তাতে এক মাইল (১.৬ কিলোমিটার) গেলে, পথের উত্তরে, বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত দ্বাদশবাড়ি গ্রাম (জে. এল. নং ৪৪)। এখানকার দ্রষ্টব্য, মাকড়া পাথরের দক্ষিণমুখী, পরিত্যক্ত এক একরত্ন শিবের মন্দির, প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে যেটিকে খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকে কোন মল্ল রাজার প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। দ্বাদশবাড়ি এখন মূল বিষ্ণুপুর শহর থেকে প্রায় ২ মাইল (৩.২ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পশ্চিমে ; তেজপালও একই দূরত্বে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এসব স্থানে মল্ল নৃপতিদের নির্মিত ব্যয়সাধ্য পাথরের মন্দির দেখে অনুমান হয়, ঐশ্বর্যের দিনে রাজধানী বিষ্ণুপুর হয়ত এতদূর অবধি বিস্তৃত ছিল। একরত্ন মন্দিরটি একটু উঁচু জমির ওপর স্থাপিত, রাস্তা থেকেই দেখা যায় ; মাঝখানে কয়েক খণ্ড মাত্র ধান-জমির ব্যবধান। আগে আগাগোড়া পলস্তারা-আবৃত ছিল ; এখন রত্নটি ছাড়া অন্য অংশের প্রলেপ খসে পড়েছে। সামনের দেওয়ালে প্রতিষ্ঠাফলক নিবদ্ধ ছিল মনে হয়, কিন্তু এখন তা অপসৃত। বিগ্রহ নন্দকিশোর, অধুনা নাকি গ্রামের সিংহ পরিবারে (ক্ষত্রিয়) উপাসিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২১ ফুট ৬ ইঞ্চি (৬.৫ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার), দক্ষিণমুখী এ দেবালয়ের চতুর্দিকেই ফুলকাটা তিন-খিলানযুক্ত দালান ছিল ; পুব ও পশ্চিমের দু'টি ধূলিসাৎ হয়েছে ; দক্ষিণেরটির অবস্থাও এত জীর্ণ যে যে-কোন সময়েই ভেঙে পড়তে পারে। ফিকে হলুদ রঙের পলস্তারায় আবৃত, লঘু-আকৃতির আটকোণা রত্নটি এ মন্দিরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এত ছিমছাম রত্ন আর কোন মল্ল-মন্দিরে আছে কিনা সন্দেহ। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য পুব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে দরজা ছিল ; শেষেরটি পরে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। দালানগুলির ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর ও গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর স্থাপিত।

মন্দিরের কয়েক গজ পুবে, মাকড়া পাথরের তৈরি বেশ বড় একটি ভোগ-মণ্ডপও দর্শনীয়। ছাদের অংশ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লেও এটি চারচালা পদ্ধতিতে নির্মিত ছিল বোঝা যায়। অন্তত ৪ ফুট (১·২ মিটার) পুরু দেওয়াল ও ছাদের এ ইমারতটি খুবই পাকাপোক্ত গড়নের ছিল। পাথরের চারচালা সৌধ নারিচা, বাসুদেবপুর প্রভৃতি দু'চারটি স্থান ছাড়া বাঁকুড়া জেলায় আর নির্মিত হয়নি। সেদিক দিয়ে এ ভগ্ন ভোগ-মণ্ডপটি গুরুত্বের দাবী করতে পারে।

ধরাপাট : বিষ্ণুপুর-সোনামুখী পিচের সড়কে (শীতগ্রীষ্মে বাস চলে), বিষ্ণুপুর থেকে ৪ মাইল (৬·৪ কিলোমিটার) দূরে, দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে পৌঁছে, বাঁ-হাতি কাঁচা রাস্তায় আরও ১ মাইল (১·৬ কিলোমিটার) গেলে, বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ধরাপাট গ্রাম (জে. এল. নং ১০০)। প্রধান দ্রষ্টব্য, পরিচ্ছন্ন পলস্তারা-আবৃত ল্যাটেরাইট পাথরের এক রেখ-দেউল, কাছেই এক ঢিপির ওপর ইতস্তত-ছড়ানো এক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও আধুনিক এক দালান-মন্দিরে মনসাজ্ঞানে উপাসিত পাথরের একটি দিগম্বর পার্শ্বনাথ মূর্তি। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯ ফুট ৮ ইঞ্চি (৫·৯ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০ ফুট (১৫ মিটার), সপ্তরথ-শিখরবিশিষ্ট, দক্ষিণমুখী দেউলটির প্রবেশপথের ওপরে পাথরের যে প্রতিষ্ঠালিপিটি নিবদ্ধ আছে, কয়েকটি জায়গায় ক্ষয়িত হলেও তার পাঠ নিম্নরূপ : "বিক্রমঅবদে | সক ১৫২৫ | মল্ল মহীপাল | সক ৯··· | শ্রী হম্বীর সিংহ | শ্রীমতী পুষ্প দে সেব··· | বেবতী শ্রীপরমানন্দ শর্মা"। শেষের দু'টি লাইনের দু'পাশে পৃথক দু'টি খোপে উৎকীর্ণ আছে—(বাঁ দিকে) "শ্রীরাম দে কামিনা" ও (ডান দিকে) "শ্রীরাম বিসাস"। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার সম্পাদক ও বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ শ্রীমাণিকলাল সিংহ মহাশয়ের মতে, তাঁর নিজ গ্রাম অদূরের জয়কৃষ্ণপুরে এক প্রাচীন ধনী ভূস্বামী পরিবারের আদি উপাধি ছিল 'দে'; নবাবী আমলে হয় বিশ্বাস। তাঁদের গ্রামের বাড়ীতেও লিপিযুক্ত এক প্রাচীন মন্দির আছে। ধরাপাট দেউলের বর্তমান লিপি থেকে মনে হয়, এই দে পরিবারের জনৈক রাম দে ওরফে রাম বিশ্বাস, ১৫২৫ শকাব্দে (লিপি থেকে মল্লাব্দটি পড়া যায় না), অর্থাৎ ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে বীর হম্বীরের রাজত্বকালে, নিজ 'কামিনা' (কামিন্যা=পত্নী) শ্রীমতী পুষ্প দে-র নামে এ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে বীর হম্বীর যে মল্ল-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

সম্ভবতঃ তাঁর সামন্তশ্রেণীভুক্ত এই ধনী ভূস্বামী সহজবোধ্য কারণেই প্রতিষ্ঠালিপিতে দেশের রাজার নাম উল্লেখ করে থাকবেন। কিন্তু প্রায় পৌণে চার শ বছরের পুরাতন আর পাঁচটা নিদর্শনের তুলনায় এ লিপির 'শ্রীরাম দে', 'শ্রীরাম বিসাস' বা 'শ্রীমতী পুষ্প দে' প্রভৃতি অংশ অত্যন্ত বেমানান ও আধুনিক ঠেকে। রতন কবিরাজের 'মদনমোহন বন্দনা' নামক মধ্যযুগীয় গ্রন্থটি থেকে দেখা যায় যে জনৈক অদ্বেষ-রাজা বিষ্ণুপুর রাজকুলের সামন্ত ছিলেন এবং কারও কারও মতে তিনিই এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায়, তাঁর নাম কেন ঘুণাক্ষরেও প্রতিষ্ঠালিপিতে উৎকীর্ণ হয়নি? তাহলে কি এমন হতে পারে যে বীর হম্বীর, বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পরে, জৈন ও বাসুদেব উপাসনার এ প্রখ্যাত কেন্দ্রটিকে চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করবার জন্য এই বৃহৎ দেবালয়টির প্রতিষ্ঠা করেন? তা হলে সিদ্ধান্ত করতে হয়, বর্তমান লিপিটি এ মন্দিরের আদি লিপি নয়; বীর হম্বীরের সময়ের বহুকাল পরে মল্ল-রাজাদের সামন্তশ্রেণীভুক্ত দে পরিবার এটির সংস্কার সাধনের সময় আসল প্রতিষ্ঠাতা বীর হম্বীরের নাম ও তারিখ অবিকৃত রেখে নিজেদের পরিচয়ও কিছু কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এ অনুমান ঠিক হলে, বীর হম্বীর প্রতিষ্ঠিত এটি একমাত্র মন্দির যা এখনও অবশিষ্ট আছে।

মন্দিরের আমলক-শিলাটি যে বেশ বড়, চূড়ার চারদিকে যে পাথরের চারটি লম্ফমান সিংহ আছে অথবা গর্ভগৃহের ছাদ যে ধাপযুক্ত চার চালার উপর স্থাপিত এসব বৈশিষ্ট্য ততটা লক্ষণীয় নয়, যতটা শিখরের গায়ে নিবদ্ধ তিনটি পাথরের মূর্তি। পুবদিকের বাসুদেব মূর্তিটি প্রায় ৩ ফুট (০·৯ মিটার), উত্তরদিকের আদিনাথের মূর্তিটি প্রায় ৫ ফুট (১·৫ মিটার) ও পশ্চিমদিকের পার্শ্বনাথের মূর্তিটি প্রায় ৩ ফুট (০·৯ মিটার) উঁচু। এগুলি ধরাপাটের পূর্ব-ইতিহাসের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। জৈন মূর্তি দু'টি থেকে সহজেই প্রমাণ হয় যে দূর অতীতে এখানে বা কাছেপিঠে এক জৈন ধর্মকেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টীয় বারো শতক নাগাদ বাঁকুড়া অঞ্চল থেকে জৈনধর্ম সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় বলে এগুলি তার চেয়েও বেশী পুরাতন। বর্তমান মন্দিরের প্রায় ২০০ গজ (১৮৩ মিটার) দক্ষিণ-পশ্চিমে বেশ বড় এক ঢিপির ওপর মাকড়া পাথরের এক প্রাচীন দেউলের আমলক প্রভৃতির ভগ্ন অংশ ছড়ানো দেখা যায়। জৈন আমলের মন্দিরটি সম্ভবতঃ এখানেই ছিল। তারপরে, সে ধর্মের অবনতির সঙ্গে, হয়ত এ দেবালয়কে

অবলম্বন ক'রেই এক বাসুদেব উপাসনার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তার প্রমাণ, শুধু উপরি-লিখিত বাসুদেব বিগ্রহটিই নয়, অদূরের দালান-মন্দিরে মনসাজ্ঞানে উপাসিত পার্শ্বনাথের প্রায় ৪ ফুট (১·২ মিটার) উঁচু মূর্তিটিও। বস্তুতঃ, শেষেরটির মত কৌতূহলোদ্দীপক ভাস্কর্য পশ্চিমবঙ্গে বড় বেশী নেই। নাগছত্রধারী (সেজন্যই অধুনা মনসায় রূপান্তরিত) পার্শ্বনাথ মূর্তিটির পিছনের প্রস্তরপট খোদাই ক'রে গদা-চক্রধারী অতিরিক্ত দু'টি হাত ও লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রথাগত দু'টি মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। পার্শ্বনাথকে এভাবে বলপূর্বক বাসুদেবে রূপান্তরিত ক'রে যে বিষ্ণুপূজার এই কেন্দ্রে একদা উপাসনা করা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আবার, বীর হম্বীরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পর মল্লভূমে যখন কৃষ্ণরাধিকার আরাধনা ব্যাপকভাবে আরম্ভ হল তখন বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল শ্যামচাঁদের উপাসনার জন্য। সে বিগ্রহ অনেক দিন আগে চুরি হয়ে গেছে বলে গর্ভগৃহ এখন শূন্য। এ অঞ্চলের ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাসে ধরাপাটের স্থান খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। জৈনধর্ম, ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম ও শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের ক্রমিক ইতিহাস এখানে নিহিত রয়েছে।

স্থানীয় লোকে এ দেউলটিকে 'নেংটা ঠাকুরের মন্দির' বলে ও বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা সন্তান কামনায় এখনও এখানে মানত করে, পূজা দেয়। শিখরে নিবদ্ধ পুরুষচিহ্নযুক্ত দিগম্বর তীর্থংকর মূর্তি দু'টি জন-মানসে সন্তানপ্রদ দেবতার রূপ নিয়েছে।

নারিচা : বিষ্ণুপুর-পাত্রসায়ের পিচের রাস্তায় (শীতগ্রীষ্মে বাস চলে), বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় ১০ মাইল (১৬ কিলোমিটার) গিয়ে, ডান-হাতি (দক্ষিণমুখী) কাঁচা রাস্তায় আরও ১ মাইল (১·৬ কিলোমিটার) গেলে পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত নারিচা গ্রামে (জে. এল. নং ১৫৮) পৌঁছনো যায়। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য, এ অঞ্চলের বিখ্যাত দেবী সর্বমঙ্গলার পাথরের চারচালা মন্দির ও গ্রামের বাইরে, মাঠের মধ্যে, এক ভগ্ন, পরিত্যক্ত, ইটের পঞ্চরত্ন দেবালয়। দৈর্ঘ্যে ১৯ ফুট ১০ ইঞ্চি (৬ মিটার), প্রস্থে ১৮ ফুট ৮ ইঞ্চি (৫·৬ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার), দক্ষিণমুখী এ চারচালা মন্দিরটি খুবই অভিনব এজন্য যে পাথরের এহেন ইমারত গোটা বাঁকুড়া জেলায় সামান্য কয়েকটির বেশী নেই। ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি (১·৪ মিটার) পুরু দেওয়ালের ওপর একুশ-ধাপযুক্ত চারচালা ছাদটি ন্যস্ত ; দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের প্রবেশদ্বারের ওপরে যথাক্রমে এক গণেশ ও এক গরুড়বাহন বিষ্ণুর

পাথরের মূর্তি নিবদ্ধ আছে। গর্ভগৃহে রক্ষিত সেন যুগের পাঁচটি কষ্টি-পাথরের ভাস্কর্য বিশেষ অভিনিবেশযোগ্য। বাঁ দিক থেকে প্রথম মূর্তিটি মনসার, এখন কার্তিক বলে উপাসিত। ১ ফুট ৯ ইঞ্চি উঁচু ও ৮ ইঞ্চি চওড়া (০·৫ × ০·২ মিটার), এ বিগ্রহটি উপবিষ্টা, দ্বিভূজা ; তাঁর মাথার ওপর সপ্তনাগছত্র ও বাঁ হাতে এক ফণাধারী সাপ। দ্বিতীয় মূর্তিটি অষ্টভূজা মহিষমর্দিনীর ; ২ ফুট ১০ ইঞ্চি উঁচু ও ১ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া (০·৮ × ০·৫ মিটার) ; কারিগরির দক্ষতায় এটিই শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য। তৃতীয় মূর্তিটি আর এক অষ্টভূজা মহিষমর্দিনীর, বর্তমানে সর্বমঙ্গলাজ্ঞানে পূজিতা। ২ ফুট ৮ ইঞ্চি উঁচু ও ১ ফুট ৫ ইঞ্চি চওড়া (০·৮ × ০·৪ মিটার), এ বিগ্রহের মাথার অংশ ভাঙা ; সেখানে সিঁদুরলিপ্ত আধুনিক মুখ বসিয়ে নেওয়া হয়েছে। চতুর্থ বিগ্রহটি ২ ফুট ৩ ইঞ্চি উঁচু ও ১ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া (০·৭ × ০·৪ মিটার) এক গণেশের মূর্তি। পঞ্চমটি, ৪ ইঞ্চি উচ্চতার ক্ষয়িত এক বাসুদেব মূর্তি। একই মন্দিরে এতগুলি প্রাচীন ভাস্কর্য বড় একটা দেখা যায় না। মন্দিরের কাছেই, বামুনপাড়ায়, এক অশ্বত্থ গাছের নীচে, ৩ ফুট ১১ ইঞ্চি উঁচু ও ২ ফট ১ ইঞ্চি চওড়া (১·২ × ০·৬ মিটার), ক্ষয়িত ও আংশিক ভগ্ন আর এক কষ্টিপাথরের মহিষমর্দিনী মূর্তি 'খাঁদা সর্বমঙ্গলা' নামে উপাসিতা। গ্রাম-বৃদ্ধেরা বলেন, অদূরের দ্বারকেশ্বর-গর্ভে-বিলীন এক প্রাচীন দেবালয় থেকে নাকি মূর্তিগুলি সংগৃহীত।

পৌষ-সংক্রান্তির দিন সর্বমঙ্গলার বার্ষিক উৎসব। তখন আনুষ্ঠানিক ও মানসিকের বহু বলি হয়। পরের তিন দিন বেশ বড় মেলা বসে। পুরোহিতেরা বংশানুক্রমিকভাবে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। স্থানীয় চৌধুরী (কায়স্থ) পরিবারের (তাঁদের পূর্বপুরুষ নাকি মল্ল রাজাদের সেনাপতি ছিলেন) স্থাপিত, প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকার-প্রকারে খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের প্রথম দিকে নির্মিত মনে হয়।

এ দেবালয়ের সিকি মাইল উত্তর-পুবে, মাঠের মধ্যে, ইটের, ভগ্ন, পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও একই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪ ফুট (৪·২ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার), দক্ষিণমুখী, এ ইমারতের পঞ্চরথ কেন্দ্রীয় চূড়াটি ছাড়া অন্য রত্নগুলি ভেঙে পড়েছে ; সামনের, উত্তরের ও পশ্চিমের ঢাকা বারান্দাগুলিও এখন লুপ্ত। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য পুব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে দরজা আছে। দক্ষিণের দরজার ওপরে পোড়ামাটির পদ্মের অনুকৃতি থেকে মনে হয়, বাইরের দেওয়াল, অন্ততঃ সামনের দেওয়ালটি, আদিতে 'টেরাকোটা' সজ্জিত

ছিল। পুবদিকের দালানের মধ্য দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ির চিহ্ন দেখা যায়; এত ছোট মন্দিরেও এ ব্যবস্থা বেশ অভিনব। বিগ্রহ রাধামাধব এখন প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের এক শরিকের বাড়িতে উপাসিত। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ দেবালয়টি খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষে বা উনিশ শতকের প্রথমে নির্মিত হয়ে থাকবে।

পতিত ডোমমহল : বাঁকুড়া-পাত্রসায়ের-ইঁদাস পিচের সড়কে, পাত্র সায়েরের ৬ মাইল (৯'৭ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পুবে, পাত্রসায়ের থানার বেশ বড় গ্রাম পতিত ডোমমহল (জে. এল. নং ৮০)। প্রধান দ্রষ্টব্য, কারকপাড়ায় ময়রা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী, আটচালা, শ্রীধর (শালগ্রাম) মন্দির। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২ ফুট ২ ইঞ্চি (৩'৭ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার), দেবালয়টিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকায়, 'টেরাকোটা'-শৈলীর নজিরে অনধিক দেড় শ বছরের প্রাচীন মনে হয়। তিন-খিলানযুক্ত দালানের ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর ও গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজের ওপর স্থাপিত। পোড়ামাটির অলংকরণ বেশ আধুনিক ও হীন কারিগরির; বিষয় কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক কাহিনী, দশাবতার, রামরাজা, নানান সামাজিক দৃশ্য, বহুবিধ বাদক ইত্যাদি। গ্রামে আর একটি অলংকৃত আটচালা মন্দির ছিল*; কিন্তু সেটির এখন খুবই জীর্ণদশা।

পরেশনাথ : অম্বিকানগরের ২ মাইল (৩'২ কিলোমিটার) পশ্চিমে, কুমারী নদীর উত্তর তীরে, রাণীবাঁধ থানার পরেশনাথ মৌজা (জে. এল. নং ১৬)। 'অম্বিকানগর' নিবন্ধে সেখান অবধি পৌঁছবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; বাকি দূরত্বটুকু পায়েচলা পথে যাওয়া যায়; জীপও যেতে পারে। কংসাবতী প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এ অঞ্চল জলমগ্ন হবে বলে, কাছাকাছি বসতি থেকে গ্রামবাসীদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দূর অতীতে পরেশনাথ যে এক প্রখ্যাত জৈন-ধর্মকেন্দ্র ছিল তাতে সন্দেহ নেই। দু'টি প্রাচীন ইটের মন্দিরের ভিত্তিবেদী (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় বারো-তেরো শতকের) ও বহু জৈন ও হিন্দু দেবদেবীমূর্তি এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে; তাদের কিছু কিছু এখন কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। কয়েক বছর আগে, আমার পরিদর্শনের সময়, প্রায় ৬ ফুট (১'৮ মিটার) উচ্চতার এক পার্শ্বনাথের মূর্তি, একটি শিবলিঙ্গ, সবুজ 'ক্লোরাইট' পাথরের এক বৃষ ও কালো পাথরের এক সূর্যমূর্তি এখানে দেখেছিলাম। এসব জৈন ও হিন্দু বিগ্রহের যুগপৎ উপস্থিতি থেকে প্রমাণ হয় যে আদিতে এখানে এক জৈন কেন্দ্র ছিল যেটিকে স্থানচ্যুত ক'রে পরে হিন্দুধর্ম এখানে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

পাখন্না : বাঁকুড়া-তুর্গাপুর সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বড়জোড়ার মাইল তুই (৩·২ কিলোমিটার) দক্ষিণে, হাট-আস্থুরিয়ার মোড় থেকে উত্তর-পুবমুখী প্রায় ৬ মাইল (৯·৭ কিলোমিটার) দীর্ঘ পিচের রাস্তার শেষে বড়জোড়া থানার পাখন্না গ্রাম (জে. এল. নং ৫৭ ও ৫৮)। শুশুনিয়া পাহাড়ের খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের বিখ্যাত গুহালিপিটি থেকে জানা যায়, মহারাজা সিংহবর্মণের পুত্র মহারাজা চন্দ্রবর্মণ পুষ্করণার অধিপতি ছিলেন। পুষ্করণাই যে আজকের পাখন্না সে বিষয়ে পণ্ডিত মহলে কোন দ্বিমত নেই। স্থানীয় পুরাকীর্তি বলতে প্রাচীন দীঘি আছে তু'একটি ; তা থেকে এ রাজধানীর কিছুই পরিচয় মেলে না। উৎখননের ফলে প্রাপ্ত বিবিধ পুরাবস্তুর নিরিখেই পাখন্নার গুরুত্ব। সেগুলির কথায় পরে আসছি। প্রথমে, আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে শ্রী কে. এন. দীক্ষিত পুষ্করণা সম্পর্কে যে মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, বাংলায় তর্জমা ক'রে তার থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করব। "শুশুনিয়ার উত্তর-পুবে ২৫ মাইলেরও কম দূরে, দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে, পোখরণ নামে এক প্রাচীন গ্রাম আছে। এখনও এটি রীতিমতো বড় গ্রাম। অতীতের বসতির জীর্ণ স্তূপের ওপর যে আজকের আবাসগুলি নির্মিত এ থেকে গ্রামের প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।···গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে 'রাজগড়' নামে খুব বড় এক ঢিবি আছে ; তার সর্বত্র ভাঙা ইট, মাটির বাসন-কোসনের টুকরো ও অন্যান্য পুরাবস্তু ছড়ানো। ইমারতে ব্যবহৃত কয়েকটি পাথরের খণ্ডও চোখে পড়ে।···গ্রামের পশ্চিম অংশে এক বড় দীঘির ('পোখর' বা 'পুষ্কর') কাছে কয়েকটি ছোট জলাশয় দেখা যায় ; সন্দেহ নেই, দূর অতীতের এই বড় পুষ্করিণীটি থেকেই পোখরণ বা পুষ্করণা নামটি এসে থাকবে। মনে হয়, শুশুনিয়া-লিপিতে উল্লিখিত সিংহবর্মণের পুত্র চন্দ্রবর্মণের রাজধানী পুষ্করণা আর এস্থান অভিন্ন, যার ইতিহাস সম্ভবতঃ গুপ্ত-যুগের সূচনা অবধি প্রসারিত। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে প্রাচীন রাঢ় অঞ্চলের সবটা জুড়েই এ রাজাদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল।"

চন্দ্রবর্মণের কালের নানা পুরাবস্তু এখনও হয়ত পাখন্নার ঢিবিগুলির নীচে চাপা পড়ে আছে ; বহু বছর আগে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ম স্থানীয় পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তার কিছু কিছু উদ্ধার করেছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত বিবিধ ছাপ-মারা মুদ্রা, ছাঁচে-ফেলা তামার মুদ্রা, পোড়ামাটির প্রাচীন তৈজসপত্র, বহু 'টেরাকোটা' মূর্তি, নানারকম পুঁতি প্রভৃতির সুন্দর সংগ্রহটি যে কোন উৎসাহী পাঠক

আশুতোষ সংগ্রহশালায় গিয়ে দেখে আসতে পারেন। সেগুলি থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে পাখন্নার আদি বসতি মৌর্য-যুগ কি তার চেয়েও বেশী প্রাচীন। ছাপ-দেওয়া তামার মুদ্রাগুলি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রার অনুরূপ। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পাখন্নায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির যে যক্ষিণীমূর্তিটি একদা আশুতোষ মিউজিয়মকে উপহার দিয়েছিলেন, সেটি মৌর্য অথবা শুঙ্গ যুগের বলে নির্ণীত হয়েছে। আবার পাল-যুগের বিশিষ্ট রীতিতে ক্ষোদিত, কষ্টিপাথরের এক বিষ্ণুমূর্তিও সংগৃহীত হয়েছে এখান থেকে। সেটির নজিরে বলা যায়, পাখন্নায় লোকবসতি মৌর্য-পূর্ব কাল থেকে পাল-যুগের প্রথম অবধি, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতক অবধি, অবিচ্ছিন্ন ছিল।

পাঁচাল : বাঁকুড়া-বেলিয়াতোড়-সোনামুখী সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বেলিয়াতোড় অতিক্রম ক'রে মাইল খানেক (১·৬ কিলোমিটার) গিয়ে, ডান-হাতি কাঁচা রাস্তায় আরও প্রায় ৮ মাইল (১২·৯ কিলোমিটার) দূরে সোনামুখী থানার বড় গ্রাম পাঁচাল (জে. এল. নং ১৬৪)। স্থানীয় পুরাকীর্তি বলতে, পলস্তারা-আবৃত পাথরের এক ছোট আটচালা মন্দির, যার স্থাপত্যগত কৌলীন্য কিছু না থাকলেও সেখানে উপাসিত শিবলিঙ্গটি বেশ পুরাতন ও এ অঞ্চলে খুবই প্রতাপশালী। দক্ষিণমুখী এ দেবালয়ের কোন দালান না থাকায়, বাইরের রকের কিছু অংশ অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে টিন দিয়ে ছেয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে, মন্দিরটিকে খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের বলে মনে হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন উৎসবের সময় সমবেত জনতা ও গাজন-সন্ন্যাসীদের সংখ্যা দিয়ে যদি শৈবতীর্থের জনপ্রিয়তার পরিমাপ করা হয়, তাহলে পাঁচালের প্রতিপত্তি, বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়া, এক্তেশ্বর, জগন্নাথপুর প্রভৃতি প্রখ্যাত শৈবকেন্দ্রগুলি থেকে কম নয়। সে উৎসবের অঙ্গ হিসাবে, আর্যেতর উপাসনাপদ্ধতিপ্রসূত বাণ-ফোঁড়া, আগুন-হাঁটা, চড়ক প্রভৃতি দেহলাঞ্ছনার নানাবিধ নিষ্ঠুর রীতি এখনও এখানে ব্যাপকভাবে অনুসৃত। কাছাকাছি অঞ্চলের বহুসংখ্যক সাঁওতালের উপস্থিতি ও তাদের দলবদ্ধ নৃত্যগীত পাঁচালের গাজন-মেলার এক অভিনব বিশেষত্ব।

পাত্রসায়ের : বিষ্ণুপুর-পাত্রসায়ের পিচের সড়কে (শীতগ্রীষ্মে নিয়মিত বাস চলে), বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় ২০ মাইল (৩২ কিলোমিটার) উত্তর-পুবে, পাত্রসায়ের থানার সদর ও বাঁকুড়া জেলার অন্যতম বৃহত্তম

গ্রাম পাত্রসায়ের। কলকাতার দিক থেকে যাঁরা যেতে চান, তাঁদের পক্ষে বর্ধমান রেল-স্টেশনে নেমে বর্ধমান-পাত্রসায়ের-বাঁকুড়া বাস সার্ভিসে যাওয়াই প্রশস্ত।

এখানকার বহু পুরাকীর্তির মধ্যে, এ অঞ্চলের বিখ্যাত দেবতা কালঞ্জয় শিবের মন্দিরটিই প্রধান। সাবেক এক রেখ-দেউলের চার দিকে ঢালু ছাদের প্রদক্ষিণ-দালান পরে যুক্ত হওয়ায় এটিকে এখন অনেকটা একরত্ন মন্দিরের মত দেখায়। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে, সৌধটির নির্মাণকাল খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বলে অনুমান করা যেতে পারে। পাত্রসায়েরের কয়েকটি পাথরের দেবালয়ে 'টেরাকোটা' অলংকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। কালঞ্জয় শিবের দেউলে কিন্তু এই অভিনব রীতিটি প্রযুক্ত হয়নি; সেখানে শিখর ও প্রতিদিকে ছয়-খিলানযুক্ত দালান—সবই পলস্তারা-আবৃত।

ঘোষালপাড়ায় ঘোষাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পাশাপাশি তিনটি দক্ষিণমুখী পাথরের মন্দির বেশ আকর্ষণীয়। প্রথমটি এক পঞ্চরথ দেউল শিবমন্দির; দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০ ফুট ১০ ইঞ্চি (৩·৩ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার)। সামনের খিলানশীর্ষে হরপার্বতীর এক বৃহৎ 'টেরাকোটা' মূর্তি ছাড়াও এ মন্দিরের আর এক বৈশিষ্ট্য গর্ভগৃহটি আটকোণা ও তার ছাদ গম্বুজের ওপর স্থাপিত। দ্বিতীয় মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬ ফুট ৮ ইঞ্চি (৫ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২২ ফুট (৬·৬ মিটার) এবং প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের চারচালা দু'টির মধ্যে স্বল্প ব্যবধানের জন্য এ অঞ্চলে প্রচলিত খর্বাকৃতি আটচালা মন্দিরের আদর্শ নমুনা। তিন-খিলান দালানযুক্ত এই রাম-রঘুবীর (শালগ্রাম) মন্দিরে ল্যাটেরাইট পাথরের গাঁথনির ওপর যথেষ্ট পোড়ামাটির অলংকরণের সমাবেশ বিস্ময়কর। খিলানশীর্ষে কৃষ্ণলীলা, রামরাজা ও গণেশজননীর তিনটি সুন্দর প্যানেল ছাড়াও সামনের দেওয়ালে দশাবতার, পৌরাণিক দেবদেবী ও বহু সামাজিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। এ দেবালয়ের দালানের ছাদ ধনুকাকৃতি 'ভল্ট'-এর ওপর ও গর্ভগৃহের ছাদ চারচালা 'ভল্ট'-এর ওপর স্থাপিত। তৃতীয়টি তিন-খিলানযুক্ত বারান্দা ও ঢেউখেলানো ছাদের এক অদ্ভুত দালান-মন্দির। সামনের দেওয়াল 'টেরাকোটা'র বদলে পলস্তারার নকাশি কাজে অলংকৃত। বিগ্রহ কালী। এ মন্দিরের পিছনের দেওয়ালে বেশ বড় আকারের কয়েকটি পোড়ামাটির মূর্তি নিবদ্ধ আছে। এই 'গ্রুপ'-এর সামান্য দক্ষিণে, পূবমুখী, আটচালা, পাথরের

শ্রীধর (শালগ্রাম) মন্দিরটিও ঘোষাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২ ফুট ২ ইঞ্চি (৩·৭ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার), এ দেবালয়ের দালান তিন-খিলানযুক্ত ও সামনের দেওয়াল পোড়ামাটির নিকৃষ্ট অলংকরণ ও পলস্তারার নকাশি কাছে সজ্জিত। 'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতির কালে, পশ্চিমবঙ্গের বহু মন্দিরে এহেন দ্বিবিধ অলংকরণের মিলিত ব্যবহার দেখা যায়।

দক্ষিণপাড়া বা চন্দনতলায় পুবমুখী, পরিত্যক্ত (পূর্বে শালগ্রাম বিগ্রহ ছিল), পাথরের আটচালা মন্দিরটি শতাধিক বছর আগে স্থানীয় কর্মকার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২ ফুট ৮ ইঞ্চি (৩·৮ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার), এ দেবালয়টিতেও পাথরের গাঁথনির ওপর যুগপৎ 'টেরাকোটা' ও পলস্তারার অলংকরণ দেখা যায়। দু'টিরই কারিগরি খুব সাধারণ শ্রেণীর। এ মন্দিরের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ ধনুকাকৃতি 'ভল্ট'-এর ওপর স্থাপিত ও গর্ভগৃহের ছাদ দু'পাশের চওড়া খিলানের ওপর লহরাযুক্ত গম্বুজ দিয়ে নির্মিত।

দাসপাড়ায় দাস পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী, আটচালা, পাথরের রাধাদামোদর (শালগ্রাম) মন্দিরটি সংস্কারের ফলে এখন এমন উগ্র রঙের প্রলেপে আবৃত যে এটিকে পাত্রসায়েরের সম্ভবতঃ সর্বপ্রাচীন মন্দির বলে আর চেনা যায় না। পুরু চুনকামের নীচে পোড়ামাটির সাবেক অলংকরণগুলি প্রায় অদৃশ্য। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭ ফুট (৫·১ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার), এ দেবালয়ের উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায় যে এটি ১৭৩১ শকাব্দে (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত। জনশ্রুতি অনুসারে, পাত্রসায়েরের কালঞ্জয় শিবের মন্দিরটি মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের নির্মিত। তিনি ১৭৫৮ থেকে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি মল্ল-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জনশ্রুতি সত্য হলে, এ দেউলটি এখানকার প্রাচীনতম পুরাকীর্তি হতে পারে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাফলকের অভাবে এ বিষয়ে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যায় না। সেক্ষেত্রে 'পাথুরে প্রমাণ'-সংবলিত দাসপাড়ার মন্দিরটিকেই সবচেয়ে পুরাতন বলে সাব্যস্ত করতে হয়। এটির ফুলকাটা ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর ও গর্ভগৃহের ছাদ চারচালা খিলানের ওপর স্থাপিত। পাত্রসায়েরে আরও দু'চারটি পুরাকীর্তি আছে ; কিন্তু সেগুলি উল্লেখযোগ্য নয়।

পাহাড়পুর : 'ঈদাস' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে অতি দুর্গম কাঁচা রাস্তায় আরও ৪ মাইল

(৬·৪ কিলোমিটার) দক্ষিণে গেলে, ইঁদাস থানার অন্তর্গত পাহাড়পুর গ্রাম (জে. এল. নং ৫৫)। নন্দী (একাদশ তিলি) পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ইটের, দক্ষিণমুখী, পঞ্চরত্ন শ্রীধর (শালগ্রাম) মন্দিরটি এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় পারিবারিক ইতিহাস ও 'টেরাকোটা'-শৈলীর বিচারে এটিকে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬ ফুট ৮ ইঞ্চি (৫ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার), এ দেবালয়ের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর ও গর্ভগৃহে ছাদ দু'পাশের চওড়া খিলানশীর্ষে ন্যস্ত লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর স্থাপিত। ঠাকুরঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি আছে। পোড়ামাটির অলংকরণগুলি সামনের দেওয়ালের দু'পাশে ও কার্নিসের নীচ-বরাবর ৩২টি বেশ বড় আয়তনের পৃথক্ খোপে নিবদ্ধ; বিষয়, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক কাহিনী, সামাজিক দৃশ্য প্রভৃতি। বাইরের খিলানশীর্ষে ও গর্ভগৃহে ঠাকুর রাখবার কুলুঙ্গির চারপাশে প্রচুর নকাশি পঙ্কের কাজ। এহেন দ্বিবিধ সজ্জার একত্র সমাবেশ থেকেও সাব্যস্ত হয় যে আনুমানিক এক শ বছর বা তার কিছু বেশী আগে, 'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতির প্রারম্ভে, এ দেবালয়টি নির্মিত হয়ে থাকবে যখন বিকল্প অলংকরণ হিসাবে পঙ্কের কাজের সূত্রপাত হয়। 'মহাপ্রভুর পুঁথি' নামে এক পুরাতন পুঁথি ঠাকুরঘরে শুদ্ধাচারে রক্ষিত আছে। সেটি কোথা থেকে কিভাবে প্রাপ্ত সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের লোকেরা কিছু বলতে পারেন না। সম্ভবতঃ মূল্যবান এ পুঁথিটি সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রামের আর একটি আটচালা শিবমন্দিরের এখন জীর্ণ দশা হলেও চালাগুলির পঞ্চরথ-বিন্যাস লক্ষণীয়।

বহুলাড়া ঃ খড়্গপুর-আদ্রা রেলপথে বিষ্ণুপুরের পরবর্তী দ্বিতীয় রেল-স্টেশন ওঁদা। সেখানে নেমে, কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৪ মাইল (৬·৪ কিলোমিটার) উত্তর-পুবে, ওঁদা থানার অন্তর্গত ছোট গ্রাম বহুলাড়া (জে. এল. নং ২১১)। এখানকার সিদ্ধেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী ইটের দেউলটি শুধু বাংলাদেশের কেন সর্বভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও উচ্চ সম্মানের আসন পাবার যোগ্য। মিঃ বেগলারের ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ সফরের যে বিবরণ আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্টের অষ্টম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এ মন্দিরের বিশদ বর্ণনা আছে। তা থেকে কিছু অংশ বাংলায় তর্জমা ক'রে উদ্ধৃত করছি। "এ জেলার শ্রেষ্ঠ ও বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ না হলেও সুন্দরতম ইটের মন্দির,

বাঁকুড়া শহর থেকে ১২ মাইল দূরে দ্বারকেশ্বর নদের দক্ষিণ তীরে বহুলাড়া গ্রামে অবস্থিত। দেবালয়টি পলস্তারা-ঢাকা ইটের তৈরি এবং ইটের গায়ে নিপুণ খোদাই কাজগুলি পলস্তারার আবরণ দিয়ে আবৃত। অতএব, এসব নকশায় পলস্তারার ব্যবহার আদিতেই পরিকল্পিত হয়েছিল বলে আমার মনে হয়।···মন্দিরের বর্তমান দ্বারটি পরে সংযোজিত ; এর পেছনে ধাপযুক্ত, উন্নত, ত্রিভুজাকৃতি সাবেক প্রবেশপথটি অবস্থিত।···সম্মুখভাগের গঠন থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে দেওয়ালের স্থুলত্বের মধ্যে রচিত এই প্রবেশ-প্রকোষ্ঠটি ছাড়া আগে আর কোন আনুষঙ্গিক কক্ষ ছিল না। সম্প্রতিকালে নিবদ্ধ এক মহামণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ থেকে দেখা যায় যে তার নির্মাণ-কৌশল ও উপকরণ মূল মন্দিরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও সম্ভবতঃ ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালের থেকে বেশী প্রাচীন নয়।···প্রধান দেবালয়টির চারপাশে প্রথাগতভাবে কয়েকটি উপ-মন্দির স্থাপিত ছিল ; চার কোণে চারটি, তিন দিকে তিনটি ও শিববাহন নন্দীর জন্য সামনে একটি—মোট আটটি উপ-মন্দির পরিবেষ্টিত ছিল এক ইটের প্রাকারে। এখন সে প্রাচীর ও উপ-মন্দির সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত।" ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অব দি ইণ্ডিয়ান পিপল' সিরিজের 'দি স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার' গ্রন্থে এক বিশেষ নিবন্ধে শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী বলেছেন—"কালের প্রকোপে এ মন্দিরের চূড়াটি এখন ভগ্ন, অলংকরণগুলিও জীর্ণ। তবু অঙ্গবিন্যাসের মনোহারিত্বে, আকৃতির রম্যতায় ও অলংকরণের বাহুল্যবর্জিত সরলতায় ইটের এ দেবালয়টিকে সামগ্রিকভাবে সর্বভারতীয় মন্দির স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যেতে পারে।"

কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় এ মন্দিরের বয়স সম্বন্ধে নানা গবেষক নানা মত প্রকাশ করেছেন। কুমারস্বামীর ধারণা এটি খ্রীষ্টীয় দশম শতকে নির্মিত। শ্রী কে. এন. দীক্ষিত স্থাপনাকালকে আরও দু'এক শতাব্দী পেছিয়ে দেবার পক্ষপাতী। আবার, স্থাপত্য ও অলংকরণশৈলীর বিচারে শ্রীসরস্বতী সিদ্ধান্ত করেছেন, এটির নির্মাণকাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে হওয়াই সম্ভব। বর্তমান মন্দিরটি আদিতে জৈনদের না হিন্দুদের দ্বারা নির্মিত সে বিষয়ে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যায় না। মন্দিরের চারপাশের ঢিবি ও গর্ভগৃহের মেঝেতে খননকার্য চালালে হয়ত এ সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তবে গর্ভগৃহে রক্ষিত প্রায় ৫ ফুট (১·৫ মিটার) উচ্চতার পাথরের পার্শ্বনাথ মূর্তিটি ও ১৯২২-২৩

খ্রীষ্টাব্দের খননের সময় আবিষ্কৃত, মন্দিরের সংলগ্ন ইটের অনেকগুলি ছোট ছোট জৈন-স্তূপের নজিরে বোঝা যায় যে শৈবতীর্থে পরিণত হবার আগে এখানে এক জৈন ধর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দৈর্ঘ্যে ৩০ ফুট ১ ইঞ্চি (৯ মিটার), প্রস্থে ২৬ফুট ৯ ইঞ্চি (৮ মিটার) ও উচ্চতায় ৬৪ ফুট (১৯.২ মিটার), পশ্চিমমুখী এ রেখ-দেউলটি খিচিং রীতির বাহুল্যবর্জিত উড়িষ্যা-শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত। বেগলারের মতে, সাবেক সৌধের সামনে কোন মুখমণ্ডপ বা জগমোহন ছিল না; শুধু গর্ভগৃহকে আবৃত ক'রেই এটি তৈরি হয়েছিল। বাইরের দেওয়াল পঞ্চরথ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত ও জাঙ্ঘ ও গণ্ডী অংশে কেন্দ্রীয় রথগুলির গায়ে কুলুঙ্গি ও তাদের ওপরে দেউল-আকৃতির প্রতীক অলংকরণ নিবদ্ধ হয়েছে। মূল মন্দিরের চূড়া এখন ভগ্ন হলেও, তার সাবেক রূপ এই প্রতীক সজ্জাগুলি থেকে জানা যায়। জাঙ্ঘ ও গণ্ডী অংশের বিভাজক হিসাবে উদ্গত ইটের কয়েক সারি কার্নিস ব্যবহৃত হয়েছে ও শিখরের পগগুলির কিনারা তীক্ষ্ণ সমকোণের বদলে রূপান্তরিত হয়েছে মোলায়েম গোলাকৃতিতে। চৈত্য-অলিন্দ, জ্যামিতিক নকশা, ফুললতাপাতার অনুকৃতি, দোলানো মালা ও তার মধ্যে নৃত্যরত মূর্তি প্রভৃতি অগণিত সূক্ষ্ম অলংকরণের অতি ব্যাপক ব্যবহার বহুলাড়া মন্দিরের সবচেয়ে দর্শনীয় বিশেষত্ব। এগুলি সবই পঙ্কের পলস্তারা-ঢাকা, খোদাই-করা ইটের সমবায়ে রচিত। আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের পূর্ব-অঞ্চলের তৎকালীন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রী এইচ. পাণ্ডে তাঁর ১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে লিখেছেন, এই সজ্জাগুলিকে আরও মনোরম করবার জন্য নাকি রঙের ব্যবহারও হয়েছিল। এখন তার কোন চিহ্ন নেই; ওপরের পলস্তারা খসে যাওয়ায় পোড়ামাটির নকাশি টালিগুলি অনাবৃত হয়েছে বহু স্থানে। 'টেরাকোটা' সজ্জার এত ইলাহী প্রয়োগ সত্ত্বেও, বহুলাড়া মন্দিরে পোড়ামাটির মূর্তির বিশেষ ব্যবহার হয়নি। নৃত্যরত মূর্তিগুলি আশপাশের নকশার অঙ্গীভূত বলে তাদের পৃথক্ কোন গুরুত্ব নেই; কিন্তু পুব ও উত্তরের কুলুঙ্গিতে, যথাক্রমে, সিংহ ও হাতির সঙ্গে যুদ্ধরত এক মল্লের ও সম্ভবতঃ এক উপবিষ্টা দেবীর মূর্তির মূল্য অসীম। সমকালীন আর কোন ইটের মন্দিরে এহেন ভাস্কর্যের নিদর্শন আছে বলে আমার জানা নেই। আগের অধ্যায়ে, মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের ইতিহাস আলোচনাপ্রসঙ্গে, এই অপ্রতুলতার কারণ ইতিপূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু মূর্তি-ভাস্কর্যে দীন হলেও অলংকরণের প্রাচুর্য ও মনোহারিত্বে এ দেবসৌধটির সঙ্গে উপমিত হতে পারে এমন মন্দির

বাংলাদেশে অল্পই আছে। উত্তর ভারতের 'নাগর'-শৈলীর দেবালয়গুলির মত আড়ম্বরপূর্ণ বা উড়িষ্যা-রীতির শিখর-দেউলের মত বিশালকায় কোন সৌধ নির্মাণে অক্ষম হলেও বাঙালী স্থপতি ও ভাস্করদের রচিত এহেন ইটের মন্দির আকৃতিগত ভারসাম্যে ও অলংকরণের লাবণ্য ও স্নিগ্ধতায় অধিকতর দক্ষতার পরিচায়ক।

এ মন্দিরের বর্তমান গর্ভগৃহতল প্রবেশপথের থেকে বেশ কিছুটা নীচে আর তার মাঝখানে সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গটি স্থাপিত। পিছনের দেওয়ালের কাছে রক্ষিত পার্শ্বনাথ, গণেশ ও দশভুজা মহিষমর্দিনীর তিনটি পাথরের মূর্তির মধ্যে প্রথমটির উল্লেখ ইতিপূর্বেই করেছি। দুর্গা, কার্তিক এবং গণেশ শিবের আবরণ-দেবতা হিসেবে স্বীকৃত। সেজন্য এ তিনটি বিগ্রহই একদা হয়ত সিদ্ধেশ্বরের তিন দিকে বিরাজ করত। পরে, কোন অজ্ঞাত কারণে, কার্তিকের মূর্তিটি অন্তর্হিত হয়েছে। আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে কর্তৃক সংরক্ষিত বহুলাড়ার এই ইটের দেউলটিকে বাঁকুড়া জেলার শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না।

বহুলাড়ার প্রায় ১ মাইল (১·৬ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পশ্চিমে মকরকোল গ্রামের (জে. এল. নং ২১০) বাইরে এক ইটের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ছাদ, দালান ও এক দিকের দেওয়াল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লেও, গর্ভগৃহের অন্য দেওয়ালগুলির মাথায় লহরার বিন্যাস ও অপেক্ষাকৃত পুরু গড়নের ইট থেকে বোঝা যায় এটি অনেক পরবর্তী কালের। খ্রীষ্টীয় সতেরো-আঠারো শতকে, একাধিক দিকে ত্রি-খিলান দালানযুক্ত যেসব বৃহদায়তন নবরত্ন মন্দির বহু স্থানে নির্মিত হয়েছিল, এটি সম্ভবতঃ তাদেরই একটি।

বাঁকাদহ : বিষ্ণুপুর-মেদিনীপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বিষ্ণুপুর থেকে ৮ মাইল (১৩ কিলোমিটার) দক্ষিণে বাঁকাদহ গ্রাম (থানা—বিষ্ণুপুর; জে. এল. নং ৭১)। খড়্গপুর-আদ্রা রেলপথে, বিষ্ণুপুরের আগের স্টেশন পিয়ারডোবাতে নেমেও এখানে আসা যায়। স্থানীয় তাঁতি সম্প্রদায় একদা বিখ্যাত ছিলেন; তাঁদেরই পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত, বামুনপাড়ার, পুবমুখী, আটচালা, ইটের রাধা-দামোদর (শালগ্রাম) মন্দিরটি এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২ ফুট (৩·৬ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার), এ ছোট দেবালয়টির ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর ও গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর স্থাপিত। পোড়ামাটির অলংকরণগুলি

কেবল খিলানশীর্ষে নিবদ্ধ ; বিষয় (বাঁ দিক থেকে ডাইনে, যথাক্রমে,) রামসীতা, শিববিবাহ ও কৃষ্ণ-গোপিনীগণ। কারিগরি নিম্নশ্রেণীর ও আধুনিক। মূর্তিগুলি ইতিমধ্যেই ক্ষয়ে যেতে আরম্ভ করেছে বলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে মাত্র ১২৪ বছরের প্রাচীন এ মন্দিরের শিল্পীরা 'টেরাকোটা' বিদ্যায়, বিশেষত কাঁচা মাটির অলংকরণগুলি পোড়ানোর বিদ্যায়, বেশ অপটু হয়ে পড়েছিলেন। মন্দিরটি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও তার নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠালিপিটি কিন্তু খুবই তথ্যপূর্ণ। "শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর | সকাব্দা ১৭৬৭ মাহ | আশ্বিনে ২৫ রোজে শুক্র | বার দিবসে আরম্ভ | সন ১২৫২ সাল ১৭৬৮ | মাহ আসাড় ২১ রোজে | সণিবারে প্রতিষ্ঠা সন | ১২৫৩ সাল কৃত শ্রীগুরু | চরণ দাষ কারিগর দীগর | শ্রীনারায়ণ মিস্ত্রি সাকিন বালসি।" মন্দির নির্মাণের আরম্ভ ও সমাপ্তির বার, তারিখ, প্রতিষ্ঠাতা (শ্রীগুরুচরণ দাস) ও কারিগর (বালসি-নিবাসী শ্রীনারায়ণ মিস্ত্রি) সম্পর্কিত এত খবর খুব কম মন্দিরের উৎসর্গলিপিতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ, মন্দির-স্থপতিদের নিবাস সম্পর্কে আলোচনার সময়ে বালসি গ্রামের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। উৎসাহী পাঠক ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় শ্রীতারাপদ সাঁতরার 'বাংলার মন্দির : মন্দিরগড়া স্থপতিদের ঠিকানা' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখতে পারেন।

বাঁকুড়া শহর : বাঁকুড়া জেলায় পুরাকীর্তির ছড়াছড়ি হলেও বাঁকুড়া শহরে তাদের সংখ্যা নামমাত্র। রামপুরপাড়ায় রঘুনাথজীউর দালান-মন্দিরের উৎসর্গলিপিতে প্রতিষ্ঠাকাল ১৫৬১ শকাব্দ (১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) বলে উল্লিখিত থাকলেও সেটি এতদিনের পুরাতন কিনা সন্দেহ। সংস্কারের ফলে দেবালয়টির চেহারা খুব আধুনিক ; প্রতিষ্ঠালিপিটিও পরবর্তী কালের বাংলা হরফে লেখা। পাঠকপাড়ায় পাঠক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী, পঞ্চরত্ন, ইটের রাধাবল্লভ মন্দিরটিতেও কোন লিপি না থাকায়, 'টেরাকোটা'-সজ্জার গুণাগুণের বিচারে সেটিকে দু'শ বছরের বেশী প্রাচীন বলে মনে হয় না। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯ ফুট ১০ ইঞ্চি (৬ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০'৫ মিটার), এ দেবালয়ের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর ও গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর স্থাপিত। অন্য চূড়াগুলির তুলনায় কেন্দ্রেরটি বিসদৃশভাবে বড়। গর্ভগৃহ থেকে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি আছে। অষ্ট-ধাতুর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দু'টি বেশ বড় ও খুব সুন্দর। পোড়ামাটির অলংকরণগুলি শুধু সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ। পুরানো ক্ষয়িত

কয়েকটি ফলকের স্থানে নতুন-লাগানো নিরেস মূর্তিগুলি বেশ দৃষ্টিকটু। 'টেরাকোটা' কারিগরি মাঝারি ধরনের; মূর্তি-ভাস্কর্যের বিষয়—কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, পৌরাণিক কাহিনী ও নানাবিধ সামাজিক দৃশ্য। তবে খিলানশীর্ষের প্যানেলগুলিতে ফুলপাতার নকশা, নৃত্যরত কৃষ্ণ-গোপিনী ও পেখম-মেলা ময়ুরের ভাস্কর্যে অপেক্ষাকৃত সজীবতা ও মুনশীয়ানা লক্ষণীয়।

শহরের পুরাতন মসজিদটিতে প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায়, আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের সংজ্ঞা অনুসারে সেটি পুরাকীর্তির পর্যায়ে পড়ে কিনা বলা যায় না। স্থাপত্যের দিক থেকেও ইমারতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। ওয়েস্‌লিয়ান মিশন (বর্তমানে মেথডিস্ট মিশনারী সোসাইটি) কর্তৃক স্থাপিত প্রধান গির্জাটির বয়সও সম্ভবতঃ এক শ বছরের কম, কেননা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ওই মিশনের রেভারেণ্ড জে. আর. ব্রডহেড এখানে এসে কাজ শুরু করবার পরে সেটি নির্মিত হয়।

বামিরা: 'বালসি' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বালসির মাইল দেড়েক (২.৪ কিলোমিটার) উত্তরে, বিষ্ণুপুর-পাত্রসায়ের পিচ-রাস্তার পাশে (পুবে), বামিরা গ্রাম (থানা পাত্রসায়ের; জে. এল. নং ৫০)। বিষ্ণুপুরের দিক থেকে আসতে হলে, পাত্রসায়েরগামী পিচের সড়কে প্রায় ১৬ মাইল (২৫.৮ কিলোমিটার) পথ এসে, ডান-হাতি গ্রাম বামিরা। বাঁকুড়া জেলার ইটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবরত্ন মন্দিরটি এখানকার দক্ষিণপাড়ায় অবস্থিত। উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮ ফুট ১০ ইঞ্চি (৫.৭ মিটার), পুবমুখী এ দেবালয়ের পুব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট' ও এক জোড়া আড়াআড়ি খিলানের ওপর এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালসংলগ্ন চারটি খিলানশীর্ষে ছোট গম্বুজের ওপর রক্ষিত। ঠাকুরঘরের দক্ষিণ-পুব কোণ থেকে ওপরে যাবার সিঁড়ি আছে। লঙ্কাযুদ্ধ, পৌরাণিক দেবদেবী প্রভৃতি বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত পোড়ামাটির অলংকরণগুলি প্রধানতঃ খিলানশীর্ষে নিবদ্ধ অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মূর্তি-ভাস্কর্য, যাদের কারিগরি খুবই প্রশংসনীয়। দেওয়ালের অনেক অংশে পলস্তারা না লাগিয়ে ইটের গাঁথনি অনাবৃত রাখা হয়েছে। সুসমতল ইটের মার্জিত বিন্যাসও যে মনোহর হতে পারে, এ মন্দির তার প্রমাণ। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ দেবালয়ের নির্মাতার নাম অজ্ঞাত। আকারপ্রকারে অন্যূন দু'শ বছরের প্রাচীন এই সুন্দর মন্দিরটির গায়ে এখন বড় বড় ফাটল দেখা

দিয়েছে। সেবাপূজা স্থানীয় গ্রামবাসীরাই চালান। চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন-উৎসব বেশ ঘটা ক'রেই হয়ে থাকে। তখন ভক্ত্যা হয় ৩০।৩৫ জন। বাণ-ফোঁড়া, আগুন-হাঁটা প্রভৃতি প্রথা এখনও প্রচলিত; মানতকারীরা 'শালে ভর'ও দিয়ে থাকেন। চড়ক আগে হত; এখন আর হয় না।

বালসি : 'পাত্রসায়ের' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ ইতি-পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। পাত্রসায়ের থেকে বিষ্ণুপুরগামী দক্ষিণমুখী পিচের সড়কে প্রায় ৬ মাইল (৯'৭ কিলোমিটার) গিয়ে বাঁ-হাতি (পশ্চিমমুখী) কাঁচা রাস্তায় আরও মাইলখানেক (১'৬ কিলোমিটার) দূরে পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত বড় গ্রাম বালসি (জে. এল. নং: বালসি পূর্বপাড়া—৮৪; বালসি দক্ষিণপাড়া—৮৮)। গ্রামের মজকুড়ি পাড়ায় দক্ষিণমুখী, পাথরের, আটচালা লক্ষ্মীনারায়ণ (শালগ্রাম) মন্দিরটি এ জেলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯ ফুট (৫'৭ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২ মিটার), এ দেবালয়ের ত্রি-খিলান দালান ও গর্ভগৃহের ছাদ উভয়ই 'ভল্ট'-এর ওপর স্থাপিত। পাথরের এত বড় মন্দিরের ক্ষেত্রে এহেন স্থাপত্যরীতি বেশ অভিনব। এ অঞ্চলে প্রচলিত প্রথা অনুসারে, আটচালা মন্দিরের উপর্যুপরি দু'টি চারচালার মধ্যে ব্যবধান এখানেও খুব কম; ওপরের অংশ সেজন্য বেশ খর্বাকৃতি দেখায়। প্রবেশ-খিলানগুলির বিস্তার অসাধারণ—প্রায় সাড়ে তিন ফুট (১'১ মিটার)। তাদের শীর্ষে নিবদ্ধ অলংকরণ হয়ত পোড়ামাটির; এখন গাঢ় চুনের প্রলেপে আবৃত। সামনের ও গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বারের দু'পাশের দেওয়ালে বড় বড় কয়েকটি 'বা-রিলিফ' মূর্তিকে পাথরের বলে মনে হয়; সেগুলিও কলিচুনে ঢাকা। কাঠের দরজা দু'টিতে, মোট আটটি প্যানেলে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য বেশ সুন্দরভাবে ক্ষোদিত, কিন্তু তারাও এলুমিনিয়ম পেন্ট-এর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। সামনের প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনে এক পাকা নাটমণ্ডপ থাকা সত্ত্বেও মন্দিরের গায়ে টিন লাগিয়ে যে আচ্ছাদনের সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে কার্নিসের নীচে নিবদ্ধ পাঁচ পংক্তির পাথরের প্রতিষ্ঠালিপিটি পড়তে খুবই অসুবিধা হয়। সে যাই হোক, আংশিকভাবে ক্ষয়িত সে লিপিটি থেকে জানা যায়, ৯৫৮ মল্লাব্দে (১০৫৯ বঙ্গাব্দে বা ১৫৭৪ শকাব্দে বা ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে) মন্দিরটি নির্মিত। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে, মল্ল-রাজবংশের জামকুঁড়ি শাখার পৃষ্ঠপোষকতায় এ দেবালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। বালসি থেকে জামকুঁড়ি অবধি সোজাসুজি দূরত্ব ছ'সাত মাইলের বেশী হবে না;

কয়েকটি ফলকের স্থানে নতুন-লাগানো নিরেস মূর্তিগুলি বেশ দৃষ্টিকটু। 'টেরাকোটা' কারিগরি মাঝারি ধরনের; মূর্তি-ভাস্কর্যের বিষয়—কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, পৌরাণিক কাহিনী ও নানাবিধ সামাজিক দৃশ্য। তবে খিলানশীর্ষের প্যানেলগুলিতে ফুলপাতার নকশা, নৃত্যরত কৃষ্ণ-গোপিনী ও পেখম-মেলা ময়ূরের ভাস্কর্যে অপেক্ষাকৃত সজীবতা ও মুনশীয়ানা লক্ষণীয়।

শহরের পুরাতন মসজিদটিতে প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায়, আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের সংজ্ঞা অনুসারে সেটি পুরাকীর্তির পর্যায়ে পড়ে কিনা বলা যায় না। স্থাপত্যের দিক থেকেও ইমারতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। ওয়েস্‌লিয়ান মিশন (বর্তমানে মেথডিস্ট মিশনারী সোসাইটি) কর্তৃক স্থাপিত প্রধান গির্জাটির বয়সও সম্ভবতঃ এক শ বছরের কম, কেননা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ওই মিশনের রেভারেণ্ড জে. আর. ব্রডহেড এখানে এসে কাজ শুরু করবার পরে সেটি নির্মিত হয়।

বামিরা: 'বালসি' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বালসির মাইল দেড়েক (২·৪ কিলোমিটার) উত্তরে, বিষ্ণুপুর-পাত্রসায়ের পিচ-রাস্তার পাশে (পুবে), বামিরা গ্রাম (থানা পাত্রসায়ের; জে. এল. নং ৫০)। বিষ্ণুপুরের দিক থেকে আসতে হলে, পাত্রসায়েরগামী পিচের সড়কে প্রায় ১৬ মাইল (২৫·৮ কিলোমিটার) পথ এসে, ডান-হাতি গ্রাম বামিরা। বাঁকুড়া জেলার ইটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবরত্ন মন্দিরটি এখানকার দক্ষিণপাড়ায় অবস্থিত। উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮ ফুট ১০ ইঞ্চি (৫·৭ মিটার), পুবমুখী এ দেবালয়ের পুব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্‌ট' ও এক জোড়া আড়াআড়ি খিলানের ওপর এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালসংলগ্ন চারটি খিলানশীর্ষে ছোট গম্বুজের ওপর রক্ষিত। ঠাকুরঘরের দক্ষিণ-পুব কোণ থেকে ওপরে যাবার সিঁড়ি আছে। লঙ্কাযুদ্ধ, পৌরাণিক দেবদেবী প্রভৃতি বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত পোড়ামাটির অলংকরণগুলি প্রধানতঃ খিলানশীর্ষে নিবদ্ধ অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মূর্তি-ভাস্কর্য, যাদের কারিগরি খুবই প্রশংসনীয়। দেওয়ালের অনেক অংশে পলস্তারা না লাগিয়ে ইটের গাঁথনি অনাবৃত রাখা হয়েছে। সুসমতল ইটের মার্জিত বিন্যাসও যে মনোহর হতে পারে, এ মন্দির তার প্রমাণ। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ দেবালয়ের নির্মাতার নাম অজ্ঞাত। আকারপ্রকারে অন্যূন দু'শ বছরের প্রাচীন এই সুন্দর মন্দিরটির গায়ে এখন বড় বড় ফাটল দেখা

ধাপযুক্ত চারচালা পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছিল। গর্ভগৃহের প্রবেশ-দরজা ঘিরে লঙ্কাযুদ্ধের পোড়ামাটির মূর্তিগুলি খুবই অভিনব। রাবণের এখানে একটিমাত্র মাথা ও শিবভক্তির প্রতীকরূপী এক বৃষ তার ধনুকের ওপর উৎকীর্ণ। পক্ষান্তরে, রামের ধনুকের ওপর বিন্যস্ত হনুমানের এক প্রতীকমূর্তি স্থাপিত।

বালসি গ্রামে আরও কিছু মন্দিরাদি আছে কিন্তু সেগুলি খুব উল্লেখযোগ্য নয় বলেই শুনেছি।

বাসুদেবপুর ঃ বিষ্ণুপুর-মেদিনীপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় ৪ মাইল (৬'৪ কিলোমিটার) দক্ষিণে কুষ্ঠনিবারণ সঙ্ঘের হাসপাতালের পাশ দিয়ে বাঁ-হাতি (পুবমুখী) কাঁচা রাস্তায় আরও প্রায় ৩ মাইল (৪'৮ কিলোমিটার) গেলে, বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ছোট গ্রাম বাসুদেবপুর (জে. এল. নং ৩৫)। বিষ্ণুপুর থেকে সরাসরি দূরত্ব ৫ মাইলের (৮'১ কিলোমিটার) বেশী না হলেও, গভীর শালবনের মধ্য দিয়ে শেষের ৩ মাইল দীর্ঘ গ্রাম্য পথটির জন্য বাসুদেবপুর বেশ দুর্গম স্থান। এখানকার পাথরের চারচালা মন্দিরটি নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এমন দুরধিগম্য জায়গায় কেন যে সেটি নির্মিত হয়েছিল, সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে। উত্তরে বলা যেতে পারে যে এ মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় মল্ল-রাজধানী বিষ্ণুপুর খুবই সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল নগর ছিল এবং মাত্র ৫ মাইল দূরের বাসুদেবপুর তখন হয়ত শহরতলীর পর্যায়ে পড়ত।

বেশ বড় বড় ঝামা পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি, দক্ষিণমুখী, পরিত্যক্ত, চারচালা মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৫ ফুট (৪'৫ মিটার)। বাঁকুড়া জেলায় ইট বা পাথরের চারচালা মন্দিরের সংখ্যা মুষ্টিমেয়; সেদিক থেকে এ পুরাকীর্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফুলকাটা-খিলানের প্রবেশ-দরজাটি পার হয়ে আগাছা-সমাকীর্ণ গর্ভগৃহে ঢুকলে দেখা যায় যে অতি জীর্ণ ছাদটি ধাপযুক্ত চারচালা গাঁথনির ওপর স্থাপিত ও তার উত্তর-পুব কোণের অনেকখানি অংশ একেবারেই ভেঙে পড়েছে। সাবেক বাসুদেব (শালগ্রাম) বিগ্রহটি এখন স্থানীয় এক গ্রামবাসীর গৃহে উপাসিত ও পাথরের উৎসর্গলিপিটি বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় রক্ষিত। কিছু অংশ ভগ্ন বলে ছ'লাইনের এ লিপির সবটুকু পাঠোদ্ধার করা যায় না; যেটুকু যায় তা নিম্নরূপ ঃ "লোচনপুর হরলো | চন লবতি গণিতে | নিজে শাকে দেব | কুলং শ্রীকৃষ্ণঃ সম | পিতং শ্রী··· | শ···৯৩২।"

প্রতিষ্ঠাতার নাম পড়া না গেলেও, ৯৩২ মল্লাব্দে (১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে) প্রথম বীর সিংহ বিষ্ণুপুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেজন্য, রাজধানীর অদূরে, অভিনব রীতির এই লিপিযুক্ত দেবালয়টি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

বিক্রমপুর: বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), ওঁদার ৪ মাইল (৬'৪ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে বাঁ-হাতি যে মোরামের শাখাপথ বার হয়েছে তাতে মাইলখানেক (১'৬ কিলোমিটার) গেলে, ওঁদা থানার অন্তর্গত বিক্রমপুর গ্রাম (জে. এল. নং ১০৩)। খড়্গপুর-আদ্রা রেলপথে ওঁদার পরবর্তী স্টেশন, ৩ মাইল (৪'৮ কিলোমিটার) দূরের ভেদুয়াসোলে নেমেও এখানে আসা যায়। এখানকার উড়িষ্যা-শৈলীর, দক্ষিণমুখী, পাথরের শিখর-দেউলটি জেলার শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তিগুলির অন্যতম। উচ্চতায় প্রায় ৪৫ ফুট (১৩'৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭ ফুট (৫'১ মিটার), এ দেবালয়ের সামনের জগমোহনটি প্রায় ২০ ফট (৬ মিটার) উঁচু ও ১৩ ফুট × ১৩ ফুট (৩'৯ × ৩'৯ মিটার) প্রস্থচ্ছেদের। মূল দেউল মন্দিরের ও পীঢ়া রীতির জগমোহনের দু'টি শিখরই সপ্তরথ ; শেষেরটি তিনটি স্তরে বিভক্ত। দু'টিরই ছাদ ধাপযুক্ত চারচালার ওপর ন্যস্ত। জগমোহনে ঢোকবার তিনটি ও গর্ভগৃহে ঢোকবার একটি প্রবেশপথের খিলানগুলিও ধাপযুক্ত। জগমোহনের সামনের দেওয়ালে, কার্নিসের নীচে নিবদ্ধ পাথরের উৎসর্গলিপিটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। সেটির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীরাধিকাকৃষ্ণপদেশকেন ভাবালাঙ্ক | গে সৌধগৃহংসমর্পিতং শ্রীবীরসীং | হ ক্ষিতিপালযোষিতামুদাজননী | শ্রীরঘুনাথ শ্রীপতেঃ॥ সকে ৯৬০।" প্রথম রঘুনাথ সিংহ যে ৯৬০ মল্লাব্দে (১৬৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে) বিষ্ণুপুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এ দেবালয় স্থাপনের এক বছর পরে, ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত জোড়-বাংলা মন্দিরটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন ও সেখানকার উৎসর্গলিপিতে নিজের পরিচয় দেন বীর হম্বীরের পুত্র বলে। কিন্তু এখানে পরিচয় দিয়েছেন ক্ষিতিপাল বীর সিংহের পত্নীর পুত্র হিসাবে, ঐতিহাসিক-ভাবে যাতে কোন ভুল নেই।

জগমোহন সমেত পাথরের দেউল আর একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে বাঁকুড়া জেলায়—কোতুলপুর থানার সিবর গ্রামে। সে দিক থেকে এ মন্দিরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটির বর্তমান অবস্থা শোচনীয়। পিছনের জীর্ণ দেওয়াল ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে ও জগমোহনের

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বেশ কিছু অংশ ভেঙেই পড়েছে ইতিমধ্যে। বর্তমান মালিক, এ গ্রামের বল্লভ ও অধিকারী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পরিবার, কৃষ্ণরাধিকার অষ্টধাতুর বিগ্রহ দু'টি নিজেদের বাড়িতে স্থানান্তরিত করেছেন; সেখানেই পালা ক'রে তাঁদের উপাসনা চলে।

বিষ্ণুপুর : খড়্গাপুর-আদ্রা রেলপথের বিষ্ণুপুর স্টেশনে নেমে কিংবা বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-কোতুলপুর-আরামবাগ-চাঁপাডাঙ্গা-শিয়াখালা-কলকাতা পিচের সড়কে (বিভিন্ন অংশের মধ্যে নিয়মিত বাস চলে) বাঁকুড়া অথবা কলকাতার দিক থেকে বিষ্ণুপুর শহরে পেঁছিনো যায়। এত পুরাকীর্তি-বহুল স্থান বাংলাদেশে কমই আছে; তাদের মধ্যে শুধু উল্লেখযোগ্যগুলির সংখ্যাই প্রায় তিরিশ। স্থানাভাবে, কেবল সেগুলিরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হবে।

মন্দিরপ্রসঙ্গে আসবার আগে বিষ্ণুপুরের অন্য জাতীয় পুরাকীর্তির কথা বলে নেওয়া ভাল। প্রথমে 'বাঁধ' বা প্রাচীন দীঘিগুলির কথাই বলি। রাজধানীর জলকষ্ট দূর করবার জন্য ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে রাজা দ্বিতীয় বীর সিংহ ১৬৫৭ থেকে ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শহরের ভিতরে ও আশপাশে লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, গাঁতাতবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, শ্যামবাঁধ, পোকাবাঁধ (সাবেক নাম বীরবাঁধ) ও চৌখনবাঁধ নামে আটটি বিরাট জলাশয় খনন করান। চৌখনবাঁধটি এখন ভরাট হয়ে গেলেও অন্যগুলি অল্পবিস্তর ভাল অবস্থায় আছে। বস্তুতঃ, একটি শহরের কাছাকাছি এতগুলি বড় দীঘি পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই বাঁধের রক্ষাব্যূহের ভিতরে পরিখা-বেষ্টিত উঁচু মাটির প্রাকার ও তার অভ্যন্তরে বিষ্ণুপুরের দুর্গ ও রাজ-প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। এখন রাজপুরীর সামান্যই অবশিষ্ট আছে; দুর্গেরও মাটির প্রাকারের কিছু কিছু অংশ ছাড়া শুধু দু'টি পাথরের দরজা বর্তমান। বড় দরজাটির অদূরে উচ্চভূমির ওপর ইটের তৈরি যে এক বিশাল চৌবাচ্চা দেখা যায়, স্থানীয় লোকে তাকে বলেন 'গুমঘর'; মল্ল-রাজত্বকালে গর্হিত অপরাধীদের নাকি এখানে নিক্ষেপ ক'রে শাস্তি দেওয়া হ'ত। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে, আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে কর্তৃক সংরক্ষিত, 'দলমাদল' নামের বিশাল কামানটি এক চিত্তাকর্ষক পুরাকীর্তি। জনশ্রুতি, রাজা গোপাল সিংহের রাজত্বকালে, নগরদেবতা মদনমোহন এই কামান থেকে গোলাবর্ষণ ক'রে ভাস্কর রাও-এর নেতৃত্বে আক্রমণ-কারী এক বর্গীবাহিনীকে বিতাড়িত করেছিলেন। বর্গীর দল মর্দনকারী এ আগ্নেয়াস্ত্রের তাই নাম হয়েছে 'দলমর্দন' বা, অপভ্রংশে, 'দলমাদল'।

সাড়ে বার ফুট (৩'৮ মিটার) দীর্ঘ এ কামানের চোঙের ব্যাস সওয়া এগারো ইঞ্চি (২৮.৬ সেন্টিমিটার) ও মুখের ব্যাস সাড়ে এগারো ইঞ্চি (২৯'২ সেন্টিমিটার)। তেষট্টিটি লোহার আঙটা ঢালাই ক'রে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে এটি নির্মাণ করতে যে দক্ষতার প্রয়োজন হয়েছিল তা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। কামানটির বাইরের গায়ে এক সাংকেতিক চিহ্ন ও ফার্সী লিপি থেকে অনুমান হয়, মল্লরাজারা আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের জন্য হয়ত মুসলমান কারিগর নিয়োগ করতেন।

বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত পুরাবস্তুর এক বিশাল সংগ্রহ বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে রক্ষিত আছে। নানা প্রকার প্রাগৈতিহাসিক আয়ুধ; মৌর্য ও পরবর্তী যুগের পোড়ামাটির বিবিধ শিল্প-নিদর্শন; গুপ্ত-যুগ ও উত্তরকালের বহুসংখ্যক মুদ্রা ও পাথরের ভাস্কর্য; সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা ভাষায় প্রায় ছ'হাজার প্রাচীন পুঁথি; পুরাতন বস্ত্র, পট, কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য, দশাবতার তাস ইত্যাদির এই মহামূল্যবান সংগ্রহটি বাঁকুড়া জেলার পুরাতত্ত্ব বিষয়ে উৎসাহী সকলেরই অবশ্য দর্শনীয়।

বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিকে দেউল, চালা, রত্ন প্রভৃতি স্থাপত্যগত পৃথক্ পর্যায়ে ভাগ ক'রে আলোচনা করাই সমীচীন। এসব পর্যায়ে পড়ে না এহেন দু'একটি অভিনব পুরাকীর্তির কথা প্রথমে বলা প্রয়োজন। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত রাসমঞ্চটি আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বীর হম্বীর নির্মাণ করেন। উচ্চতায় ৫ ফুট (১'৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮০ ফুট ৩ ইঞ্চি (২৪ মিটার) ঝামা-পাথরের এক বিশাল বেদীর ওপর ইটের এই আশ্চর্য ইমারতটি স্থাপিত। গর্ভগৃহ ও তার দক্ষিণে একটি উপ-কক্ষকে ঘিরে তিন প্রস্থ খিলানযুক্ত দেওয়াল চারদিক ঘুরে এসেছে। সবচেয়ে ভিতরের দেওয়ালের প্রতি দিকে পাঁচটি, দ্বিতীয় দেওয়ালের প্রতি দিকে আটটি ও বাইরের দেওয়ালের প্রতি দিকে দশটি ক'রে ফুলকাটা প্রশস্ত খিলান বড় বড় আটকোণা থামের ওপর ন্যস্ত। আর এসব আচ্ছাদিত ক'রে চারদিক থেকে ধাপযুক্ত ঢালু চালা প্রায় ৩৫ ফুট (১০'৫ মিটার) উচ্চতায় উঠে গিয়ে এক স্বল্পপরিসর সমতল ছাদে মিলিত হয়েছে। বাইরের খিলানগুলির গায়ে পোড়ামাটির পদ্ম ও পুব দিকের দেওয়ালে গাইয়ে-বাজিয়েদের কিছু 'টেরাকোটা' মূর্তি দেখা যায়। পিরামিড-আকৃতি চূড়ার মূল বরাবর প্রতি দিকে চারটি ক'রে দোচালা ও প্রতি কোণে একটি ক'রে চারচালা একদা নির্মিত হয়েছিল অলংকরণের জন্য। এদের

অধিকাংশই এখন লুপ্ত হয়েছে। মল্লরাজাদের আমলে, বার্ষিক রাস উৎসবের সময়, বিষ্ণুপুরের যাবতীয় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ জনসাধারণের দর্শনের জন্য এখানে এনে রাখা হত। সে প্রথায় ছেদ পড়েছে বহুকাল। আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের রক্ষণাধীন এই পরিত্যক্ত রাস-মঞ্চটির মত অভিনব ইমারত বাংলাদেশে আর নেই।

দেউল পর্যায়ের সৌধগুলির মধ্যে ভট্টাচার্যপাড়ার মল্লেশ্বর শিব-মন্দিরের স্থান সর্বাগ্রে। ল্যাটেরাইট পাথরে তৈরি, বহুসংস্কৃত, এ ইমারতটি এখন যে অদ্ভুত আকার নিয়েছে তাতে দেওয়ালের গায়ের রথ-পথ ও উদ্গত অংশগুলির নজিরে এটি আদিতে যে দেউল ছিল তা সাব্যস্ত করতে হয়। অবশ্য, উৎসর্গলিপিটিও একই সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে। সেটি নিম্নরূপ: "বসুকর নব গণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন / অতি ললিতং দেবকুলং নিহিতং শিব পাদপদ্মেষু।" অর্থাৎ, ৯২৮ মল্লাব্দে (১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীবীর সিংহ কর্তৃক অতি ললিত দেবকুল (দেউল) শিবপাদপদ্মে নিহিত (সমর্পিত) হল। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বীর সিংহ সম্পর্কে কিছু মতভেদ আছে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আমার লেখা 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে আমি তাঁকে বীর হম্বীর বলেই সাব্যস্ত করেছিলাম। আরও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে, আমার সম্পাদিত ও ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে আমি তাঁকে বীর হম্বীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও রঘুনাথ সিংহের অগ্রজ বলে চিহ্নিত করেছি। তিনি মল্ল-সিংহাসনে আনুমানিক ১৬১৬ থেকে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ অবধি অধিষ্ঠিত ছিলেন ও সে সময়েই এ মন্দিরের হয় নির্মাণ নয় সংস্কার করেন। শেষোক্ত মতটিই বেশী যুক্তিসহ মনে হয়। আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের পূর্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ ডি. বি. স্পুনারের ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণী থেকে দেখা যায় যে গত শতকের শেষ দিকে সাবেক রেখ-শিখরটি ভেঙে পড়লে, তার স্থানে বর্তমান আটকোণা চূড়াটি স্থাপিত হয়। প্রবেশপথের ওপরে এক কুলুঙ্গির মধ্যে নিবদ্ধ সবুজ ক্লোরাইট পাথরের হাতিটি অপূর্ব; এটি আদি মন্দির কি তার চেয়েও প্রাচীন হতে পারে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি (৬৮ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০.৫ মিটার), পশ্চিমমুখী, এ দেবালয়টি বর্তমানে আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে কর্তৃক সংরক্ষিত।

দুর্গের পাথর-দরজার উত্তর-পশ্চিমে কৃষ্ণ (জগন্নাথ) ও বলরামের নামে চিহ্নিত (কিন্তু বর্তমানে পরিত্যক্ত) পাশাপাশি দু'টি দক্ষিণমুখী

ইটের রেখ-দেউল উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১ ফুট (৩'৩ মিটার)। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে এদের নির্মাণকাল আঠারো শতকের শেষের দিকে বলে মনে হয়। বরণ্ডের নীচের অংশে প্রথাগত উদ্‌গত সমান্তরাল শিরা, চূড়ায় অঙ্গ-শিখরের বিন্যাস ও অধুনালুপ্ত পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত এ রেখ-দেউল দু'টি দেউল-স্থাপত্যের পুনরুজ্জীবনের ক্ষীণ প্রয়াস হিসাবে চিত্তাকর্ষক। পরিত্যক্ত হলেও মন্দির দু'টি এখনও খুব জীর্ণ হয়নি।

দুর্গ এলাকার ভিতরেই, বিখ্যাত জোড়-বাংলা মন্দিরের কাছে, আর দু'টি উত্তরমুখী, পরিত্যক্ত, পলস্তারা-আবৃত দেউল-মন্দির কেশব রায় ও নিকুঞ্জবিহারীর নামে চিহ্নিত। আয়তনে তারা কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরের মতই তবে খিলানশীর্ষে সামান্য 'টেরাকোটা' অলংকরণ থাকলেও তাদের চূড়ায় অঙ্গশিখর নেই। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ দু'টি দেউলও আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত বলে মনে হয়।

যে মন্দির-স্থাপত্যরীতিটি বিষ্ণুপুরে সবচেয়ে সমাদৃত হয়েছে তাকে একরত্ন-শৈলী বলা যেতে পারে। বাঁকানো কার্নিসযুক্ত দেওয়াল ও ঈষৎ ঢালু ছাদের কেন্দ্রে একটিমাত্র চূড়ার বিন্যাস এ রীতির বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, মন্দিরের আয়তন, চূড়ার গঠন ও ছাদ বা কার্নিসের বক্রতার তারতম্য হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বিষ্ণুপুরে অদ্যাপি বর্তমান এ শ্রেণীর বারোটি মন্দিরের মধ্যে কেবলমাত্র মদনমোহন ও চিণ্ময়ী মন্দির দু'টিই যে ইটের ও বাকি সবগুলি যে ল্যাটেরাইট পাথরে তৈরি, সে কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠাফলকের নজিরে লালবাঁধ-তীরবর্তী কালাচাঁদ মন্দিরটিই সবচেয়ে প্রাচীন; ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথ সিংহ এটি স্থাপন করেন। আর সর্বকনিষ্ঠটি রাধাশ্যামের; ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সেটির প্রতিষ্ঠা করেন চৈতন্য সিংহ। এই শতাব্দীকাল সময়ে একরত্ন রীতি ছাড়া অন্য রীতির একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য দেবালয় নির্মিত হয়েছিল মল্ল-রাজধানীতে; সেটি দ্বিতীয় বীর সিংহের মহিষী রাণী শিরোমণি (অথবা চূড়ামণি) কর্তৃক ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত মদন-গোপালের পাথরের পঞ্চরত্ন মন্দির। বিষ্ণুপুরে এত সমাদর লাভ করলেও এ রীতির দেবালয় মল্লভূমের অন্যত্র খুব অল্পই নির্মিত হয়েছে।

অবস্থান অনুসারে, এ মন্দিরগুলিকে মোটামুটি চার দলে ভাগ করা যায়। লালবাঁধের দক্ষিণে কালাচাঁদ, রাধাগোবিন্দ, নন্দলাল ও রাধামাধব মন্দির। এদের কিছু পশ্চিমে, যৌথভাবে 'জোড়-মন্দির' নামে পরিচিত তিনটি দেবালয়, যাদের পৃথক্ কোন নাম নেই। দুর্গ

এলাকায় দু'টি—লালজী ও রাধাশ্যাম। আর শহরের মধ্যে চারটি—মুরলীমোহন, মদনমোহন, চিণ্ময়ী ও রাধাকৃষ্ণ। এছাড়া নাম ও প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন আর একটি আছে কৃষ্ণবাঁধের তীরে, পাটপুরে।

দক্ষিণমুখী কালাচাঁদ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩১ ফুট ৪ ইঞ্চি (৯.৪ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০.৫ মিটার)। চারদিকেই ফুলকাটা তিন-খিলানযুক্ত দালান আছে। সামনের দেওয়ালে পাথরের 'বা-রিলিফ' ভাস্কর্যগুলি দু'পাশে তিন সারি ক'রে ও কার্নিসের নীচে এক সারি খোপের মধ্যে নিবদ্ধ। বিষয়—পৌরাণিক দেবদেবী, কৃষ্ণলীলা, নর্তক, সাধক ইত্যাদি। ল্যাটেরাইটের ওপর আগে পঙ্কের আস্তরণ ছিল; এখন অনেক জায়গায় চটা উঠে গেছে। প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ: "শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে শকেদ্বি | রসাঙ্কযুক্তে নবরত্নমেতৎ | শ্রীবীর হম্বীর নরেশ সূনুর্দদৌ | নৃপ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ॥ ৯৬২।" ৯৬২ মল্লাব্দে, অর্থাৎ ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ সৌধটির স্থাপত্যগত গুরুত্ব যথেষ্ট কেননা একরত্ন রীতির এটিই সর্বপ্রথম মন্দির। বিগ্রহ এখন রাধাশ্যাম মন্দিরে স্থানান্তরিত।

লালবাঁধ 'গ্রুপ'-এর মাঝামাঝি জায়গায় রাধাগোবিন্দ মন্দির অবস্থিত। দক্ষিণমুখী এ দেবালয় দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৪০ ফুট ৬ ইঞ্চি (১২.২ মিটার)ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০.৫ মিটার)। ফুলকাটা ত্রি-খিলান দালান শুধু সামনের দিকেই নিবদ্ধ। দেওয়ালের দু'পাশে ও কার্নিসের নীচ বরাবর দু'সারি ক'রে পাথরের 'বা-রিলিফ' মূর্তি-ভাস্কর্য পৃথক্ পৃথক্ খোপে বিন্যস্ত। ১০৩৫ মল্লাব্দে (১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির পাশে, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি (২ মিটার) ও উচ্চতায় ৮ ফুট (২.৪ মিটার) পাথরের খুব সুন্দর একটি রথ আছে। এর থেকে বড় অনুরূপ আর একটি রথ দুর্গের দরজার কাছেও দেখা যায়। কাঠের রথের মত এদের টেনে নিয়ে যাওয়া যেত না; কিন্তু বিশেষ বিশেষ উৎসবে মন্দির-বিগ্রহ বা তার ছোট বিকল্পমূর্তি সম্ভবতঃ আনুষ্ঠানিকভাবে এসব পাথরের রথে স্থাপন করা হত। অবশ্য এহেন অনুষ্ঠান এখানে বহুদিন হয়নি কেননা মন্দিরে এখন কোন বিগ্রহ নেই।

লালবাঁধ 'গ্রুপ'-এর উত্তরতম মন্দিরটি নন্দলালের। দক্ষিণমুখী এ দেবালয় দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৩ ফুট ৩ ইঞ্চি (১০ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার)। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ মন্দিরের ত্রি-খিলান সামনের দেওয়ালে সামান্য কিছু পাথরের অলংকরণ আছে।

কালাচাঁদ মন্দিরের ঠিক পশ্চিমে, ১০৪৩ মল্লাব্দে (১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত, রাধামাধব মন্দিরটি এ দলে সবচেয়ে আধুনিক ও সবচেয়ে বেশী অলংকৃত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৬ ফুট ২ ইঞ্চি (১০'৮ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার), দক্ষিণমুখী এ দেবালয়ের শুধু সামনে এক ফুলকাটা ত্রি-খিলান দালান নিবদ্ধ আছে। অলংকরণগুলির অবস্থান প্রায় ইটের মন্দিরের মতই। ভিত্তিবেদীর সমান্তরাল দু'টি সারিতে পশুপক্ষী ও পৌরাণিক ভাস্কর্য। দু'পাশের দেওয়াল ও কার্নিসের নীচে খোপের মধ্যে দু'সারি ক'রে মূর্তি-ভাস্কর্য। খিলানশীর্ষে ও থামের গায়েও নানাবিধ সজ্জার ছড়াছড়ি। বিষয়, প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, পদ্ম প্রভৃতি। সবই আগে পঙ্কের প্রলেপে আবৃত ছিল। এখনও খিলানশীর্ষে তা বহুলাংশে অক্ষত আছে এবং সেগুলি থেকে কারিগরির সাবেক মুনশীয়ানা বেশ বোঝা যায়। পশ্চিমের ভগ্ন দোচালা ভোগমণ্ডপটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় কেননা দোচালা ইমারত, বিশেষতঃ পাথরের, বাঁকুড়া জেলায় খুব কমই নির্মিত হয়েছে।

জোড়-মন্দির 'গ্রুপ'-এর উত্তর ও দক্ষিণের একরত্ন মন্দির দু'টি বড়, মধ্যেরটি ছোট। সব ক'টিই দক্ষিণমুখী। উত্তরেরটির উৎসর্গলিপি থেকে দেখা যায় যে ১০৩২ মল্লাব্দে (১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে) মল্লরাজ গোপাল সিংহ সম্ভবতঃ তিনটিই একত্রে নির্মাণ করেন; অন্য দু'টিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক নেই। মন্দিরগুলি সবই এখন পরিত্যক্ত; বিগ্রহ রাধাশ্যাম মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়েছে। উত্তরের মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৮ ফুট ৪ ইঞ্চি (১১'৫ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২ মিটার); মধ্যেরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৩ ফুট (৬'৯ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট (৭'৫ মিটার) আর দক্ষিণেরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৮ ফুট ৯ ইঞ্চি (১১'৭ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২ মিটার)। উত্তরের মন্দিরের গায়ে এখন সামান্য 'টেরাকোটা' অলংকরণ দেখা গেলেও (আগে হয়ত বেশী ছিল), মধ্যের ছোট মন্দিরটিই ল্যাটেরাইট ভাস্কর্যে সর্বাধিক অলংকৃত। অনেক জায়গায় সাবেক পঙ্কের পলস্তারা খসে প'ড়ে নীচের ঝামাপাথর বার হয়ে পড়া সত্ত্বেও রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার বহু দৃশ্য এখনও বেশ স্পষ্ট।

পাথরের একরত্ন দেবালয়গুলির মধ্যে দুর্গের পাথর-দরজার কাছে লালজী ও রাধাশ্যাম মন্দির দু'টিই শ্রেষ্ঠ। প্রথমটি এক প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনমধ্যে স্থাপিত, দক্ষিণমুখী, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৪০ ফুট ৪ ইঞ্চি (১২'১ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০'৫ মিটার)। অলংকরণহীন এ সৌধের পুব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের ত্রি-খিলান দালানের শেষেরটিতে

রঙিন 'ফ্রেসকো'র আভাস দেখা যায়। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকটি নিম্নরূপ: "শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে শকেব্দি | রসাঙ্কযুক্তে নবরত্নমেতৎ | মল্লাধিপ শ্রীরঘুনাথসূনুর্দ | দৌ নৃপ শ্রীযুত বীরসিংহঃ॥ ৯৬৪।" অর্থাৎ, শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণের আনন্দের জন্য মল্লাধিপ শ্রীরঘুনাথ সিংহের পুত্র বীর সিংহ (দ্বিতীয় বীর সিংহ) ৯৬৪ মল্লাব্দে (১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) এই নবরত্ন মন্দির দান করলেন। লক্ষণীয় যে তখন একরত্ন, এমনকি অন্যান্য ভিন্ন শৈলীর মন্দিরকেও, 'গৌরবে' নবরত্ন বলে অভিহিত করবার রেওয়াজ ছিল।

লালজী মন্দিরের সামান্য দক্ষিণে, প্রাচীর-ঘেরা অঙ্গনমধ্যে, ল্যাটেরাইট পাথরের রাধাশ্যাম মন্দিরটি বিষ্ণুপুরের প্রতিষ্ঠালিপিযুক্ত দেবালয়গুলির তালিকায় সর্বকনিষ্ঠ। ১৬৮০ শকাব্দে (১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) মল্লরাজা চৈতন্য সিংহ কর্তৃক নির্মিত এ দেবালয়ের উৎসর্গলিপিতে একটু অভিনবত্ব আছে। অন্য মল্ল-মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাকাল সর্বত্রই মল্লাব্দে উল্লিখিত হয়েছে; শুধু এটির ক্ষেত্রেই কেন যে তার পরিবর্তে শকাব্দের ব্যবহার করা হয়েছে তার কারণ অজ্ঞাত। প্রসঙ্গতঃ, বিষ্ণুপুর রাজবংশ বঙ্গাব্দকে এক শ এক বছর কমিয়ে যে মল্লাব্দের প্রচলন করেছিলেন সে সম্পর্কে আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের ডক্টর ব্লক মন্তব্য করেছেন— "এই তারতম্য ব্যতীত আর সব দিক থেকে বঙ্গাব্দ ও মল্লাব্দের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। অতএব, মনে হয় মল্লাব্দের প্রচলন নিছক আত্মগরিমাপ্রসূত; নিজেদের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করবার জন্যই মল্লরাজারা এই অব্দের সূত্রপাত করেছিলেন।" দক্ষিণমুখী এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৪০ ফুট ১০ ইঞ্চি (১২·৩ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০·৫ মিটার)। পঙ্কের আবরণে ঢাকা পাথরের অলংকরণের জন্যও এ দেবালয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাথরের জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকাশি কাজের এত প্রাচুর্যও বাঁকুড়া জেলার আর কোন মন্দিরে নেই। খোপে নিবদ্ধ দু'সারি মূর্তি-ভাস্কর্য দেওয়ালের দু'পাশে ও কার্নিসের নীচে নিবদ্ধ; অপেক্ষাকৃত ছোট কয়েক সারি অনুরূপ অলংকরণ প্রবেশ-খিলানগুলিরও তিন দিকে দেখা যায়। সামনের ত্রি-খিলান দালানের ভেতরের দেওয়ালও অলংকৃত; গর্ভগৃহের দরজার বাঁ পাশে রাজসভায় রামসীতা, ডাইনে দেবগণ পরিবৃত অনন্তশয্যায় শয়ান বিষ্ণু ও দরজার ওপরে, দু'দিকে, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। এ মন্দিরের পুব ও পশ্চিম দিকেও ত্রি-খিলান খোলা দালান ও উত্তরে এক ঢাকা বারান্দা আছে; স্থাপত্যগত এ ব্যবস্থাটিও কম লক্ষণীয় নয়। আর এক

অভিনবত্ব আছে এ দেবালয়ের ; বিষ্ণুপুরের প্রায় যাবতীয় মল্ল-মন্দিরের বিগ্রহ এখন এখানেই রক্ষিত এবং ব্যয়সংক্ষেপের জন্য একত্রই তাদের সেবাপূজা হয়ে থাকে।

ভট্টাচার্যপাড়ায় ল্যাটেরাইট পাথরের, দক্ষিণমুখী, পরিত্যক্ত, মুরলী-মোহন মন্দিরটি নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, তিন-খিলানযুক্ত দালান সংস্থাপনের রীতিটি এখানে বর্জিত ; তার পরিবর্তে থামের ওপর রক্ষিত একটানা বারান্দা গর্ভগৃহের চারদিক ঘুরে এসেছে। তার ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর ও বাইরের অংশ প্রতিদিকে চারটি ক'রে থামের ওপর রক্ষিত হওয়ায় এ খোলা বারান্দাটি এত কমজোরী হয়েছিল যে এর অধিকাংশই এখন ভেঙে পড়েছে। গর্ভগৃহের ছাদ লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর স্থাপিত ও পিছনের (উত্তরের) দেওয়ালসংলগ্ন এক চওড়া খিলানের নীচে বিগ্রহের বেদীটি এখন শূন্য। সামনের বারান্দা থেকে ওপরে ওঠবার সিঁড়ির চিহ্ন এখনও দেখা যায়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৩ ফুট (৯.৯ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২ মিটার), এ দেবালয়ের দ্বিতীয় বিশেষত্ব এর নির্মাতা সম্পর্কে। বিষ্ণুপুরের রাশি রাশি মল্ল-মন্দিরের মধ্যে শুধু মুরলীমোহন ও মদনগোপাল মন্দির দু'টির প্রতিষ্ঠাত্রী কোন মল্ল রাজা নয়, দুই রাজমহিষী।• সেকালের ঘোর পর্দাপ্রথার যুগে মল্ল-মহিষীরা যে দেবালয়-প্রতিষ্ঠার মত এক জনহিতকর কাজের সঙ্গে নিজেদের নাম প্রকাশ্যভাবে যুক্ত করতে দ্বিধা করেননি এ এক আশ্চর্য ঘটনা। অতি সুন্দরভাবে খোদাই করা, এ মন্দিরের চার পংক্তির পাথরের উৎসর্গ-লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীদুর্জন সিংহ ভূপজননী মল্লাবনীবল্লভ | শ্রীল শ্রীযুত বীরসিংহ মহিষী শ্রী শ্রীল চূড়ামণিঃ। মল্লাব্দে শশিসপ্তরন্ধ্রবিমিতে শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োঃ | প্রীতৌ সৌধগৃহংস্ববেদয়দিদং পূর্ণেন্দুতোঽপ্যুজ্জলম্। ৯৭১।" অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণরাধিকার প্রীতির জন্য, রাজা শ্রীদুর্জন সিংহের জননী ও মল্লভূমের রাজা শ্রীবীর সিংহের মহিষী শ্রীমতী চূড়ামণি ৯৭১ মল্লাব্দে (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) পূর্ণচন্দ্রের থেকেও উজ্জল এই সৌধগৃহ নিবেদন করলেন।

বিষ্ণুপুরের একরত্ন মন্দিরের প্রায় সবই পাথরের ; ইটের দু'একটি যা আছে তার মধ্যে নগরদেবতা মদনমোহনেরটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। মল্লরাজ দুর্জন সিংহ কর্তৃক ১০০০ মল্লাব্দে (১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত, দক্ষিণমুখী এ দেবালয় দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৪০ ফুট (১২ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০.৫ মিটার)। সাড়ে চার ফুট (১.৪ মিটার) উচ্চতার মাকড়া-পাথরের ভিত্তিবেদীর ওপর স্থাপিত ও পুব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে তিন

খিলানের দালানযুক্ত এ সৌধ 'টেরাকোটা' অলংকরণের প্রাচুর্যে ও উৎকর্ষে পশ্চিমবঙ্গের এজাতীয় শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির সঙ্গে উপমিত হতে পারে। সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির সজ্জার বিন্যাসে লালবাঁধের তীরে কালাচাঁদ প্রভৃতি মন্দিরের রীতি অনুসৃত হয়েছে মনে হয়। খিলানের দু'পাশের দেওয়ালে ও কার্নিসের নীচে চার সারি ক'রে 'টেরা-কোটা' অলংকরণ নিবদ্ধ হয়েছে এবং খোপের মধ্যের প্রতিটি মূর্তিকে ঘিরে আছে অতি সূক্ষ্ম ও অতি সুন্দর ফুলকারি বেষ্টনী। মিঃ স্পুনার বলেছেন নকাশি কাজের জন্য যে পরিমাণ শ্রম এখানে ব্যয়িত হয়েছে তার তুলনা রাঢ়দেশে বিরল। নীচের দিকের 'প্যানেল'গুলিতে পশু-পক্ষী-ভাস্কর্য, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী রূপায়িত হয়েছে আর ওপরের দিকে স্থান পেয়েছে প্রধানতঃ যুদ্ধদৃশ্য। থামের গায়ে আছে কীর্তন ও বাজিয়ের দল ও খিলানশীর্ষে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ও মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী। দালানের ভেতরের দেওয়ালও অলং-করণবর্জিত নয় ; সেখানে বহু উৎকৃষ্ট সজ্জার মধ্যে কয়েকটি ড্রাগনসদৃশ পৌরাণিক জীবের ভাস্কর্য খুবই উচ্চাঙ্গের। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীরাধাব্রজরাজনন্দন পদাম্ভোজেষু তৎপ্রীতয়ে | মল্লাব্দে ফনীরাজশীর্ষগণিতে মাসে শুচৌ নির্ম্মলে | সৌধং সুন্দররত্নমন্দিরমিদং সার্দ্ধংস্বচেতোহলিনা | শ্রীমদ্দুর্জন সিংহ ভূমিপতিনা দত্তং বিশুদ্ধাত্মনা। ১০০০।" অর্থাৎ, রাধাকৃষ্ণের পদকমলে তাঁদের প্রীতির জন্য বিশুদ্ধাত্মা দুর্জন সিংহ ভূমিপতি দ্বারা নিজ চিত্তরূপ অলির সঙ্গে এই সুন্দর রত্ন-মন্দির ১০০০ মল্লাব্দে নির্মল শুচি মাসে (বৈশাখে ?) প্রদত্ত হল। দুর্জন সিংহের প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন কিন্তু দেশান্তরী। তাঁর অধস্তন তৃতীয় পুরুষ, চৈতন্য সিংহ, অর্থাভাবে মদনমোহনের বিগ্রহটি যে কলকাতা-বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে বন্ধক দিতে বাধ্য হন সে কাহিনী অনেকেই জানেন। পরে, মদনমোহনের পৃথক এক বিগ্রহ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু তাও চুরি গেছে কয়েক বছর আগে। এখন আর এক প্রস্থ রাধাকৃষ্ণের মূর্তি এ মন্দিরে উপাসিত হচ্ছে। প্রাঙ্গনের দক্ষিণ প্রান্তের ভোগগৃহটি বিশেষভাবে দর্শনীয়। দৈর্ঘ্যে ৪৬ ফুট (১৩৮ মিটার), প্রস্থে ১৭ ফুট (৫'১ মিটার) ও উচ্চতায় আনুমানিক ২০ ফুট (৬ মিটার), এ ইমারতটির ছাদ অনেকখানি ভেঙে পড়লেও, ফুলকাটা তিন-খিলানযুক্ত ও 'টেরাকোটা'-সজ্জিত এত বড় ইটের (বা পাথরের) দোচালা সৌধ বাঁকুড়া জেলায় আর নেই।

মদনমোহন মন্দিরের সামনে, রাস্তার ওপারে, ইটের বেশ বড় এক

পুবমুখী একরত্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সামনের অংশ একেবারে ভেঙে পড়েছে; চূড়া ও অন্যান্য অংশও খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। চারদিকে ছড়ানো ইট-পাটকেলের স্তূপের মধ্যে মাপজোখ নেওয়া কঠিন হলেও, এ দেবালয়টি মদনমোহন মন্দিরের থেকে খুব ছোট ছিল না বলে মনে হয়। উৎসর্গলিপির অভাবে প্রতিষ্ঠাতার নাম বা প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না, তবে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এটি নাকি রাধাকান্তের মন্দির ছিল, যে বিগ্রহ এখন রাধাশ্যাম মন্দিরে রক্ষিত।

ইটের আর একটি একরত্ন মন্দিরের জীর্ণ অবশেষ কোঁদাকুঁদিপাড়ায় অবস্থিত। চূড়াটিকে প্রায় নষ্ট ক'রে এক বিশাল বটগাছ তার শিকড় মাটি অবধি প্রসারিত করেছে চারদিক ঘিরে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে প্রায় ২৫ ফুট (৭·৫ মিটার) ও আনুমানিক একই উচ্চতার এই পরিত্যক্ত দেবালয়টি চিন্ময়ীর মন্দির বলে পরিচিত। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত (প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে তাই মনে হয়), এ মন্দির হয়ত প্রমাণ করে যে রাধাকৃষ্ণ উপাসনার তৎকালীন প্রাবল্য সত্ত্বেও দু'একটি শাক্ত দেবদেবীর মন্দিরও সে সময়ে বিষ্ণুপুরে স্থাপিত হয়েছিল। মল্ল রাজ-পরিবারের কুলদেবী মৃন্ময়ী আজও বিষ্ণুপুরে উপাসিতা। ধ্যানে ও আকৃতিতে তিনি দুর্গার অনুরূপ। চিন্ময়ীও হয়ত এহেন কোন শাক্ত দেবী ছিলেন। দক্ষিণমুখী এ জীর্ণ দেবালয়ের সামনের দেওয়ালে খোপে নিবদ্ধ দু'সারি মূর্তি-ভাস্কর্য (পদ্ম, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি) এখনও দেখা যায়।

শাঁখারিপাড়ায় কুণ্ডু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একরত্ন রাধাকৃষ্ণ মন্দিরটিতে ইট ও ল্যাটেরাইট উভয়েরই ব্যবহার হয়েছে। দৈর্ঘ্যে ২০ ফুট (৬ মিটার), প্রস্থে ১৫ ফুট ৬ ইঞ্চি (৪·৬ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার), দক্ষিণমুখী এ দেবালয়ে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই; তবে আকারপ্রকারে এটিকে খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত বলে মনে হয়।

কৃষ্ণবাঁধের পুব পাড়ে, পাটপুরে, ল্যাটেরাইট পাথরের আর একটি একরত্ন মন্দির জনহীন প্রান্তরের মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা যায়। উৎসর্গলিপির অভাবে, আকারপ্রকারে প্রতিষ্ঠাকাল নির্ণয় করতে হয় আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, কিন্তু কোন্ দেবতার উপাসনার জন্ম এটি নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায় না। দক্ষিণমুখী এ ইমারতটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৬ ফুট ৩ ইঞ্চি (১০·৯ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০·৫ মিটার)। ফুলকাটা ত্রি-খিলান ঢাকা বারান্দায়, গর্ভগৃহের প্রবেশদরজার দু'পাশে, দু'টি বিষ্ণুমূর্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বিষ্ণুপুরের যাবতীয় একরত্ন মন্দিরের (সংখ্যায় তারাই সর্বাধিক) দীর্ঘ সমীক্ষার শেষে, পঞ্চরত্ন মন্দিরের আলোচনায় আসা যেতে পারে। বিষ্ণুপুরে এ শ্রেণীর দেবালয় এখন মাত্র দু'টি—ইটের শ্যামরায় ও পাথরের মদনগোপাল। 'টেরাকোটা' অলংকরণের অন্তহীন প্রাচুর্য ও সুকুমার লালিত্যে, গোটা বাংলাদেশে আর একটিমাত্র দেবালয় শ্যামরায় মন্দিরের সঙ্গে উপমিত হতে পারে; সেটি পূর্ব-পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলার কান্তনগরে অবস্থিত। অধুনা বিদেশী, সে দেবগৃহটিকে হিসাবে না ধরলে, পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় 'টেরাকোটা' মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরটি যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০'৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৭ ফুট ৪ ইঞ্চি (১১'২ মিটার), দক্ষিণমুখী এ দেবালয়ের পুবের দেওয়ালে নিবদ্ধ চার লাইনের প্রধান উৎসর্গলিপিটি নিম্নরূপ : "শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে শকেঙ্কবে | দাঙ্ক-যুক্তে নবরত্নরত্নং। শ্রীবীর হম্বীর | নরেশ সূম্নুর্দদৌ নৃপ শ্রীরঘুনাথ | সিংহঃ॥ মল্ল সকে ৯৪৯। শ্রীরাজা বীর সিংহ।" অর্থাৎ, রাধাকৃষ্ণের আনন্দের জন্য নরেশ বীর হম্বীরের পুত্র নৃপ রঘুনাথ সিংহ ৯৪৯ মল্লাব্দে (১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) এই রত্নমন্দির দান করলেন। এছাড়া আরও অনেক-গুলি ছোট ছোট লিপির অস্তিত্ব এ দেবালয়ের আর এক অভিনব বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমের বাইরের দেওয়ালে দু'লাইনের পাথরের লিপি—"শ্রীশ্রী স্যামরায় | সরণ শ্রীবিষ্ণুদাস"; পুবের দালানের দেওয়ালে তিন লাইন ও এক লাইনের পোড়ামাটির দু'টি লিপি—"শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী | শ্রীবিষ্ণুদাস সর | কার মুনাসর" ও "শ্রীশিবদাস দস্তিদার"; গর্ভগৃহের দক্ষিণের ও পশ্চিমের দেওয়ালে চার লাইনের ও তিন লাইনের দু'টি পোড়ামাটির লিপি, যথাক্রমে,—"শ্রীগঙ্গাবল্লভ দাস | শ্রীবিষ্ণুদাস সরকার | শ্রীমোহন দাস | শ্রীমথুরা দাস" ও "শ্রীশ্রীশ্যামরায় | শ্রীশ্রী মহারাজা রঘুনাথ সিংহ | শ্রীবির সিংহ যুবরাজ।" এহেন লিপিতে প্রতিষ্ঠাতা নৃপতির নামোল্লেখ প্রথাগত; কিন্তু এ মন্দিরে যুবরাজেরও নামোল্লেখ অভিনব। বাকি নামগুলি শিল্পী ও তদারকী কর্মীদের ব'লে মনে হয়। বিষ্ণুপুরের বর্তমান দেবালয়গুলির মধ্যে, প্রাচীনত্বের দিক থেকে শ্যামরায় মন্দিরের স্থান তৃতীয়। প্রথমটি, রাসমঞ্চ—প্রতিষ্ঠাকাল আনু-মানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ ও দ্বিতীয়টি মল্লেশ্বর শিব-মন্দির—নির্মাণের সময় ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ। এ তিনটির গঠন-প্রকরণে আকাশ-পাতাল তফাত তো আছেই, তাছাড়া আরও বহু প্রকার স্থাপত্যের মন্দির আছে বিষ্ণুপুরে। বস্তুতঃ, আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের মিঃ ব্লক মল্ল-রাজধানীকে 'বাংলা-মন্দির'

নির্মাণরীতির পীঠস্থান বলেছেন এইজন্য যে সে রীতির যাবতীয় শৈলীর এখানে একত্র সমাবেশ হয়েছে। অজস্র অলংকরণ ছাড়া, স্থাপত্যের দিক দিয়েও শ্যামরায় মন্দির বিশিষ্ট। ফুলকাটা তিন-খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা তো চারদিকে নিবদ্ধ আছেই, তদুপরি এক সরু প্রদক্ষিণপথ গর্ভগৃহের চারদিকে ঘুরে এসেছে। এহেন বিস্তারিত ভিত্তি-পরিকল্পনা খুব কম ইটের মন্দিরে দেখা যায়। কেন্দ্রীয় চূড়াটি আটকোণা; সংস্কারের জন্য সেটি এখন সিমেণ্ট-পলস্তারাবৃত হওয়ায় ইমারতের কারুকার্যখচিত অন্যান্য অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। কোণের চূড়াগুলি চারকোণা ও তাদের ছাদ উঁচুনীচু কার্নিসের বিন্যাসে কিছুটা পীঢ়া-শিখরের মত। 'টেরাকোটা' অলংকরণের উৎকর্ষ ও অজস্রতায় এ মন্দিরটি বঙ্গ-সংস্কৃতির এক মহামূল্যবান সম্পদ। শুধুমাত্র ঢালু ছাদ ও চূড়াশীর্ষগুলি ছাড়া বাইরের ও ভেতরের দেওয়ালের কোন অংশ, এমনকি ছাদের নিম্নতলও ভাস্কর্যবিহীন নয়। পশ্চিমবঙ্গের 'টেরাকোটা'-অলংকৃত মন্দিরগুলিতে সাধারণতঃ সামনের দেওয়ালেই পোড়ামাটির সজ্জা নিবদ্ধ হয়েছে; বিরল ক্ষেত্রে সামনের ঢাকা বারান্দার দেওয়ালেও এহেন সজ্জা দেখা যায়, যেমন বিষ্ণুপুরের মদনমোহন অথবা খড়বাংলা মন্দিরে। কিন্তু অসীম শিল্পবোধ ও অমানুষিক পরিশ্রমে শ্যামরায় মন্দিরের যাবতীয় খিলান, 'ভল্ট' ও গম্বুজের তলদেশও যেভাবে অলংকরণে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তার কোন তুলনা নেই। এই অসামান্য শিল্পকৃতিকে বিশদভাবে জনসাধারণের গোচরে আনবার জন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী উদ্যম আজও ব্যয়িত হয়নি। 'ইউনেস্কো'র মত প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি যদি কোন দিন এদিকে পড়ে, তাহলে টীকা-সংবলিত এক বিস্তারিত ও উৎকৃষ্ট 'অ্যালবাম' হয়ত প্রকাশিত হবে, এই আশায় আছি। "রাধিকাকৃষ্ণের আনন্দের জন্য" প্রতিষ্ঠিত এ দেবালয়ে কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণনামগানের দৃশ্যগুলি অগ্রাধিকার পেলেও, সামাজিক, পৌরাণিক, রামায়ণ-মহাভারত থেকে আহৃত, শাক্ত অথবা শৈব উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত, জ্যামিতিক ও ফুলকারি ভাস্কর্যও অজস্র ব্যবহৃত হয়েছে। তারা এতই বিচিত্র ও অগণিত যে এ বইয়ের ক্ষুদ্র পরিসরে তাদের মোটামুটি বর্ণনা দেবার চেষ্টা করাও বাতুলতা। পাঠককে সেজন্য এই অফুরন্ত শিল্পভোজসভায় নিজে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়াই সমীচীন মনে করি।

বিষ্ণুপুরের দ্বিতীয় পঞ্চরত্ন মন্দিরটি গোয়ালপাড়ায় অবস্থিত ও মূল বিগ্রহ মদনগোপাল ব'লে সে নামেই পরিচিত। মুরলীমোহন প্রভৃতি

কয়েকটি পরিত্যক্ত দেবালয়ের বিগ্রহও এখন এখানে উপাসিত হয়। ল্যাটেরাইট বা মাকড়া-পাথরে নির্মিত, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৭ ফুট (১১.১ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪৫ ফুট (১৩.৫ মিটার), দক্ষিণমুখী এ দেবালয় রাজা দ্বিতীয় বীর সিংহের মহিষী শিরোমণি (নামান্তরে চূড়ামণি) ৯৭১ মল্লাব্দে (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠা করেন। চার লাইনের উৎসর্গ-লিপিটি নিম্নরূপ: "রাধাকৃষ্ণপদপ্রান্তে সোমসপ্তাঙ্কগেশকে | রঘুনাথ মহীনাথঃ তনয়স্তোন্নতাশয়া | বীরসিংহ নরেশস্য ভীরবমানসংশয়া | মহিষ্যাতি প্রমোদে নবরত্নং সমর্পিতং।" পুব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ত্রি-খিলান দালানযুক্ত এ ইমারতের ঢাকা বারান্দাগুলির ছাদ 'ভল্ট'-এর ও গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজের ওপর স্থাপিত। কেন্দ্রীয় চূড়াটি আটকোণা ও অন্যগুলি চতুষ্কোণ এবং সব ক'টিরই শিখর উঁচুনীচু কার্নিসের বিন্যাসে পীঢ়াশীর্ষের অনুরূপ। খিলানগুলির উপরের অংশে কিছু পদ্মফুলের ভাস্কর্য ছাড়া অন্য অলংকরণ নেই। খুব মজবুতভাবে নির্মিত এ দেবালয়টি বিষ্ণুপুরের সর্ববৃহৎ মন্দিরগুলির অন্যতম।

নবরত্ন মন্দির বিষ্ণুপুরে এখন মাত্র একটি ; আগে আরও ছিল কিনা জানা যায় না। এই বিশেষ স্থাপত্যরীতিটি বিষ্ণুপুর তথা বাঁকুড়া জেলায় তেমন সমাদৃত হয়নি। বিষ্ণুপুরের বসুপাড়ায় অবস্থিত ও শ্রীধর (শালগ্রাম) মন্দির নামে পরিচিত এ দেবালয়টি স্থানীয় বসু বংশের কোন পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ; এটির নির্মাণের সঙ্গে মল্লরাজ-কুলের কোন সম্পর্ক নেই। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭ ফুট ৩ ইঞ্চি (৫.২ মিটার) ও উচ্চতায় ৩৪ ফুট (১০.২ মিটার), পুবমুখী, এ দেবালয়ে কোন উৎসর্গলিপি না থাকায়, 'টেরাকোটা' শৈলীর নজিরে এটিকে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম দিকের বলে মনে হয়। ত্রি-খিলান দালান পুব, উত্তর ও দক্ষিণে নিবদ্ধ ; পশ্চিমে এক ঢাকা বারান্দা বা 'করিডোর'ও আছে। এসবের ছাদ 'ভল্ট'-এর ও গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজের ওপর স্থাপিত। পোড়ামাটির অলংকরণগুলি শুধু পুবের দেওয়ালে নিবদ্ধ। কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও পৌরাণিক দৃশ্যের রূপায়ণ ছাড়াও বন্দুকধারী ফিরিঙ্গী সৈন্যের কিছু আধুনিক ভাস্কর্যও দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের যাবতীয় প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে এটির বয়স সবচেয়ে কম হতেও পারে।

দোচালা বা এক-বাংলা রীতির কোন দেবালয় এখন বিষ্ণুপুরে নেই ; এজাতীয় ইমারত যে ক'টি আছে তারা হয় ভোগগৃহ (ইতিপূর্বে আলোচিত) নয় নহবৎখানা। শেষোক্ত শ্রেণীর একমাত্র নিদর্শনটি

মদনমোহন মন্দিরের কাছে গোস্বামীপাড়ায় অবস্থিত। সমতল ছাদের এক কুঠরির ওপর নির্মিত, দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট ৬ ইঞ্চি (৫·৬ মিটার), প্রস্থে ১৩ ফুট (৩·৯ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ১২ ফুট (৩·৬ মিটার), পুবমুখী এ 'দ্বিতল' দোচালাটি স্থাপত্যের দিক থেকে খুবই অভিনব। আশ্চর্যের বিষয়, একতলার সমতল ছাদ ধারণের জন্য এখানে কড়ি-বরগার ব্যবহার হয়েছিল যা বিষ্ণুপুরের কোন ইমারতে হয়নি। ওপরের দোচালার ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর স্থাপিত ও তার সামনের (পুবের) দেওয়ালে সামান্য 'টেরাকোটা' অলংকরণ দেখা যায়। যে বিগ্রহের নহবৎখানা হিসাবে এটি নির্মিত হয়েছিল, সংলগ্ন উত্তরে সেই শ্যামচাঁদের আদি মন্দিরটি নষ্ট হওয়ায় তিনি এখন পাশেই এক নতুন মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়েছেন।

বিষ্ণুপুরে জোড়-বাংলা শৈলীর ইটের মন্দির মাত্র দু'টি ; প্রথমটি কেষ্টরায়ের মন্দির নামে পরিচিত ও 'টেরাকোটা' অলংকরণের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবালয় আর দ্বিতীয়টি মহাপ্রভুর মন্দির নামে খ্যাত কিন্তু এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত। দুর্গ এলাকার মধ্যে, শ্যামরায় মন্দিরের অদূরে, কেষ্টরায় মন্দিরটি দক্ষিণমুখী ; দৈর্ঘ্যে ৩৮ ফুট ৬ ইঞ্চি (১১·৬ মিটার); প্রস্থে ৩৮ ফুট ২ ইঞ্চি (১১·৫ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০·৫ মিটার)। বীর হম্বীরের পুত্র রঘুনাথ সিংহ যে ৯৬১ মল্লাব্দে (১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) এটির প্রতিষ্ঠা করেন সেকথা নিম্নলিখিত চার লাইনের পাথরের উৎসর্গলিপিটিতে উল্লিখিত আছে। "শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে সুধাংশু | রসাঙ্কগে সৌধগৃহং শকাব্দি | শ্রীবীর হম্বীর নরেশ সূনু | র্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ। ৯৬১।" জোড়-বাংলা মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী অনুসারে, প্রথম দোচালার নীচে সামনের ত্রি-খিলান দালান ও দ্বিতীয় দোচালাটির নীচে গর্ভগৃহের অবস্থান। ঠাকুর-ঘরের পিছনের দেওয়ালের কাছে বেদীর ওপর পলস্তারা-আবৃত প্রায় ৩ ফুট (·৯ মিটার) উচ্চতার এক ষড়ভুজ কৃষ্ণমূর্তি থাকলেও এ দেবালয় এখন পরিত্যক্ত। সামনের দোচালার এক পাশ থেকে ওপরের চারচালা চূড়ায় পৌঁছবার এক সিঁড়ি উঠে গেছে ; পেছনের দোচালার পুব দেওয়ালে গর্ভগৃহে প্রবেশের এক অতিরিক্ত দরজা আছে ; দু'টি দোচালার ছাদই 'ভল্ট'-এর ওপর স্থাপিত। পোড়ামাটির অলংকরণ বাইরের চারদিকের দেওয়ালের সর্বত্র ও দালানের দেওয়াল ও ছাদের নিম্নতলেও ব্যবহৃত হয়েছে ; শুধু গর্ভগৃহের ভিতরে কোথাও এ অলংকরণ নেই। শ্যামরায়ের মন্দিরটি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর কোন

দেবালয়ে 'টেরাকোটা' সজ্জার এমন বিপুল প্রয়োগ হয়নি। প্রাচুর্যেই নয়, কারিগরির উৎকর্ষেও এ ভাস্কর্যগুলি খুবই উচ্চাঙ্গের। কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান, হিন্দু দেবলোকের অজস্র চিত্র ছাড়াও বন্য প্রাণী, শিকার-দৃশ্য এবং স্থল ও নৌযুদ্ধের এত অগণিত ভাস্কর্য এখানে ব্যবহৃত হয়েছে যে তার তুলনা মেলা ভার। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন রামায়ণের কাহিনী বা বন্য প্রাণীর রূপায়নে, এ দেবালয়ের অলংকরণগুলি শ্যামরায় মন্দিরের থেকেও সুন্দর। সব দিক বিবেচনা ক'রে, পশ্চিম বাংলার যাবতীয় 'টেরাকোটা' সৌধের মধ্যে এ দেবালয়টিকে দ্বিতীয় স্থান দিতে কোন বাধা নেই।

অদূরে অবস্থিত মহাপ্রভুর জোড়-বাংলা মন্দিরটি এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও আকারপ্রকারে সেটি কেষ্টরায় মন্দিরের মতই ছিল। এটির বিশদ মাপজোখ বা অলংকরণের বর্ণনা দেওয়া এখন আর সম্ভব নয়। তবে আনুষঙ্গিক কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এটি ১৭৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল সিংহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

ভাগীরথী-তীরবর্তী অঞ্চলে আটচালা-শৈলীর মন্দির যথেষ্ট নির্মিত হলেও বাঁকুড়া জেলায় এ রীতিটি বিশেষ সমাদৃত হয়নি। বিষ্ণুপুরে এ ধরণের দেবালয় আছে মাত্র দু'টি এবং তাদের গঠন-প্রকরণেও এক বিশেষ আঞ্চলিক রীতির প্রভাব দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলায় ওপরের চারচালাটি নীচের চারচালা থেকে অতি অল্প ব্যবধানে নির্মিত হওয়ায় এ জাতীয় ইমারত কিছুটা খর্ব দেখায়; হাওড়া, হুগলী বা ২৪-পরগণা জেলায় এ ব্যবধান সাধারণতঃ অনেক বেশী। বিষ্ণুপুরের খড়বাংলা-পাড়ায় রাধাবিনোদের পুবমুখী আটচালা মন্দিরটি গঠন ও অলংকরণে বিশেষ গুরুত্বের দাবী করতে পারে যদিও এর সামনের দালানের প্রায় সবখানি ও ওপরের চারচালার কিছু অংশ অনেক দিন আগেই ভেঙে পড়েছে। আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে তাঁদের সংরক্ষণ নোটিশে কেন যে এটিকে একরত্ন মন্দির বলে বর্ণনা করেছেন জানি না। উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০·৫ মিটার), দৈর্ঘ্যে ২০ ফুট ১০ ইঞ্চি (৬·৩ মিটার) ও প্রস্থে ২০ ফুট ৩ ইঞ্চি (৬·১ মিটার), ইটের তৈরি এ দেবালয়ের গর্ভ-গৃহের ছাদ দেওয়ালসংলগ্ন চারটি চওড়া খিলানের শীর্ষে কোণে লহরা-যুক্ত এক গম্বুজের ওপর স্থাপিত। পুবের দালানের ভিতরের দেওয়ালের গায়ে, প্রবেশদ্বারের দু'পাশে, রথারূঢ় ধনুর্বাণধারী যোদ্ধার যে আটটি বেশ বড় 'টেরাকোটা প্যানেল' দেখা যায় তাদের সঙ্গে জোড়-বাংলা (কেষ্টরায়) মন্দিরের অনুরূপ 'প্যানেল'-এর বেশ সাদৃশ্য আছে। পুব ও

দক্ষিণের প্রবেশপথ ও উত্তরের এক মেকি দরজার তিন দিক ঘিরে ফুল-লতাপাতার যে অলংকরণগুলি নিবদ্ধ তার তুলনা সারা পশ্চিমবঙ্গে বিরল। উত্তরের দেওয়ালে শিকার-দৃশ্য, লঙ্কাযুদ্ধ, ও কৃষ্ণলীলার দীর্ঘ 'টেরাকোটা' সারিগুলিও খুব সুন্দর। বস্তুতঃ, এ দেবালয়ের পোড়ামাটি-সজ্জার কারিগরি প্রসিদ্ধতর শ্যামরায় বা জোড়-বাংলা মন্দিরের থেকে খুব হীন নয় এবং সহজেই অনুমান করা যায় যে মন্দিরটির অধুনা-ভগ্ন সম্মুখভাগ একদা এহেন সজ্জায় বহুল-অলংকৃত ছিল। বিগ্রহ—কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ ও অষ্টধাতুর রাধিকা। তাঁদের উপাসনার জন্যই যে এ দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেকথা ভাঙা দালানের উত্তর দিকের দেওয়ালে নিবদ্ধ পাথরের চার লাইনের নিম্নরূপ প্রতিষ্ঠালিপিটি থেকেই প্রকাশ : "শিবানন মহাসেন বদনাঙ্কমিতে শকে। | শ্রীল শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-পদাঙ্ক জয়োর্ম্মদে॥ | বীর হম্বীরপুত্রস্য রঘুনাথ মহীপতেঃ। | মাণিক্যবর্ষি সংগ্রহিদমহিষী সৌধ মন্দির॥ ৯৬৫।" অতএব, ৯৬৫ মল্লাব্দে (১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) রাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহ এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ইটের তৈরি দ্বিতীয় আটচালা মন্দিরটি মদনমোহন মন্দিরের সামান্য উত্তরে গোস্বামীপাড়ায় অবস্থিত। বীর হম্বীরের গুরু শ্রীনিবাস গোস্বামীর ইষ্টদেবতা রাধারমণের বিগ্রহ একদা এখানে স্থাপিত ছিল বলে দেবালয়টি সেই নামেই পরিচিত। এখন সেমূর্তি বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গোস্বামী পরিবারে পালাক্রমে উপাসিত হন। জনশ্রুতি, শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা নাকি এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। প্রতিষ্ঠা-লিপিতে উৎকীর্ণ ১৬০৯ শকাব্দ (১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) তারিখটি থেকে কিন্তু সেকথা সমর্থিত হয় না, কেননা বীর হম্বীরের (মৃত্যু ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ) সমসাময়িক শ্রীনিবাসের কোন সন্তানের ততদিন অবধি জীবিত থাকবার কথা নয়। পুবমুখী, পরিত্যক্ত এ দেবালয়ের সামনের দিকে ত্রি-খিলান দালান ছাড়াও উত্তর দিকে এক-দরজাযুক্ত আর একটি দালান আছে। এ দু'টির ও গর্ভগৃহের ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর ন্যস্ত। উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২১ ফুট ৯ ইঞ্চি (৬·৫ মিটার), এ মন্দিরে ইতস্তত-নিবদ্ধ কিছু পদ্মের অনুকৃতি ছাড়া অন্য 'টেরাকোটা' অলংকরণ নেই। কিন্তু সমতল ইটগুলির আশ্চর্য মসৃণতা লক্ষণীয়। সংলগ্ন উত্তরে এক প্রাচীন বটের শিকড়জালের মধ্যে কিছু পুরাতন ইট দেখা যায়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস সেখানে শ্রীনিবাস গোস্বামীর সমাধি ছিল।

বিষ্ণুপুরে সমতল ছাদের উল্লেখযোগ্য দালান-মন্দির মাত্র দু'টি। প্রথমটি 'কুমারী টকি' নামক সিনেমা-গৃহের অদূরে রঘুনাথবাড়ি নামে

পরিচিত ল্যাটেরাইট পাথরের বড় দোতলা দালান। দ্বিতীয়টি বর্তমান রাজবাড়ির সংলগ্ন ইটের তৈরী একতলা দালান—বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের গৃহদেবী মৃন্ময়ীর মন্দির। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন ও স্থাপত্যের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর, এ দু'টি দেবালয়ে কোন অলংকরণ ব্যবহৃত হয়নি।

মল্ল রাজধানীতে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম পুরাকীর্তি আশা করা যায় না; সামান্য যে কয়েকটি আছে তাদের মধ্যে কোরবানতলায় (সাধারণের ভাষায় 'কুড়মুনতলা') কোরবান সাহেবের 'মাজার' বা সমাধি প্রধান। তাঁর কবরের ওপর পুবমুখী আচ্ছাদন-কক্ষটি মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের আমলে নির্মিত এবং উচ্চতায় আনুমানিক ১৫ ফুট (৪·৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে, যথাক্রমে, ২৭ ফুট ৬ ইঞ্চি (৮·৩ মিটার) ও ১৭ ফুট (৫·১ মিটার)। বাইরের তিন দিক ঘিরে সমতল ছাদের বারান্দাটি অনেক পরে সংযোজিত হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে জীর্ণ সমাধিগৃহটি সংস্কারের জন্য স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত সমিতি যে আবেদনপত্র প্রচার করেন তাতে এ পুরাকীর্তিটি সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা ছিল: "মল্লভূমরাজ বীর হম্বীরের রাজত্বকালে হজরত কোরবান শাহ নামক একজন সিদ্ধ পীর যুক্তপ্রদেশ হইতে কয়েকজন শিষ্যসহ বিষ্ণুপুরে আগমন করেন ও বর্তমান কোরবানতলায় বাস করেন। এই সিদ্ধ ফকির ও তাঁহার শিষ্যগণের আচারব্যবহার ও ভাষা পৃথক্ থাকায় স্থানীয় জনসাধারণ প্রথম প্রথম তাঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকেন। পরে তাঁহার অলৌকিক শক্তি ও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রতি অমায়িক ব্যবহার সন্দর্শনে সকলেই এই সিদ্ধ ফকিরের প্রতি আকৃষ্ট হন। কথিত আছে হজরত কোরবান সাহেব বাবা বাঘের পিঠে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। বহু অসাধ্য রোগ তাঁহার কৃপায় সারিত। তাঁহার কৃপায় বহু লোকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত। ক্রমে রাজা বীর হম্বীর তাঁহার আধ্যাত্মিক অলৌকিক শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হন এবং বিষ্ণুপুরে তাঁহার স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। শোনা যায়, রাজা বীর হম্বীর কোরবান সাহেব বাবার কৃপায় পুত্র সন্তান লাভ করেন।…তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার বাসস্থানেই তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয় ও সেই সমাধির উপর মল্লভূমরাজ শ্রীচৈতন্য সিংহ একটি স্মৃতিকক্ষ নির্মাণ করিয়া দেন ও নিয়মিত সেবাপূজার ও দেশ-বিদেশ হইতে আগত হিন্দু-মুসলমান ভক্ত নরনারীর আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থার জন্য তিনি ও অন্যান্য রাজা জমিদারগণ ৩১৪ বিঘা জমি পীরোত্তর দান করেন। এই মুসলমান সিদ্ধ পীরের প্রতি হিন্দু নরনারীর

এরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা জন্মে যে ৩০০ বৎসরেরও বেশী গত হইয়াছে এখন পর্যন্ত স্থানীয় প্রাচীন বাসিন্দাদের বংশধর নরনারী সামান্য আপদ বিপদেও কোরবান সাহেব বাবার নামে মানত করে। প্রত্যহ বহু ভক্ত নরনারী আসিয়া পূজা দেয়। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভক্ত নরনারীর সংখ্যা বেশী হয় ও ঐদিন বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হয়।"

এ সমাধিগৃহের 'খাদেম'-এর (সেবাইত) কাছে কিছু মূল্যবান প্রাচীন দলিলপত্র রক্ষিত আছে। তার মধ্যে জমির খাজনা রেহাই দিয়ে বাদশা শাহ্ আলমের দেওয়া এক মূল ছাড়পত্রের তারিখ ১১২৮ বঙ্গাব্দ (১৭২১ খ্রীষ্টাব্দ) বলে দেখা যায়। অর্থাৎ, আজ থেকে প্রায় আড়াই শ বছর আগেও এ সমাধিগৃহের প্রতি যে রাজকীয় করুণা বর্ষিত হয়েছে তার প্রমাণ মেলে। আর একটি উল্লেখ্য দলিল, ১০৫৯ মল্লাব্দে (১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) রাজা চৈতন্য সিংহের দেওয়া অনুরূপ এক ছাড়পত্র। আমার লিখিত বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট্ গেজেটিয়ারে (প্রকাশকাল— সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮), তৎকালীন প্রমাণাভাবে আমি চৈতন্য সিংহের শাসনকাল ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ বা তার পূর্বে কোন অনির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হয়েছিল বলে নির্ণয় করেছিলাম। যেহেতু ১০৫৯ মল্লাব্দ ১১৬০ বঙ্গাব্দ অথবা ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সমার্থক, সেজন্য এই নৃপতি যে অন্ততঃ ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মল্ল সিংহাসনে আসীন ছিলেন সেকথা উল্লিখিত দলিলের নজিরে প্রমাণিত হয়।

বিষ্ণুপুরের অন্যান্য মোসলেম পুরাকীর্তির মধ্যে বালিধাবড়া পাড়ায় পীর ঘোড়া আলি সাহেবের 'মাজার' ও পোকাবাঁধের সামান্য পুবে সত্যপীরের সমাধি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি ছাদবিহীন এক অপ্রাচীন ইমারত যার চার পাশে, ফাল্গুন মাসে, পীর সাহেবের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ছোট এক মেলা বসে আর দ্বিতীয়টি অনুচ্চ প্রাচীরঘেরা এক অনাবৃত সমাধি যেখানে প্রতি বৃহস্পতিবারের বিশেষ পূজা ছাড়া মহরমের সময় বাৎসরিক পরব অনুষ্ঠিত হয়।

বিহারীনাথ : শালতোড়া থানার উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত বিহারীনাথ পাহাড়ের (উচ্চতা ১,৪৬৯ ফুট বা ৪৪৮ মিটার) উত্তর সানুতে সমতল ছাদের বিহারীনাথ শিবমন্দিরটি আধুনিক কালে নির্মিত হলেও তার প্রাঙ্গণে রক্ষিত জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের এক ক্ষয়িত প্রস্তরমূর্তি ও দ্বাদশভুজ, নাগছত্রধারী আর একটি বেশ বড় পাথরের লোকেশ্বর-বিষ্ণুমূর্তি নিঃসন্দেহে মূল্যবান পুরাবস্তু। শালতোড়ার ৪ মাইল (৬'৪ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমের বড় গ্রাম তিলুড়ি (বাসে

যাওয়া যায়) থেকে কাঁচা রাস্তায় ২ মাইল (৩·২ কিলোমিটার) পুবে বিহারীনাথ শিবমন্দির। প্রাচীন পার্শ্বনাথ মূর্তিটি ও পরবর্তী কালের লোকেশ্বর-বিষ্ণু মূর্তিটির যুগপৎ অবস্থিতি থেকে বোঝা যায়, এখানকার আদি জৈন ধর্মকেন্দ্রটি পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের প্রভাবে বিবর্তিত হয়ে প্রথমে বিষ্ণু ও অধুনা শৈব উপাসনার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সাবেক জৈন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতারা যে অব্যবহিত পশ্চিমে মানভূম-সিংভূম-হাজারিবাগ অঞ্চলে সে ধর্মের উৎপত্তিস্থান থেকে দামোদর-বাহিত হয়ে এখানে এসেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। পূর্ববাহিনী দামোদরের ধারা এখন বিহারীনাথ পাহাড় থেকে প্রায় দু'মাইল উত্তরে হলেও দূর অতীতে হয়ত আরও অনেক কাছে ছিল।

বীরসিংহ : পাত্রসায়ের থেকে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৬ মাইল (৯·৭ কিলোমিটার) পশ্চিমে অবস্থিত বীরসিংহ (জে. এল. নং ১০৫) এ থানার বেশ বড় গ্রাম। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি, ৯৪৪ মল্লাব্দে (১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহের নির্মিত মাকড়া-পাথরের বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির। অধুনা পরিত্যক্ত, দক্ষিণমুখী, এ দেবগৃহের সামনের দেওয়াল ও ওপরের চূড়াগুলি ভেঙে পড়লেও অবশিষ্ট অংশ থেকে অনুমান করা যায় যে আদিতে এটি বিষ্ণুপুর শৈলীর এক পঞ্চরত্ন মন্দির ছিল। ইমারতটিতে এখন কোন অলংকরণ নেই কিন্তু মন্দির প্রাকারের বাইরে রাধাকৃষ্ণ, বরাহ-অবতার প্রভৃতির কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি মাটিতে শায়িত দেখা যায়। দেবালয় প্রাঙ্গণ ঘিরে মাকড়া-পাথরের যে জীর্ণ প্রাচীর তার প্রতি কোণে একটি ক'রে চূড়া ও উঁচু প্রবেশপথের ওপরে এক নহবতখানা এখনও টিকে আছে কোন গতিকে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ অংশে পাথরের সাবেক ভোগমণ্ডপটি এখন নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এক প্রতিবেশীর বাড়িতে এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির যে ভগ্ন অংশটুকু রক্ষিত আছে তা থেকে নির্মাণকাল ও প্রতিষ্ঠাতার খবর জানা যায় ; বাকি অংশটি হয়ত চাপা পড়ে আছে ধ্বংসাবশেষের নীচে।

ইটের তৈরি লিপিযুক্ত দু'টি মন্দিরও আছে এ গ্রামে। প্রথমটি রাধাদামোদরের (শালগ্রাম), চুনবালির অলংকরণযুক্ত, পুবমুখী, ছোট আটচালা। উৎসর্গলিপি অনুসারে, জনৈক সেবারাম পাল ১২৬৭ বঙ্গাব্দে (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে) এটির প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয়টি রাধাদামোদরজীউর (শালগ্রাম), ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত, 'টেরাকোটা'-সজ্জিত, দক্ষিণমুখী, নবরত্ন মন্দির। সামনের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট' ও গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজের ওপর স্থাপিত। খিলানশীর্ষ ও এক সারি খোপ-প্যানেলে

নিবদ্ধ আধুনিক ও নিরেস মূর্তি-ভাস্কর্যগুলির বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, রামসীতা প্রভৃতি। ছ'লাইনের লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীরাধাদা | মোদরচন্দ্রজী | উ শ্রীমন্দির | সকাব্দা ১৭ | ৭৭ সন ১২৬২ | সাল আরব্ধ।"

বেলিয়াতোড় : বাঁকুড়া-দুর্গাপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বাঁকুড়া থেকে ১৩ মাইল (২১ কিলোমিটার) উত্তর-পুবে বড়জোড়া থানার অন্তর্গত সমৃদ্ধ গ্রাম বেলিয়াতোড় (জে. এল. নং ১৩০)। এখানকার ধর্মরাজের সমতল ছাদের দালান-মন্দিরটি স্থাপত্যের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর হলেও, বিগ্রহ কিন্তু খুব বিখ্যাত। সিঁদুরের পুরু প্রলেপে আবৃত, ধাতব দু'টি চোখ বসানো, বিশেষ কোনো আকারহীন এক পবিত্র প্রস্তরখণ্ড ধর্মরাজজ্ঞানে উপাসিত। তাঁর বার্ষিক গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ়-পূর্ণিমায়, যা প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম। তখন নাটমণ্ডপে সংবৎসররক্ষিত প্রমাণ সাইজের দুই কাঠের ঘোড়ার শকটে চেপে, অগণিত ভক্তের উপস্থিতিতে, তিনি আনুষ্ঠানিক ভ্রমণে বার হন। কিংবদন্তী, বহুকাল আগে, স্থানীয় এক দোকানদার দামোদর থেকে তোলা এক পাথরের টুকরোকে ওজন হিসাবে ব্যবহার করতে থাকলে, স্বপ্নাদেশে তার স্বরূপ জানতে পেরে সেটিকে ধর্মরাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে। গ্রামে ছোটখাট আর দু'একটি মন্দির আছে ; সেগুলি তেমন উল্লেযোগ্য নয়।

বৈতল : বিষ্ণুপুর-মেদিনীপুর পিচের সড়কে, বিষ্ণুপুর থেকে ৮ মাইল (১৩ কিলোমিটার) দক্ষিণে বাঁকাদহ ('বাঁকাদহ' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সেখান থেকে, অদূরের ছোট নদী চাঁপাই পার হয়ে, ১২ মাইল (১৯·৩ কিলোমিটার) দীর্ঘ, পুবমুখী, মোরামের রাস্তা এসে পৌঁছেচে জয়পুর থানার অন্তর্গত বৈতল গ্রামে। বিষ্ণুপুর থেকে শীতগ্রীষ্মে দু'একটি বাস অনিয়মিতভাবে এপথে চললেও বর্ষায় ভরা চাঁপাই-এর বাধার জন্য বন্ধ থাকে। বাঁকুড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার সঙ্গমস্থলের মাত্র মাইল তিনেক উত্তরে, প্রায় পাঁচ হাজার বাসিন্দার এ গ্রাম লোকমুখে বৈতল নামে পরিচিত হলেও ম্যাপে কিন্তু চিহ্নিত আছে উত্তরবাড় (জে. এল. নং ১২৭) ও দক্ষিণবাড় (জে. এল. নং ১৩৪) ব'লে। এখানকার চারটি গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তির মধ্যে দক্ষিণবাড় মৌজার গড়ধার পল্লীতে অবস্থিত শ্যামচাঁদের পাথরের, পুবমুখী, পঞ্চরত্ন মন্দিরটিই প্রধান। মন্দিরের পুব ও উত্তর-পুবে কয়েকটি মাটির ঢিবিকে লোকে পুরাতন গড়ের প্রাচীর বলে অনুমান করে ; পল্লীর সেজন্যই নাম হয়েছে

'গড়ধার'। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৬ ফুট (১০'৮ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২ মিটার), এ দেবালয়ের মত বৃহদায়তন ও বিশদ পরিকল্পনার ল্যাটেরাইট মন্দির বাঁকুড়া জেলায় বেশী নেই। মন্দিরের চারদিকেই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, ত্রি-খিলান দালান ছাড়াও তাদের পেছন দিয়ে আর একটি সরু প্রদক্ষিণপথ গর্ভগৃহ ঘুরে এসেছে। বাইরের প্রতিটি ঢাকা বারান্দা থেকে সে প্রদক্ষিণপথে প্রবেশ করা যায়। দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের বাঁ পাশ দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের খাঁজকাটা-চালের, আটকোণা, কেন্দ্রীয় চূড়াটিতে যেটি কোণের খাঁজকাটা-শিখর, চৌকো, পঞ্চরথ, চূড়াগুলি থেকে অনেক বড় ও যার ভেতরের দেওয়াল আটকোণা ও ছাদ ধাপযুক্ত আটটি চালার সমবায়ে গঠিত। চারদিকে খোলা অলিন্দযুক্ত কেন্দ্রীয় চূড়াটির মেঝেতে এক বেদীর ওপর উৎসবের সময় ঠাকুরকে এনে রাখা হয়। একতলার দালানগুলি ও সরু প্রদক্ষিণ পথের ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর ন্যস্ত ও আটকোণা গর্ভগৃহের ছাদ কেন্দ্রীয় চূড়ার পদ্ধতিতে নির্মিত। ঠাকুরঘরের পশ্চিম দেওয়ালে যে বড় কুলুঙ্গি তাতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপিত। পুবের খিলানগুলি ঘিরে ও সেদিককার গর্ভগৃহে প্রবেশ-দরজার তিন দিকে পুরাতন শৈলীর পাথরের কিছু জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশা ছাড়া অন্যত্র বিশেষ অলংকরণ নেই। পুবের দেওয়ালে নিবদ্ধ চার-লাইনের প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীল শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ পদপঙ্কজ সান্নিধ্যে | রসতুর্গ্রহগেশাকে বীর হম্বীর জখনস্বা (?) | রঘুনাথ নরেশস্য সুবর্ণমণি সংগ্রহয়া | মাহস্যাগ্রমদেম্বেদ (?) নবরত্ন সমর্পিত। ৯৬৬।" অতএব, বীর হম্বীরের পুত্র প্রথম রঘুনাথ সিংহ ৯৬৬ মল্লাব্দে (১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে) রাধাকৃষ্ণ উপাসনার জন্য এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপ (কিন্তু বৃহত্তর) আর একটি দেবালয় তিনিই নির্মাণ করেছিলেন গোকুলনগরে ('গোকুলনগর' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

দক্ষিণবাড় মৌজার পণ্ডিতপাড়ায় অবস্থিত মাকড়া-পাথরের ধর্মরাজ মন্দিরটি স্থাপত্যের দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বিগ্রহ 'বাঁকুড়া রায়' বহুদিনের প্রখ্যাত লৌকিক দেবতা। মানিকরাম তাঁর প্রসিদ্ধ ধর্মমঙ্গল কাব্যে তাঁর দীর্ঘ প্রশস্তি রচনা করেছেন। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫ ফুট ৬ ইঞ্চি (৪'৭ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট (৭'৫ মিটার), দক্ষিণমুখী এ আটচালা মন্দিরের খিলানশীর্ষগুলিতে উগ্র রঙের কিছু আধুনিক ফুলকারি 'ফ্রেসকো' ছাড়া অন্য অলংকরণ নেই। মল্লরাজকুলের কারও প্রতিষ্ঠিত ব'লে যে জনশ্রুতি, উৎসর্গলিপির অভাবে তা সমর্থিত

হয় না। মন্দিরটিকে আকারপ্রকারে আনুমানিক আড়াই শ বছরের প্রাচীন বলা যেতে পারে। ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট' ও গর্ভগৃহের ছাদ ধাপযুক্ত চারচালার ওপর রক্ষিত। চূড়ায় কুণ্ডলাকার আমলকটি আটচালা মন্দিরের ক্ষেত্রে অভিনব। একেবারে স্বাভাবিক আকৃতির পাথরের বেশ বড় দু'টি কূর্মমূর্তি 'বাঁকুড়া রায়' নামে উপাসিত। ছোট কয়েকটি প্রথাগত কূর্মমূর্তি ও অন্যান্য বিগ্রহের মধ্যে প্রায় দেড় ফুট (আধ মিটার) উচ্চতার সপ্তনাগছত্রধারিনী পাথরের এক চতুর্ভুজা মনসামূর্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ওপরের ডান হাতে পুঁথির পাটা, নীচের ডান হাতে শঙ্খ, ওপরের বাঁ হাতে ফণাধারী দীর্ঘ সাপ ও নীচের বাঁ হাতে কমণ্ডলু। এই কৌতূহলোদ্দীপক মূর্তিটি কোথা থেকে কিভাবে প্রাপ্ত তা জানা যায় না। পুরোহিতেরা বংশানুক্রমিকভাবে 'তেঁতুলে বাগদী' সম্প্রদায়ের ; পোষাকী উপাধি 'পণ্ডিত'। তাঁদের কাছ থেকেই শুনেছি, একদা বহু দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকারী এ ধর্মরাজের এখন নাকি ১০।১২ বছর অন্তর একবার ক'রে গাজন হয়।

'ঝগড়াইচণ্ডী' নামে আর এক বিখ্যাত লৌকিক দেবী আছেন এ গ্রামে। উত্তরবাড় মৌজার হাটতলায় তাঁর মাকড়া-পাথরের সপ্তরথ দেউলটি, প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে, প্রথম রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক ৯৬৫ মল্লাব্দে (১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত। কিংবদন্তী, চেতোয়া-বরদার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার সময় তিনি নাকি এ অঞ্চলের গভীর অরণ্যে ক্ষণিকের জন্য এক পরমাসুন্দরী নারীর সাক্ষাৎ পান। এ ঘটনাকে দৈবী কৃপা মনে ক'রে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে জয়লাভ করলে দেবীর মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেবেন। যুদ্ধ (ঝগড়া) থেকে দেবীর প্রতিষ্ঠা ব'লে লোকমুখে তিনি ঝগড়াইচণ্ডী নামে পরিচিতা। পাথরের বিগ্রহের মুখটুকু ছাড়া আপাদমস্তক সর্বদা বস্ত্রাবৃত থাকে ব'লে তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১ ফুট ৩ ইঞ্চি (৩.৪ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট (৭.৫ মিটার), পলস্তারা-আবৃত, অলংকরণহীন, মন্দিরটির প্রবেশ-দরজার দু'পাশে কার্তিক ও গণেশের দুই মূর্তি কুলুঙ্গির মধ্যে স্থাপিত। উত্তরমুখী, একদুয়ারী, এ দেবালয়ের ছাদ ধাপযুক্ত চার চালের ওপর রক্ষিত।

এ মন্দিরের সামান্য উত্তরে, লাহা (তাম্বুলি) পরিবারের অলংকরণহীন, দক্ষিণমুখী, পঞ্চরত্ন, রাধাদামোদরের পরিত্যক্ত মন্দিরটিও মাকড়া-পাথরে তৈরি। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫ ফুট ৯ ইঞ্চি (৪.৭ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট (৭.৫ মিটার), এ দেবালয়ের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট' ও গর্ভগৃহের ছাদ চারটি পাশ-খিলানশীর্ষে গম্বুজের ওপরে রক্ষিত। পুব

দিকে এক অতিরিক্ত দরজা ও উত্তরের দেওয়াল বরাবর ওপরে যাবার সিঁড়ি আছে। ভাল খোদাই কাজে প্রধান প্রবেশপথের কাঠের কপাট দু'টি অলংকৃত। প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, এটির নির্মাণে ১৬৯১ থেকে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি পাঁচ বছর সময় লেগেছিল। এখন ভগ্নপ্রায় এ দেবালয়ের সামনের দেওয়ালে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে।

ভগলপুর : কোতুলপুর থেকে দুর্গম কাঁচা রাস্তায় খুনডাঙ্গার ঘাট ও ন'নগর পার হয়ে, প্রায় ৭ মাইল (১১·৩ কিলোমিটার) উত্তর-পুবে, দ্বারকেশ্বরের দক্ষিণ তীরে, কোতুলপুর থানার অন্তর্গত ভগলপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৭২)। স্থানীয় রায় (মুখোপাধ্যায়) পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ও অল্পাধিক ভগ্ন, অন্ততঃ দশটি ইটের মন্দির (অধিকাংশই আটচালা গড়নের) ছাড়াও গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে এক গাছতলায়, ১৯½×১০ ইঞ্চি (৫০×২৫½ সেন্টিমিটার) উচ্চতা ও প্রস্থের, সিংহ-লাঞ্ছনযুক্ত, পাথরের এক দিগম্বর মহাবীর-মূর্তি এখন শীতলা-ষষ্ঠী বলে উপাসিত। সদ্য-আবিষ্কৃত এ মূর্তিটি থেকে অনুমান হয়, দ্বারকেশ্বরতীরের এ গ্রামে বা কাছেপিঠে একদা এক জৈন কেন্দ্র ছিল। মূর্তিটির অদূরে, বেশ বড় এক আটকোণা রাসমঞ্চের ৪ ফুট উচ্চতা অবধি ইটের ভিত্তিবেদী দেখা যায়। কাছেই, পুবমুখী এক দালান-মন্দিরে কূর্মমূর্তি ধর্মরাজ 'বাঁকুড়া রায়' প্রতিষ্ঠিত। 'কাঁসাই-কুলিয়া' শ্রেণীর এক বাগদী পরিবার (প্রচলিত উপাধি 'পণ্ডিত') বংশানুক্রমিকভাবে তাঁর পুরোহিত। রায় পরিবারের মন্দিরগুলির মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি তাঁদের বর্তমান ভদ্রাসনের দক্ষিণে, ১৭১৫ শকাব্দে (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) ৺নবকৃষ্ণ রায়ের নির্মিত কৃষ্ণরায়জীউর দক্ষিণমুখী ইটের এক বড় দালান-মন্দির। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ২৬×২৩ ফুট (৭·৮×৬·৯ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার), এ দেবালয়ের সামনের দেওয়ালে খুব মসৃন ইটে তৈরি দু'সারি অলংকরনহীন খোপ-প্যানেল দর্শনীয় হলেও খিলানগুলির ওপরে নিবদ্ধ তিনটি পোড়ামাটির লিপি-ফলক মন্দিরের বিশেষত্ব। ছ'লাইনের প্রথমটির পাঠ—"এই দালানের | মিস্তরি শ্রী | সাফাৎ রা | ম দে পর-গণে | বায়ড়া সাকি | ম কানপুর।" সাত লাইনের দ্বিতীয়টির পাঠ—"এই দালানের রাজ | মান (?) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ | রায় জিউ সকা | ব্দা ১৭১৫ সতে | র স ও পোনের | তে এই দালান | নির্ম্মাণ হইল।" পাঁচ লাইনের তৃতীয়টির পাঠ—"এই দালানের | মোহোরির | শ্রীত্রৈলক্য | রাম রাঅ | সাং বাগলপুর।" অপর উল্লেখ্য দেবালয়টি 'টেরাকোটা'-অলংকৃত, পুবমুখী এক আটচালা মন্দির যার উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট (৯

মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি (৫·৩ মিটার)। ত্রি-খিলান দালানের ছাদ বাঁকানো 'ভল্ট' ও গর্ভগৃহের ছাদ চারচালা 'ভল্ট'-এর ওপর রক্ষিত। প্রধানতঃ দশাবতার ও পৌরাণিক কাহিনী-আশ্রিত 'টেরাকোটা' সজ্জার কারিগরি উচ্চাঙ্গের না হলেও গর্ভগৃহের প্রবেশ-দরজার দু'পাশে লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রায় দেড় ফুট উচ্চতার বড় দু'টি পোড়ামাটির মূর্তি বেশ সুন্দর। রায় পরিবারের গৃহদেবতা কৃষ্ণরায়জীউ পালাক্রমে এ মন্দিরেও থাকেন।

মদনপুর: 'পাখন্না' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাখন্নার ১½ মাইল (২·৪ কিলোমিটার) পুবে, সোনামুখী-গামী একই পিচ-রাস্তার বাঁ পাশে, সোনামুখী থানার অন্তর্গত ছোট গ্রাম মদনপুর। এখানকার প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন, দক্ষিণমুখী, ইটের, একরত্ন, শ্যামসুন্দরের মন্দিরটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত ও স্থাপত্যশৈলীর নিরিখে, খ্রীষ্টীয় সতের শতকের শেষে বা আঠারো শতকের প্রথমে কোন মল্ল রাজার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব'লে মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২২ ফুট ৭ ইঞ্চি (৬·৮ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার), এ দেবালয়ের দক্ষিণ, পুব, পশ্চিমে ত্রি-খিলান ও উত্তরে এক-খিলানের দালানগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। দক্ষিণের দালানের ভিতর দিয়ে প্রধান প্রবেশপথ—সে দিকের তিনটি ফুলকাটা খিলানই খোলা; কিন্তু উত্তরের খিলানটি ও পুব এবং পশ্চিমের মাঝেরটি ছাড়া পাশের খিলানগুলি সাবেক কাল থেকেই মসৃণ ইটের গাঁথনি দিয়ে বন্ধ। গর্ভগৃহের প্রধান দরজার বাঁ পাশে (পুব দিকে অতিরিক্ত আর একটি ছোট দরজা আছে), দেওয়ালের গাঁথনির মধ্য দিয়ে ওপরে যাবার সরু সিঁড়ি উঠে গেছে। দালানগুলির ছাদ 'ভল্ট'-এর ওপর ও গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত খুব নীচু এক গম্বুজের ওপর স্থাপিত। চূড়াটি খাঁজকাটা ও পঞ্চরথ। এ মন্দিরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্য-প্রকরণ বেশ লক্ষণীয়। মল্ল-যুগের ইটের মন্দির হলেও, খিলানশীর্ষের দু'পাশে একটি ক'রে পোড়ামাটির পদ্ম ছাড়া আর কোথাও কোন অলংকরণ নেই।

এ দেবালয়ের সিকি মাইল উত্তর-পুবে, দামোদরের তীরে চষা খেতের মধ্যে, প্রাচীন ইট-ছড়ানো এক অনুচ্চ ঢিবির ওপর, ২২½ ইঞ্চি (৫৭ সেন্টিমিটার) উচ্চতার ও ১২ ইঞ্চি (৩০ সেন্টিমিটার) প্রস্থের, জৈন তীর্থংকর মহাবীরের সিংহ-লাঞ্ছনযুক্ত এক পাথরের মূর্তিকে গ্রামবাসীরা এখন 'কালভৈরব' ব'লে পূজা করেন। ১০ × ৮ ইঞ্চি মাপের

পুরনো ইটগুলির নজিরে মনে হয়, জৈন আমলে (অর্থাৎ, খ্রীষ্টীয় বারো শতক বা তার আগে) এখানকার এক ইটের মন্দিরে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঁকুড়া জেলার প্রধান নদীগুলির তীরে বহু প্রাচীন জৈন-কেন্দ্রের অবস্থিতি থেকে বোঝা যায়, সে ধর্মের আদি প্রচারকরা এই নদীপথগুলিকে অবলম্বন ক'রেই এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন। সন্থ-আবিষ্কৃত বর্তমান কেন্দ্রটিও সে সিদ্ধান্তের সমর্থন করে।

ময়নাপুর : জয়পুর থেকে মোরামের রাস্তায় ৫ মাইল (৮ কিলো-মিটার) দক্ষিণ-পুবে, জয়পুর থানার সবচেয়ে জনবহুল গ্রাম ময়নাপুর (জে. এল. নং ১২০)। ধর্মপূজার আদি গ্রন্থ 'শূন্যপুরাণ'-এর রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের জন্মস্থান ছাড়াও, ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন, তাঁর বাবা কর্ণসেন ও মা রঞ্জাবতীর উপাখ্যানের সঙ্গে জড়িত হওয়ায় এ গ্রামের খ্যাতি সমধিক। কিংবদন্তী অনুসারে, স্থানীয় হাকন্দ দীঘির তীরে পুত্রকামনায় কঠোর তপশ্চর্যার ফলে রানী রঞ্জাবতীর মৃত্যু হলে স্বয়ং ধর্মরাজ তাঁকে পুনর্জীবিত ক'রে তাঁর অভিলাষপূরণের বর দেন। হাকন্দ দীঘির জল তাই আজও গঙ্গোদকের মত পবিত্র বলে বিবেচিত। এ পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত, হাকন্দ মন্দির নামে পরিচিত, আংশিক ভগ্ন, পাথরের, পশ্চিমমুখী, সপ্তরথ পীঢ়া দেউলটি বাঁকুড়া জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে সঠিক বয়স নির্ণয় করা কঠিন হলেও, স্থাপত্যের বিচারে এটি যে প্রাক্-মুসলমান যুগের তাতে সন্দেহ নেই। খুব বড় বড় ল্যাটেরাইট পাথরের চাঁই দিয়ে নির্মিত এ মন্দিরের জগমোহনটি এখন ভেঙে পড়লেও তার ভিত্তি-সংস্থান থেকে বোঝা যায় যে সেটির ক্ষেত্রফল মূল মন্দিরের থেকে বেশ বেশী ছিল এবং সেটিও সম্ভবত পীঢ়া-শিখরযুক্ত ছিল। মূল মন্দিরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৭ ফুট (৫·১ মিটার) ও উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার)। প্রবেশ-দরজার খিলান ও গর্ভগৃহের চারটি চাল ধাপ-পদ্ধতিতে নির্মিত। ভিত্তিভূমির কাছে দেওয়ালের স্থূলত্ব অসাধারণ—৮ ফুট ৬ ইঞ্চি (২·৬ মিটার)। প্রাচীনত্বের কারণে ও সংরক্ষণের অভাবে শিখরে বেশ বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে এ দেবালয়ে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকলেও আদিতে এটি নাকি ধর্মরাজের মন্দির ছিল, এমনই জনশ্রুতি।

ময়নাপুরের অপর দ্রষ্টব্য, গ্রামের উত্তর-পুব প্রান্তে আধুনিক এক দালান-মন্দিরে রক্ষিত রামাই পণ্ডিতের উপাসিত ও 'যাত্রাসিদ্ধি রায়' নামে পরিচিত ছোট কূর্মমূর্তি ধর্মরাজ ও সামনের প্রাঙ্গণে শায়িত মাকড়া-পাথরের এক চাঙড়ের নীচে তাঁর জনশ্রুত সমাধি। কাছেই এক

গাছতলায় ভগ্ন সূর্যমূর্তিটি বা অন্য কয়েকটি পাথরের বিগ্রহের ভগ্নাংশ কোথা থেকে পাওয়া গেছে সে বিষয়ে গ্রামবাসীরা কিছুই বলতে পারেন না।

মাইথা গোপীনাথপুর: ওঁদা থেকে কাঁচা রাস্তায় ৪ মাইল (৬'৪ কিলোমিটার) উত্তর-পুবে, দ্বারকেশ্বর নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত চাবড়া গ্রামের ঘাটে হেঁটে নদী পার হয়ে (শীতগ্রীষ্মে সম্ভব) উত্তর তীরের গামিষ্যা ও মাজডিহা গ্রামের ভিতর দিয়ে আরও প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গেলে, বাঁকুড়া থানার দক্ষিণ-পুব প্রান্তে মাইথা গোপীনাথপুরে (জে. এল. নং ৩১৫) পৌঁছনো যায়। দুর্গম পথ ; জীপে, গোযানে বা হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। জনশ্রুতি অনুসারে, বীর মল্লের প্রতিষ্ঠিত পাথরের যে প্রাচীন দেউলটি এখানে ছিল এখন তা লুপ্ত। তবে পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত, পুব ও দক্ষিণমুখী, ইটের দু'টি পঞ্চরত্ন মন্দির এখনও আছে যেগুলির বিগ্রহ কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ ও অষ্টধাতুর রাধিকা। (এ নিবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার সম্পাদক শ্রীমানিকলাল সিংহের নিকট সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে লেখা)।

মালিয়াড়া: বড়জোড়া থেকে শালতোড়াগামী পিচের সড়কে (বাস চলে), ৮ মাইল (১৩ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে বড়জোড়া থানার বৃহত্তম গ্রাম মালিয়াড়া (জে. এল. নং ৫)। খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের শেষে কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ দেব আধুর্য এ পল্লীর পত্তন করেন ব'লে জনশ্রুতি। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের উড়িষ্যা অভিযানের সময় তিনি নাকি তাঁর সঙ্গে এসে ফিরে না গিয়ে এখানেই বসতি করেন ও কালক্রমে মুঘল সুবাদারের কাছ থেকে রাজা খেতাব পান। তাঁর বংশধর বাসুদেব আধুর্য খ্রীষ্টীয় সতের শতকের প্রথম দিকে পাথরের যে নবরত্ন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন, অধুনা প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হলেও সেটিই এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। স্থানীয় রাজনারায়ণ হাই স্কুলের প্রাঙ্গণে অবস্থিত এ পরিত্যক্ত মন্দিরটি, গঠনের অভিনবত্ব ছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম নবরত্ন মন্দির হতে পারে। বর্তমান ভগ্নদশার জন্য সঠিক মাপজোখ দেওয়া অসম্ভব হলেও, পুবমুখী এ ইমারতটি আদিতে যে বেশ বড় আকারের ছিল তাতে সন্দেহ নেই। দক্ষিণ দিকের প্রবেশদ্বারের ওপর নিবদ্ধ, অধুনা-ক্ষয়িত, ভাস্কর্যগুলি (কৃষ্ণলীলার হওয়াই সম্ভব) থেকে অনুমান হয়, দেবালয়টি একদা বহুলঅলংকৃত ছিল। অর্ধবৃত্তাকার একাধিক খিলানের ওপর রক্ষিত গর্ভগৃহের চারটি দেওয়াল ঘিরে যে প্রদক্ষিণপথ, ভূমি-নকশার দিক থেকে তা বেশ অভিনব। উত্তর

দেওয়ালের ধার ঘেঁষে ওপরে যাবার সরু সিঁড়িটি এখন অব্যবহার্য কেননা মন্দিরের ঊর্ধ্বাংশ বহুদিন আগেই ধূলিসাৎ হয়েছে। দেবালয়ের গায়ে এখন কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই; ধ্বংসস্তূপ থেকেও কিছু পাওয়া যায়নি। কোন্ বিগ্রহের উপাসনার জন্য এটি নির্মিত হয়েছিল সেকথা সঠিকভাবে জানা না গেলেও অবশিষ্ট ভাস্কর্যগুলির নজিরে মনে হয়, কৃষ্ণপূজার জন্যই হয়ত এটির প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকবে। সতের শতকের প্রথমে, এ মন্দিরের আনুমানিক প্রতিষ্ঠাকালে, মল্ল-রাজসিংহাসনে আসীন ছিলেন বীর হম্বীর ও প্রথম বীর সিংহ। তাঁদের রাজত্বকালে মল্লভূমে যে কৃষ্ণ-উপাসনার প্রবল জোয়ার এসেছিল সেকথা আগেই বলেছি।

মালিয়াড়ার বিভিন্ন পাড়ায় ছোটখাট আরও কয়েকটি মন্দির আছে কিন্তু সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

মুক্তাতোড় : 'সাহারজোড়া' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাহারজোড়া থেকে মোরামের রাস্তায় ১½ মাইল (২·৪ কিলোমিটার) পশ্চিমে, বড়জোড়া থানার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের গ্রাম মুক্তাতোড় (জে. এল. নং ২৮)। এখানকার তিন-চারটি ইটের দেবালয়ের মধ্যে কায়স্থপাড়ায়, সরকারী (কায়স্থ) পরিবারের, দক্ষিণ-মুখী, নাড়ুগোপালের দালান-মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট ১০ ইঞ্চি (৫·৬ মিটার), প্রস্থে ১৭ ফুট (৫·১ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ১৬ ফুট (৪·৮ মিটার), এ মন্দিরের শ্বেতপাথরের প্রতিষ্ঠা-লিপিটির সঠিক পাঠোদ্ধার করা না গেলেও স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা এটি ১২১৩ বঙ্গাব্দে (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত। ত্রি-খিলান দালান ও গর্ভগৃহের ছাদ সমতল। সামনের দেওয়ালের দু'পাশে ও কার্নিসের নীচে পৃথক্ খোপে নিবদ্ধ একসারি সুন্দর 'টেরাকোটা' টালির কিছু-সংখ্যক ক্ষয়িত এবং বাকিগুলিতে দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক ও রামায়ণের কাহিনী রূপায়িত।

মুণিনগর : বিষ্ণুপুর-পাত্রসায়ের পিচের সড়কে (শীতগ্রীষ্মে নিয়মিত বাস চলে) বিষ্ণুপুর থেকে ৮ মাইল (১৩ কিলোমিটার) উত্তর-পুবে, হিঙ্গুরী গ্রামের পাশ দিয়ে বাঁ-হাতি কাঁচা রাস্তায় আরও ২ মাইল (৩·২ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে গেলে, বিষ্ণুপুর থানার গুমূট মৌজার (জে. এল. নং ১৬৬) অন্তর্গত মুণিনগর গ্রাম। মল্লরাজ দ্বিতীয় বীরসিংহ প্রতিষ্ঠিত এখানকার অভিনব দেউলটি ডিহর-এর বিখ্যাত ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর মন্দির থেকে মাত্র মাইল দু'য়েক পুবে অবস্থিত। গর্ভগৃহ

ও জগমোহন দু'টির ওপরই দেউল-শিখর, এহেন নির্মাণরীতির মন্দির বাঁকুড়া জেলায় তো আর নেই-ই, এমন কি গোটা উত্তর-পুব ভারতেও বিরল। স্থাপত্যের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, মাকড়া-পাথরের এই দক্ষিণমুখী, পঞ্চরথ, রেখ-দেউলের মূল মন্দিরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৫ ফুট ৬ ইঞ্চি (৪·৭ মিটার) ও উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট (১০·৫ মিটার) এবং জগমোহনের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১১ ফুট (৩·৩ মিটার) ও উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট (৭·৫ মিটার)। জগমোহনের পুব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে এবং গর্ভগৃহের পুব ও দক্ষিণে প্রবেশপথ আছে। জগমোহন ও গর্ভগৃহ উভয়েরই ছাদ ধাপযুক্ত চারটি চালার ওপর রক্ষিত। সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ ছ'লাইনের প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।| বেদবস্বঙ্কগেশাকে।| শ্রীরাধাকৃষ্ণযোমুদে।| দদৌ দেবকুলং শ্রীল।| বীরসিংহো মহিপতিঃ।| সন ৯৮৪।" বলা বাহুল্য, 'সন' কথাটি উল্লিখিত থাকলেও, প্রতিষ্ঠা-বৎসর মল্লাব্দ অনুসারে, বঙ্গাব্দ অনুসারে নয়। অতএব, ৯৮৪ মল্লাব্দে (১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) দ্বিতীয় বীরসিংহ এটি নির্মাণ করেন। জনশ্রুতি, তিনি সমস্ত গুমুট মৌজাটি দেবোত্তর হিসাবে দান ক'রে মিশ্র (চট্টোপাধ্যায়) পরিবারকে সেবাইত নিযুক্ত করেন। তাঁদের জ্ঞাতিরাই ৪০।৪৫ বছর আগে জীর্ণ মন্দিরটির আমূল সংস্কার করান ও অষ্টধাতুর সাবেক রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবাপূজা অদ্যাবধি চালিয়ে আসছেন।

গ্রামের পুকুর থেকে প্রাপ্ত, উপবিষ্ট-ভঙ্গির পাথরের এক বাসুলি মূর্তি অদূরের আধুনিক দালান-মন্দিরে প্রধানতঃ মড়ক-নিবারক দেবীজ্ঞানে উপাসিতা।

মেট্যালা: বাঁকুড়া-মেজিয়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), অমরকাননের মাইলখানেক উত্তরে, বাঁ-হাতি যে মোরামের রাস্তা গিয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমে, তাতে ৩ মাইল (৪·৮ কিলোমিটার) গেলে, গঙ্গাজলঘাটি থানার কেশিয়াড়া মৌজার (জে. এল. নং ৮১) অন্তর্গত ছোট গ্রাম মেট্যালা। সেখানকার বাবুপাড়ায়, ইটের, অলংকৃত, পুবমুখী, পঞ্চরত্ন, লক্ষ্মীনারায়ণ (শালগ্রাম) মন্দিরটি বাঁকুড়া জেলার এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২২ ফুট (৬·৬ মিটার), এ দেবালয়ের পুবের দেওয়ালে নিবদ্ধ ছ'লাইনের ঈষৎ-ক্ষয়িত প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণাভ্যা নমঃ শুভ | মস্তু শকাব্দা ১৬৪০ শ্রীশ্রী | লক্ষ্মীনারায়ণ পদে সৌধমন্দি | রমর্পয়ৎ শাকে ত্রিলোকচন্দ্রেণ যুতে | বিপর (?) সিংহ··· শ্রীশিবচরণ | শ্রী···।" মল্ল রাজারা তাঁদের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করবার

জন্য উত্তর প্রদেশের মৈনপুরী থেকে যে সব পদাতিক এনেছিলেন, তাঁদেরই এক বংশধর, তিলকচন্দ্র রায়দেব বাহাদুর, ১৬৪০ শকাব্দে (১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে) মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভাস্কর্যের দিক থেকে ততটা না হলেও, স্থাপত্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এ ইমারতের পুব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের ত্রি-খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দার ছাদ 'ভল্ট' ও প্রান্তবর্তী এক জোড়া ছোট গম্বুজের ও গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর স্থাপিত। পশ্চিমের দেওয়াল ঘেঁষে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের আটকোণা কেন্দ্রীয় চূড়াটিতে, যার শিখর, অন্য চতুষ্কোণ চূড়াগুলির মতই, খাঁজকাটা ও পঞ্চরথ। পশ্চিম ছাড়া অন্য তিন দিকের দেওয়ালই অলংকৃত, তবে সে সজ্জার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য পুবের দেওয়ালেই বেশী। পোড়ামাটির টালিগুলিতে ফুললতাপাতা, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, লঙ্কাযুদ্ধ, পৌরাণিক কাহিনী, সামাজিক দৃশ্য প্রভৃতি অগভীরভাবে ক্ষোদিত হয়েছে। অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত অক্ষত টালির নজিরে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাদের উপরিভাগ একদা পঙ্কের প্রলেপে আবৃত ছিল। এহেন মন্দিরে এই বিশেষ অলংকরণ পদ্ধতিটি ও পুবের দেওয়ালে নিবদ্ধ অভিক্ষিপ্ত কয়েকটি সুন্দর মকরমুখ বেশ অভিনবই বলতে হবে যদিও ভাস্কর্য-নৈপুণ্য খুব উচ্চশ্রেণীর নয়। প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের লোকেরা এখনও গ্রামেই বাস করেন ও তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণে সৌধটি মোটামুটি ভাল অবস্থাতেই আছে।

যাদবনগর : বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বিষ্ণুপুর রেল স্টেশনের কাছ থেকে মাইলখানেক উত্তরে এসে, বাঁ-হাতি আইল-পথে প্রায় দু'মাইল (৩·২ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে গেলে, (পথে বিড়াই-এর এক ছোট শাখানদী হেঁটে পার হতে হয়), ওঁদা থানার অন্তর্গত যাদবনগর গ্রাম (জে. এল. নং ২৬১)। লোকালয়ের পশ্চিমে, খোলা মাঠের মধ্যে, মাকড়া-পাথরে তৈরি, দক্ষিণমুখী, পরিত্যক্ত, একরত্ন মন্দিরটি স্থাপত্যের দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০·৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯ ফুট ১০ ইঞ্চি (৬ মিটার), এ দেবালয়ের পুব ও দক্ষিণ দিকের একদুয়ারী ঢাকা বারান্দা দু'টির ছাদ 'ভল্ট'-এর ও গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর রক্ষিত। ইমারতটির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অনেকখানি অংশ ভেঙে পড়ায়, পশ্চিমের দেওয়াল ঘেঁষে ওপরে যাবার সিঁড়িটি এখন বাইরে থেকেই দেখা যায়। একরত্ন মন্দিরের চূড়ার পরিসর সর্বত্র ছাদের বিস্তারের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে থাকে, যেমনটি দেখা যায়

বিষ্ণুপুরের কালাচাঁদ, লালজী, মদনমোহন প্রভৃতি মন্দিরে। এখানে কিন্তু সে ব্যবধান এতই অল্প যে চূড়াটিকে প্রায় দেউল-শিখরের মত দেখায়। এহেন অভিনব স্থাপত্যের দেবসৌধ বাঁকুড়া জেলায় তো আর নেই-ই, অন্যত্রও আছে কিনা সন্দেহ। পুব ও দক্ষিণের প্রবেশপথ দু'টিকে ঘিরে পদ্ম ও অনুরূপ সামান্য সজ্জা ছাড়া অন্য কোন অলংকরণ নেই। স্থানীয় জনশ্রুতি, মল্লরাজকুলের সামন্তশ্রেণীভুক্ত যাদব রায় নামে এক রাজা নাকি এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামেই নাকি গ্রামের নাম। এ উক্তির সমর্থনে, গ্রামপ্রান্তের এক ভাঙা বাড়ি দেখিয়ে বলা হয়, সেটি ছিল যাদব রাজার দরবার। যাদবনগরে এখনও যে বহু গোয়ালার বাস এবং যাদব রাজা যে আসলে এখানকার গোপ-জাতির প্রধান ছিলেন এমনও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু 'পাথুরে প্রমাণ' অন্যরূপ। এ গ্রামেরই এক অধিবাসীর বাড়িতে রক্ষিত আলোচ্য মন্দিরের চার লাইনের আংশিক-ক্ষয়িত প্রতিষ্ঠাফলকটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদেরষা··· | ···সৌধগৃহং শকাব্দে | শ্রীবীর হম্বীর নরেশ সূনুর্দদৌ | নৃপ শ্রীরঘুনাথ সিংহ ৯৫৬।" অতএব, সন্দেহ থাকে না যে প্রথম রঘুনাথ সিংহ কৃষ্ণ উপাসনার জন্য ৯৫৬ মল্লাব্দে (১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে) এ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

রণিয়াড়া : বাঁকুড়া-দুর্গাপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বেলিয়াতোড়ের এক মাইল উত্তরে, শালী নদীর সাঁকো পার হয়েই বাঁ-হাতি এক পিচের রাস্তা গেছে গঙ্গাজলঘাটিতে, প্রায় ১১ মাইল (১৭·৭ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে। সে পথে মাইল তিনেক (৪·৮ কিলোমিটার) গেলে, গঙ্গাজলঘাটি থানার দক্ষিণ-পুবপ্রান্তবর্তী গ্রাম রণিয়াড়া (জে. এল. নং ১৬৪)। ওই একই রাস্তায় গঙ্গাজলঘাটি থেকেও এ গ্রামে আসা যায়, তবে দূরত্বটা বেশী পড়ে—প্রায় ৮ মাইল (১৩ কিলোমিটার)। আদিতে মাকড়া-পাথরে তৈরি কিন্তু এখন বহুলসংস্কৃত, মদনমোহন মন্দিরটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। সমতল ছাদ ও সামনের সবটাই এখন ইটের তৈরি হলেও, নীচের অংশের প্রাচীন ল্যাটেরাইট গাঁথনি আজও অনেকাংশে অক্ষত আছে। তা থেকে অনুমান করা যায় যে সাবেক মন্দিরের গর্ভগৃহের দু'পাশে দু'টি ছোট কক্ষ ও সামনে একটি ঢাকা বারান্দা ছিল। কিন্তু শীর্ষদেশ একরত্ন, আটচালা বা অন্য কোন পদ্ধতিতে গঠিত ছিল কিনা সেকথা এখন সঠিকভাবে বলা শক্ত। দক্ষিণমুখী এ ইমারতের বর্তমান উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার), দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট ৭ ইঞ্চি (৭·৭ মিটার) ও প্রস্থ

২০ ফুট ৯ ইঞ্চি (৬·২ মিটার)। সামনের দালানে রক্ষিত, আংশিক-ভাবে ক্ষয়িত, আদি প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :"…… | শ্রীবীর-সিংহ নৃপতিঃ… | শ্রীরাধিকামদনমোহন তৃপ্তিকামো | দত্ত শিলারচিত মন্দিরম্…॥ ৯৭৬।" অতএব, প্রথম রঘুনাথ সিংহের পুত্র দ্বিতীয় বীরসিংহ ৯৭৬ মল্লাব্দে (১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে) কৃষ্ণ-উপাসনার জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণ ঘিরে মাকড়া-পাথরের রক্ষাপ্রাচীর, তার পুব দিকে তোরণশোভিত প্রবেশপথ ও পশ্চিম অংশে এক ভোগগৃহের জীর্ণ অবশেষ এখনও দেখা যায়।

রাইপুর : বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণতম থানা রাইপুরের সদর ; বাঁকুড়া থেকে তালডাংরা ও সিমলাপাল হয়ে, বরাবর পিচের রাস্তায় (নিয়মিত বাস চলে) প্রায় ৪৫ মাইল (৭২ কিলোমিটার) দক্ষিণে। কাঁসাই নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এ গ্রামে শীতগ্রীষ্মে আসাই প্রশস্ত ; তখন গাড়ি-ঘোড়া, মানুষজন কাঁসাই-এর শীর্ণ স্রোত হামেশাই পার হয়ে থাকে।

জনশ্রুতি, মুঘল আমলে এক চৌহান রাজপুত এ অঞ্চল দখল ক'রে শিখর-রাজা উপাধি নিয়ে রাজত্ব শুরু করেন। সে বংশের শেষ রাজার সেনাপতি মীরণ সাহা মারাঠা আক্রমণে নিহত হলে, রাজপরিবারের সকলে শিখরসায়র নামে এক জলাশয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। শিখরগড় নামে পরিচিত, প্রাচীন দুর্গ, প্রাসাদ ও মন্দিরাদির ধ্বংসস্তূপের দক্ষিণে পুষ্করিণীটি আজও সে করুণ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। এরই পশ্চিম তীরে মীরণ সাহার সমাধি ; লোকে এখনও সেখানে পূজা দেয়, মানত করে। শিখররাজকুলের পুরোহিত বংশ কিছুকাল রাজত্ব করবার পর, মল্ল-পরিবারের ফতে সিংহ এ এলাকা দখল ক'রে নেন। প্রজারঞ্জক এ বংশ সেচের জন্য অনেকগুলি বিশাল জলাশয় খনন করান ; তার মধ্যে যমুনাবাঁধ নামে দীঘিটি এখনও কার্যকর আছে। স্থানীয় শাঁখারিয়া পুকুরের পাড়ে মহামায়ার প্রাচীন মন্দিরটিও তাঁদেরই কীর্তি। কিংবদন্তী, দেবী মহামায়া একদা কিশোরীর রূপ ধারণ ক'রে এই শাঁখারিয়া পুকুরের তীরে এক শাঁখারির কাছ থেকে দু'গাছি শাঁখা প'রে, তাঁর বাবা, স্থানীয় এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে দাম নিতে বলেন। ব্রাহ্মণের কোন মেয়ে ছিল না। শাখারির কাছে এই অলৌকিক কাহিনী শুনে তাঁরা দু'জনেই পুকুরপাড়ে এসে শাখাপরা দু'টি কোমল হাত ক্ষণতরে জলের ওপর উঠে ডুবে যেতে দেখেন। সে রাত্রেই ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হন, তিনি যেন পুকুর-ঘাট থেকে এক শিলাখণ্ড এনে প্রতিষ্ঠা করেন, কেননা সেই শিলাপটে যথাকালে দেবী মহামায়ার মূর্তি আপনিই আবির্ভূত হবে।

সাবেক মন্দিরটি এখন লুপ্ত হয়েছে; অধুনাতন এক ইটের দালান-মন্দিরে দেবীর সিঁদুরলিপ্ত পাথরের মূর্তিটি এ অঞ্চলের খুবই বিখ্যাত দেবতা।

রাউতখণ্ড : বিষ্ণুপুর-কোতুলপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), জয়পুরের মাইলখানেক পুবে কুম্ভস্থল গ্রামের মোড় থেকে মোরামের রাস্তায় ৩ মাইল (৪·৮ কিলোমিটার) উত্তর-পুবে, জয়পুর থানার অন্তর্গত রাউতখণ্ড গ্রাম (জে. এল. নং ১৭)। ১৬ × ৭½ ইঞ্চি (৪১ × ১৯ সেন্টিমিটার) উচ্চতা ও প্রস্থের, সর্পাসীনা ও সপ্তনাগছত্র-ধারিণী, পাথরের এক মনসামূর্তি এখানে জগদ্‌গৌরী নামে উপাসিতা। তাঁর দক্ষিণমুখী, ইটের, আটচালা মন্দির ও সামনের পাকা নাট-মণ্ডপের যত্রতত্র উগ্র রঙের নকশার বহুল প্রয়োগ থেকে বোঝা যায়, অগণিত ভক্তের দাক্ষিণ্যে তাঁর পাণ্ডা-পুরোহিতদের বেশ ভালই আয় হয়ে থাকে। মণ্ডল (একাদশ তিলি) পরিবারের প্রতিষ্ঠিত, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮ ফুট ৪ ইঞ্চি (৫·৫ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০·৫ মিটার), প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ দেবালয়ের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্‌ট' ও গর্ভগৃহের ছাদ পাশ-খিলানশীর্ষে স্থাপিত গম্বুজের ওপর রক্ষিত। পুরাকীর্তি হিসাবে মন্দিরটি এখন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, অজ্ঞাত স্থান থেকে প্রাপ্ত দেবীমূর্তিটির উত্তম ভাস্কর্য লক্ষণীয়। সাপেকাটা রোগী নিরাময়ে তার অমোঘ ক্ষমতা এ অঞ্চলে সুবিদিত। মন্দিরপ্রাঙ্গনের পশ্চিম দিকে, চুনবালির পলস্তারা-আবৃত, পঞ্চরথ-শিখর কালঞ্জয় শিবের ছোট মন্দিরে নিবদ্ধ বেলে পাথরের সাত-লাইনের প্রতিষ্ঠালিপিটি থেকে দেখা যায় যে সেটি ১০৫৮ মল্লাব্দে (১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত হয়েছিল। মূল মন্দিরটিও একই সময়ের হওয়া সম্ভব।

গ্রামের পুব প্রান্তে, নাপিতপাড়ায়, দে (ময়রা) পরিবারের প্রতিষ্ঠিত, ইটের, দক্ষিণমুখী, পঞ্চরত্ন, পরিত্যক্ত মন্দিরটি পুরাকীর্তি হিসাবে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩ ফুট (৩·৯ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার), এ দেবালয়ের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্‌ট' ও গর্ভগৃহের ছাদ পাশ-খিলানশীর্ষে স্থাপিত গম্বুজের ওপর রক্ষিত। সামনের দেওয়ালে সামাজিক, পৌরাণিক ও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক 'টেরাকোটা' সজ্জা বেশ ভাল হলেও গর্ভগৃহে প্রবেশ-দরজার দু'পাশে ও ঠাকুরঘরের পিছনের দেওয়ালে পটুয়া-পদ্ধতিতে আঁকা খুব বড় আকারের গৌর-নিতাই, বৃষবাহন-হরপার্বতী প্রভৃতির 'ফ্রেসকো' এ মন্দিরের অসামান্য বৈশিষ্ট্য। সেগুলির ঔজ্জ্বল্য এখন ম্লান হয়ে

২০ ফুট ৯ ইঞ্চি (৬·২ মিটার)। সামনের দালানে রক্ষিত, আংশিক-ভাবে ক্ষয়িত, আদি প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :“…… | শ্রীবীর-সিংহ নৃপতিঃ··· | শ্রীরাধিকামদনমোহন তৃপ্তিকামো | দত্ত শিলারচিত মন্দিরম্···॥ ৯৭৬ ।” অতএব, প্রথম রঘুনাথ সিংহের পুত্র দ্বিতীয় বীরসিংহ ৯৭৬ মল্লাব্দে (১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে) কৃষ্ণ-উপাসনার জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণ ঘিরে মাকড়া-পাথরের রক্ষাপ্রাচীর, তার পুব দিকে তোরণশোভিত প্রবেশপথ ও পশ্চিম অংশে এক ভোগগৃহের জীর্ণ অবশেষ এখনও দেখা যায়।

রাইপুর : বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণতম থানা রাইপুরের সদর ; বাঁকুড়া থেকে তালডাংরা ও সিমলাপাল হয়ে, বরাবর পিচের রাস্তায় (নিয়মিত বাস চলে) প্রায় ৪৫ মাইল (৭২ কিলোমিটার) দক্ষিণে। কাঁসাই নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এ গ্রামে শীতগ্রীষ্মে আসাই প্রশস্ত ; তখন গাড়ি-ঘোড়া, মানুষজন কাঁসাই-এর শীর্ণ স্রোত হামেশাই পার হয়ে থাকে।

জনশ্রুতি, মুঘল আমলে এক চৌহান রাজপুত এ অঞ্চল দখল ক'রে শিখর-রাজা উপাধি নিয়ে রাজত্ব শুরু করেন। সে বংশের শেষ রাজার সেনাপতি মীরণ সাহা মারাঠা আক্রমণে নিহত হলে, রাজপরিবারের সকলে শিখরসায়র নামে এক জলাশয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। শিখরগড় নামে পরিচিত, প্রাচীন দুর্গ, প্রাসাদ ও মন্দিরাদির ধ্বংসস্তূপের দক্ষিণে পুষ্করিণীটি আজও সে করুণ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। এরই পশ্চিম তীরে মীরণ সাহার সমাধি ; লোকে এখনও সেখানে পূজা দেয়, মানত করে। শিখররাজকুলের পুরোহিত বংশ কিছুকাল রাজত্ব করবার পর, মল্ল-পরিবারের ফতে সিংহ এ এলাকা দখল ক'রে নেন। প্রজারঞ্জক এ বংশ সেচের জন্য অনেকগুলি বিশাল জলাশয় খনন করান ; তার মধ্যে যমুনাবাঁধ নামে দীঘিটি এখনও কার্যকর আছে। স্থানীয় শাঁখারিয়া পুকুরের পাড়ে মহামায়ার প্রাচীন মন্দিরটিও তাঁদেরই কীর্তি। কিংবদন্তী, দেবী মহামায়া একদা কিশোরীর রূপ ধারণ ক'রে এই শাঁখারিয়া পুকুরের তীরে এক শাঁখারির কাছ থেকে দু'গাছি শাঁখা প'রে, তাঁর বাবা, স্থানীয় এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে দাম নিতে বলেন। ব্রাহ্মণের কোন মেয়ে ছিল না। শাখারির কাছে এই অলৌকিক কাহিনী শুনে তাঁরা দু'জনেই পুকুরপাড়ে এসে শাখাপরা দু'টি কোমল হাত ক্ষণতরে জলের ওপর উঠে ডুবে যেতে দেখেন। সে রাত্রেই ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হন, তিনি যেন পুকুর-ঘাট থেকে এক শিলাখণ্ড এনে প্রতিষ্ঠা করেন, কেননা সেই শিলাপটে যথাকালে দেবী মহামায়ার মূর্তি আপনিই আবির্ভূত হবে।

রাসমঞ্চটির উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট (১০'৫ মিটার) ও প্রতি দিকের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি (২'২ মিটার)। প্রথম ও দ্বিতীয় তলের প্রতি কোণায় একটি ক'রে ছোট চূড়া ও কেন্দ্রীয় বড় চূড়াটির সব ক'টিই খাঁজকাটা। আকারে এত বড় সপ্তদশরত্ন রাসমঞ্চ বাঁকুড়া জেলায় হদল-নারায়ণপুর ('হদল-নারায়ণপুর' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) ছাড়া আর অন্য কোথাও নেই। রথের সময় দামোদর বিগ্রহটি বহনের জন্য প্রায় ৭ ফুট (২'১ মিটার) উচ্চতার পিতলের যে ছোট রথটি এখানে আছে তার ফুলকারি নকশার কাজগুলি বেশ সূক্ষ্ম। রথের গায়ে ক্ষোদিত দু'টি লিপি থেকে জানা যায় যে শ্রীযোগেশচন্দ্র পাঁজার নির্দেশে সিমলা, কাঁসারিপাড়া নিবাসী জনৈক প্রসাদচন্দ্র দাস ১৩১১ বঙ্গাব্দে এটি নির্মাণ করেন।

মন্দির-চত্বরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অদূরের এক গাছতলায় প্রতাপশালী গ্রামদেবতা ক্ষেত্রপাল সমাসীন। পুরনো পাথরের মূর্তি ; ক্ষয়িত বলে স্বরূপ বোঝা যায় না। পাশেই পুরাতন কোন মন্দিরের দরজার বেশ বড় এক পাথরের বাজু মাটিতে পোঁতা। দু'টিই হয়ত অজ্ঞাত কোন প্রাচীন মন্দিরের অংশ। ক্ষেত্রপালের 'থান'-এর সামনে, এক কুঁড়ে ঘরে, পাথরের কূর্মমূর্তি ধর্মরাজ 'শীতলনারায়ণ' প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বর্তমান পুরোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হলেও, পৌষ মাসের বার্ষিক উৎসবের সময় স্থানীয় ডোম 'পণ্ডিত' এসে প্রথমে ছড়া না কাটলে পূজা আরম্ভ হতে পারে না।

রাজগ্রাম (বাঁকুড়া থানা) : বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে, দ্বারকেশ্বর নদের দক্ষিণ তীরে, রাজগ্রাম মৌজা (জে. এল. নং ১৮৩) অবস্থিত। এক্তেশ্বরের কাছে, দ্বারকেশ্বরের ওপর আধুনিক সেতুটি নির্মিত হবার পূর্বে, বাঁকুড়া-ইঁদপুর-খাতড়া সড়কটি পুরাতন এক ইটের সাঁকোর ওপর দিয়ে প্রসারিত ছিল। এখনও সেই পথে নদী পার হলেই রাজগ্রামে পৌঁছনো যায়। স্থানীয় হাটতলায়, ইটের, পুবমুখী, নবরত্ন, শ্রীধর (শালগ্রাম) মন্দিরটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০'৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭ ফুট ২ ইঞ্চি (৫'২ মিটার), এ দেবালয়ের পুব ও দক্ষিণ দিকের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট'-এর ও গর্ভগৃহের ছাদ পাশ-খিলান ও কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর রক্ষিত। প্রতিষ্ঠালিপি নেই ; তবে ছাতনার আধুনিকতম বাসুলি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছাতনার রাজ-পরিবার এটিরও নির্মাতা বলে প্রকাশ। মতান্তরে, স্থানীয় দত্ত (তাঁতি) পরিবারের চিন্তামনি দত্ত এটির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁদের তসর, লাক্ষা প্রভৃতির ব্যাবসা ছিল।

রাজগ্রামে এখনও বহু তাঁতির বাস। 'টেরাকোটা' শৈলীর নজিরে, মন্দিরটিকে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত ব'লে মনে হয়। পোড়ামাটির অলংকরণ পুবের দেওয়ালেই সীমাবদ্ধ কিন্তু দক্ষিণ দিকের খিলানশীর্ষে চুনবালিপলস্তারার বড় বড় মূর্তিও নিবদ্ধ আছে। মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের অন্তিমকালে যে, বিকল্প হিসাবে, পলস্তারা ও পঙ্কের অলংকরণের সূত্রপাত হয়, এ ইমারতে তার নিদর্শন মেলে। 'টেরাকোটা' কারিগরি সেজন্য নিরেস, প্রাণহীন ও সূক্ষ্মতাবর্জিত। কিন্তু প্রথাগত ভাস্কর্য ছাড়াও বহু অভিনব বিষয়বস্তুর সমাবেশ হয়েছে এ মন্দিরে; যথা, গণ্ডারের পিঠে আরোহী, বাঘের পিঠে ভৈরব, গজকচ্ছপবাহী গরুড়, গাছের ডালে বনদুর্গা প্রভৃতি। মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতিকালীন দৃষ্টান্ত হিসাবে, বহুল-অলংকৃত এ দেবালয়টির কিছু গুরুত্ব আছে।

শ্রীরামপুর পাড়ায় কুণ্ডু পরিবারের (তাম্বুলি) ইটের, দক্ষিণমুখী, পঞ্চরত্ন, শালগ্রাম মন্দিরটির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১১ ফুট (৩.৩ মিটার) ও উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট (৭.৫ মিটার)। সামনের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট'-এর ও গর্ভগৃহের ছাদ এক জোড়া পাশ-খিলানশীর্ষে স্থাপিত গম্বুজের ওপর রক্ষিত। দক্ষিণ ও পুব দেওয়ালের 'টেরাকোটা' অলংকরণগুলি প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক বিষয়বস্তুর কিন্তু বেশ স্থূল ও নিরেস কারিগরির। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায়, পোড়ামাটি-সজ্জার নিরিখে, মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে মনে হয়।

রামপুর: বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলপথের ধাগড়িয়া স্টেশন থেকে মোরামের রাস্তায় প্রায় ৩ মাইল (৪.৮ কিলোমিটার) উত্তরে, এ অঞ্চলের বিখ্যাত গ্রাম হদল-নারায়ণপুর পার হয়েই, পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত রামপুর মৌজা (জে. এল. নং ৬)। বাঁকুড়া-বর্ধমান পিচের সড়ক (নিয়মিত বাস চলে) ধাগড়িয়া স্টেশনের পাশ দিয়েই গিয়েছে; বাসে ক'রে সে পথেও ধাগড়িয়া স্টেশন অবধি আসা যায়। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি, বামুনপাড়ায় গোস্বামীদের প্রতিষ্ঠিত কাছাকাছি কয়েকটি দেবালয় ও তাদের অদূরে মধ্যযুগের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শুভঙ্করের ('শুভঙ্কর দাঁড়া ও খাল' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) বাস্তুভিটা, 'শুভঙ্কর দীঘি', তাঁর প্রতিষ্ঠিত এক ভগ্ন দালান-মন্দির ও কোম্পানীর আমলের এক নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ। গোঁসাইদের চারটি দেবালয়ের মধ্যে প্রথমটি ত্রি-খিলান, ঢাকা বারান্দাযুক্ত, পুবমুখী এক ইটের একরত্ন মন্দির যার

উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৩ ফুট (৩.৯ মিটার)। দ্বিতীয়টি এক আটকোণা, নবরত্ন রাসমঞ্চ; উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট (৭.৫ মিটার) ও প্রতি দিকের দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি (১.৩ মিটার)। তৃতীয়টি পুবমুখী এক আটকোণা, আটচালা মন্দির যার উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট (৪.৫ মিটার) ও প্রতি দিকের দৈর্ঘ্য ৩ ফুট ১০ ইঞ্চি (১.২ মিটার)। ছোট হলেও, স্থাপত্যের দিক থেকে শেষোক্ত দেবালয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আটকোণা আটচালা মন্দির বাঁকুড়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গে বেশী নেই। চতুর্থটি চতুষ্কোণ প্রস্থচ্ছেদের পুবমুখী এক আটচালা মন্দির যার উচ্চতা ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থ যথাক্রমে প্রায় ১৫ ফুট (৪.৫ মিটার) ও ৯ ফুট ৭ ইঞ্চি (৩ মিটার)।

গ্রামের উত্তর প্রান্তে, বাঁশবনের মধ্যে, ইট-বিছানো এক বাস্তুকে শুভঙ্করের পৈতৃক ভিটা বলে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। অপুত্রক শুভঙ্করের দুই মেয়ের যথাকালে বিবাহাদি হলেও, দৌহিত্র বংশ এখন লুপ্ত হয়েছে। তাঁর বাস্তুভিটার অদূরে, দক্ষিণমুখী, ত্রি-খিলান, পরিত্যক্ত, ছোট দালান-মন্দিরটি নাকি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। অধুনালুপ্ত, তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর একটি দালান-মন্দিরের বৃন্দাবনচন্দ্র ও রাধিকার বিগ্রহ এ গ্রামের রায় পরিবারের বাড়িতে এখনও উপাসিত। গ্রামের দক্ষিণে বেশ বড় ও প্রাচীন এক জলাশয়কে লোকে 'শুভঙ্করের দীঘি' বলেই জানে। তাঁর পরিকল্পিত 'শুভঙ্করের দাঁড়া' বা এ অঞ্চলে জলসেচের জন্য প্রাচীন কৃত্রিম খাল থেকে এক শাখা খনন করিয়ে তিনি নাকি এ পুষ্করিণীতে জলাগমের ব্যবস্থা করেছিলেন। দীঘির উত্তর ও দক্ষিণ তীরে ইট-বাঁধানো দু'টি প্রশস্ত ঘাটের চিহ্ন আজও দেখা যায়। পশ্চিম পাড়ে পরিত্যক্ত এক নীলকুঠির ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এরকম নীলকুঠি একদা, রামপুর থেকে ৫ মাইল (৮.১ কিলোমিটার) ব্যাসের মধ্যে, ধাড়িমপুর, নারায়ণপুর, পারুলিয়া, হদল, হাট কৃষ্ণনগর প্রভৃতি গ্রামেও ছিল।

লোকপুর: বিষ্ণুপুর-কোতুলপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), জয়পুরের প্রায় ৫ মাইল (৮.১ কিলোমিটার) পুবে, উত্তর-পশ্চিমমুখী যে কাঁচা রাস্তা বার হয়েছে তাতে ২ মাইল (৩.২ কিলোমিটার) গেলে জয়পুর থানার অন্তর্গত লোকপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৯৮)। এখানকার ইসমাইল গাজীর সমাধিটি মাটির কিন্তু তার আচ্ছাদন-কক্ষটি পাথরের যা অদূরের প্রাচীনতর এক ইমারত (তার ভিত্তির চিহ্ন এখনও দেখা যায়) থেকে সংগৃহীত হতেও পারে।

স্থাপত্যের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর এ সৌধের ধর্মীয় গুরুত্ব কিন্তু যথেষ্ট, কেননা বাঁকুড়া জেলার তাবৎ পীরস্থানের মধ্যে এটিই সম্ভবতঃ সবচেয়ে বিখ্যাত। কিংবদন্তী, ইসমাইল গাজী নামে এক ইসলাম ধর্মপ্রচারক গড় মান্দারণের হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলে, অলৌকিকভাবে তাঁর মাথাটি অদৃশ্য হয় কিন্তু এখন যেখানে তাঁর কবরখানা অবস্থিত সেখানে তাঁর এক ফোঁটা রক্ত পড়ে। আর এক জনশ্রুতি অনুসারে, হোসেন শাহের রাজত্বকালে ইসমাইল গাজী উড়িষ্যা জয় ক'রে ফিরে এলে তাঁর শত্রুপক্ষ গোপনে নবাবকে খবর দেন যে তিনি গড় মান্দারণকে কেন্দ্র ক'রে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের আয়োজন করছেন। রাজাদেশে গৌড়ে উপনীত হলে তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয় কিন্তু তাঁর কবন্ধ ঘোড়ায় চেপে অলৌকিকভাবে গড় মান্দারণে ফিরে আসে ও সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

শুভঙ্কর দাঁড়া ও খাল : ইমারত ছাড়াও যে পুরাকীর্তি হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সোনামুখী থানার উত্তরাংশে, পুব-পশ্চিমে প্রসারিত শুভঙ্কর দাঁড়া ও বড়জোড়া থানার অনুরূপ এলাকায় শুভঙ্কর খাল। জলসেচের জন্য নির্মিত কাটা খালকে বাঁকুড়ার কথ্য ভাষায় বলে 'দাঁড়া'। সোনামুখী-বড়জোড়া অঞ্চলের চিরন্তন জলকষ্ট নিবারণের জন্য এই কৃত্রিম জলপথগুলি, খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের প্রথমার্ধে, মল্লরাজ গোপাল সিংহের রাজত্বকালে (১৭২০-১৭৫৮), তাঁর সভাসদ, সুপরিচিত গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর দাসের পরিকল্পনা অনুসারে খনন করানো হয়েছিল। আদিতে প্রায় ৮০ বর্গমাইল (২০৪ বর্গ কিলোমিটার) স্থানের জলসেচের জন্য পরিকল্পিত, বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট এ খালগুলি, মল্ল-রাজত্বের অবসানে, কালক্রমে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সরকারী সাহায্যের অংশ হিসাবে ১৮৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পঙ্কোদ্ধারের কিছু চেষ্টা করা হয় বটে কিন্তু সে প্রয়াস বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠার পর, ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, এগুলিকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য ক'রে সোনামুখী ও বড়জোড়া থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলসেচের কাজে লাগানো হয়েছে। আজ থেকে প্রায় আড়াই শ বছর পূর্বে, আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান যখন বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, তখনকার পরিকল্পিত এই বিস্তীর্ণ সেচ-ব্যবস্থা, মন্দিরময় বাঁকুড়া জেলায় অন্য ধরণের এক আশ্চর্য পুরাকীর্তি।

বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত কয়েকটি প্রাচীন পুঁথি থেকে জানা যায়, 'শুভঙ্কর' কারও ব্যক্তিগত নাম নয়; গণিতে

অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করলে মল্ল-দরবার থেকে এ উপাধি দেওয়া হত। শুভঙ্কর দাসের আসল নাম ছিল জগন্নাথ দাস এবং তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রামে ('রামপুর' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এছাড়া, ছাতনা-নিবাসী আরও তিনজন ও মানসায়ের গ্রামের রত্নেশ্বর ভট্ট নামে আর একজন গণিতজ্ঞ 'শুভঙ্কর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় রক্ষিত শেষোক্ত 'শুভঙ্কর'-এর এক পুথির একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এ বই-এর আলোকচিত্র অংশে মুদ্রিত হল।

শুশুনিয়া : বাঁকুড়া-পুরুলিয়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বাঁকুড়ার ৮ মাইল (১৩ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে ছাতনা ; সেখান থেকে উত্তরমুখী কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৬ মাইল (৯·৭ কিলোমিটার) গেলে ছাতনা থানার অন্তর্গত শুশুনিয়া পাহাড়ের (জে. এল. নং ৮৫) পাদদেশে পৌছনো যায়। ১,৪৪২ ফুট (৪৪০ মিটার) উঁচু ও পুব-পশ্চিমে প্রায় ২ মাইল (৩·২ কিলোমিটার) বিস্তৃত এ পাহাড়টি ছাতনা থানার উত্তর-পুব অংশে অবস্থিত। শুশুনিয়ার খ্যাতি প্রধানতঃ দু'টি প্রাচীন গুহালিপির জন্য যাদের কাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বলে নির্ণীত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় ও গুপ্ত-লিপির পূর্বাঞ্চলীয় হরফে গুহার দেওয়ালে উৎকীর্ণ প্রথম লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "চক্রস্বামিন দাসাগ্রে-নাতিসৃষ্ট পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিংহবর্মনস্য পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্র-বর্মন দৃতি।" অর্থাৎ, চক্রধারী দেবতার প্রধান সেবক, পুষ্করণার অধিপতি শ্রীসিংহবর্মণের পুত্র শ্রীচন্দ্রবর্মণ বিশেষ কোন কীর্তি উৎসর্গ করলেন। চন্দ্রবর্মণের যথার্থ পরিচয় নিয়ে বহু বিতর্কের পর পণ্ডিত-মহলে মোটামুটি এই মত গৃহীত হয়েছে যে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত আজকের পাখন্নাই প্রাচীন পুষ্করণা ও এ রাজবংশের রাজধানী সেখানেই অবস্থিত ছিল। ('পাখন্না' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সিংহবর্মণ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষ দিকে ও চন্দ্রবর্মন চতুর্থ শতকের প্রথমে রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজ্যসীমা সঠিকভাবে নির্ধারিত না হলেও ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর সম্পাদিত 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড) বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে পুষ্করণা-অধিপতি চন্দ্রবর্মণের শাসন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলা অবধি বিস্তৃত ছিল। শুশুনিয়ার দ্বিতীয় লিপিটি একই হরফে লিখিত ও তার পাঠ নিম্নরূপ : "চক্রস্বামিনো ধোসোগ্রামোত্রিসৃষ্ট।" অর্থাৎ, ধোসোগ্রাম নামক পল্লী চক্রস্বামীকে উৎসর্গ করা হল। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বাসুদেব বা বিষ্ণুরই অপর নাম

চক্রস্বামী। অরণ্যসংকুল শুশুনিয়া গিরিশিখরের দুর্গম গুহাগাত্রে ক্ষোদিত এ লিপি দু'টি বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রাচীনতম লিপিগুলির অন্যতম।

শুশুনিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে, ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষায় বিবিধ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর দেহাবশেষ ও মানুষের তৈরি নানারকম পাথরের হাতিয়ার সংগৃহীত হয়েছে। সেসব নজিরে স্থানটির অপরিমেয় প্রাচীনত্বই সূচিত হয়।

সলদাঃ এখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ 'গোকুলনগর' নিবন্ধে দেওয়া হয়েছে। জয়পুর থানার অন্তর্গত এ গ্রামের (জে. এল. নং৩৫) কয়েকটি গাছতলায় বেশ কিছু হিন্দু ও জৈন মূর্তি সঞ্চিত আছে; গ্রামবৃদ্ধেরা বলেন, আগে আরও বেশী ছিল। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে ডোম-দীঘির ধারে যে বিস্তীর্ণ ঢিবি ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, সেখান থেকেই এগুলি সংগৃহীত মনে হয়। ঢিবিটি খননযোগ্য, কেননা ভুবনেশ্বর শিবের এক বিশাল লিঙ্গ ছাড়াও একাধিক পাথরের মন্দিরের যে পরিমাণ ভগ্ন অংশ ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে, তাতে মাটির নীচে যে আরও অনেক বেশী পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লুপ্ত মন্দিরগুলি কতদিন পূর্বে নির্মিত হয়েছিল সেকথা আজ আর সঠিক-ভাবে বলা সম্ভব নয়; তবে এ গ্রামে ও আশপাশে বহু জৈন মূর্তির নজিরে এমন অনুমান হয়ত সঙ্গত যে সেগুলি প্রাক্-মুসলমান যুগের। জনশ্রুতি, কালাপাহাড় ভুবনেশ্বর মন্দির ধ্বংস করবার পূর্বে ভুবনেশ্বর-শিব অদূরের গন্ধেশ্বর-শিবকে ('গোকুলনগর' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) অলৌকিক-ভাবে সাবধান-বাণী পাঠান ব'লে তিনি রক্ষা পান।

সাত্রাকোণ: বিষ্ণুপুরের প্রায় ১০ মাইল (১৬ কিলোমিটার) দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে ও খড়্গপুর-আদ্রা রেলপথের পিয়ারডোবা স্টেশনের ৪ মাইল (৬.৪ কিলোমিটার) পশ্চিমে, তালডাংরা থানার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের গ্রাম সাত্রাকোণ (জে. এল. নং ১৪০) কিছুটা দুর্গম। পিয়ার-ডোবা থেকে কাঁচা রাস্তায় হেঁটে, জীপে বা গরুর গাড়িতে যাওয়াই প্রশস্ত। বিষ্ণুপুর-পাঁচমুড়া কাঁচা রাস্তায় ৭ মাইল (১১.৩ কিলোমিটার) দূরের মাণ্ডি গ্রাম থেকে বাঁ-হাতি কাঁচা রাস্তায় আরও ২½ মাইল (৪ কিলোমিটার) গিয়েও সাত্রাকোণে পৌঁছনো যায়। দূর পাড়াগাঁয়ে হলেও, এখানকার মাকড়া-পাথরের আটচালা মন্দিরটির মত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত দেবালয় বাঁকুড়া জেলায় বেশী নেই। পুরন্দর নামে অতি মনোরম এক ছোট নদী, উঁচু জমিতে স্থাপিত

মন্দিরটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। আগে নাকি নদীর দু'টি শাখা দেবালয়ের চারদিক ঘিরে প্রবাহিত ছিল। একটি শাখার শুকনো খাত এখনও দেখা যায়। দক্ষিণমুখী, কিছুটা বেঁটে গড়নের (বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় এহেন খর্বাকৃতি আটচালা মন্দিরের এক সময়ে বেশ প্রচলন হয়েছিল মনে হয়), এ আটচালা সৌধের উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ২০ ফুট ৪ ইঞ্চি (৬·১ মিটার)। সামনের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট'-এর ও গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর স্থাপিত। দেওয়ালের পলস্তারা পরবর্তী কালের। খিলানশীর্ষে কিছু ফুলকারি কাজ ছাড়া অন্য অলংকরণ নেই। দক্ষিণের দেওয়ালে নিবদ্ধ পাথরের ছ'লাইনের প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ | কালবস্বঙ্কগেশাকে | শ্রীরাধাকৃষ্ণযোমুদে | দদৌ সৌধগৃহং শ্রীল | বীরসিংহ মহীপতি | সন ৯৮৩।" অর্থাৎ, ৯৮৩ মল্লাব্দে (১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) রাধাকৃষ্ণ উপাসনার জন্য মল্লরাজ দ্বিতীয় বীর সিংহ এই সৌধ-গৃহ দান করেন। মূল মন্দিরের সামান্য উত্তর-পশ্চিমে ছোট দোল-মঞ্চটি পরবর্তী কালের ও স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যহীন। ৯½ ইঞ্চি উঁচু কষ্টি-পাথরের রামকৃষ্ণ বিগ্রহটি খুবই সুন্দর।

মন্দির-লিপিতে সাংকেতিক ভাষায় প্রতিষ্ঠাকাল উল্লেখ করবার বহুল-প্রচলিত রীতিটির বিষয়ে এখানে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত সহযোগে মূল সংখ্যাগুলি শেখানোর জন্য রচিত "একে চন্দ্র, দু'য়ে পক্ষ, তিনে নেত্র···আটে অষ্টবসু···দশে দিক্" ছড়াটি সর্বজনবিদিত। এ উদাহরণগুলির কিন্তু বিকল্পও আছে; যেমন, একে চন্দ্র না হয়ে ক্ষিতি বা পৃথিবীও হতে পারে; তিনে নেত্র না হলে কালও ('ত্রি-কাল') হতে পারে; ন'য়ে নবগ্রহ না হয়ে গণিতের মূল অঙ্কগুলির সংখ্যাও হতে পারে ইত্যাদি। এ মন্দিরের লিপির "কালবস্বঙ্কগেশাকে" এই দ্বিতীয় পংক্তিটির মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় প্রতিষ্ঠা-বৎসরটি প্রচ্ছন্ন আছে। 'শাকে' বলতে মল্ল-শক বা মল্লাব্দই বুঝতে হবে কেননা যাবতীয় মল্ল-মন্দিরে এই অব্দটিই উল্লিখিত হয়েছে। 'কাল', 'বসু' এবং 'অঙ্ক' এখানে ৩, ৮ ও ৯-এর সমার্থক। পৃথক্ সংখ্যাগুলি এ ভাবে নির্ণয় ক'রে নিয়ে, "অঙ্কস্য বামাগতি" এই নিয়ম অনুসারে, তাদের বিপরীত-ভাবে সাজালে ৯৮৩, অর্থাৎ সঠিক প্রতিষ্ঠা-বৎসরটি, পাওয়া যায়। আলোচ্য লিপিতে প্রতিষ্ঠার বৎসরটি সংখ্যাতেও দেওয়া আছে, কিন্তু সর্বত্র এরকম থাকে না। সেক্ষেত্রে, সাংকেতিক শ্লোকের এভাবে তর্জমা করা ছাড়া উপায় নেই।

এ মন্দিরের বিগ্রহের নাম রামকৃষ্ণ হল কেন সে সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় বীর সিংহের রাজত্বকালে, উত্তর-পশ্চিম দেশাগত এক সাধু নাকি রাম (বলরাম) ও কৃষ্ণের দু'টি মূর্তি সঙ্গে নিয়ে সাত্রাকোণ অঞ্চলে এসে বসতি করেন। একদিন তিনি ভিক্ষায় বা'র হলে, বিগ্রহ দু'টি দুই কিশোরের রূপ ধারণ ক'রে সাধুর কুটীর-প্রাঙ্গণে খেলা করতে থাকে। সেখান দিয়ে তখন এক গোয়ালা যাচ্ছিল বিষ্ণুপুরে। বালকেরা রাজার হাতে দেবার জন্য তাকে একটি আম দেয়, কিন্তু বিষ্ণুপুরে পৌঁছে গোয়ালা সেকথা ভুলে যায় একেবারে। রাত্রে বিষ্ণুপুররাজ ও গোয়ালা যুগপৎ স্বপ্নাদিষ্ট হলে, পরদিন তাঁরা সাধুর কুটীরে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু সেই সুদর্শন কিশোর দু'টির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। রাজা অনুমান করেন, সন্ন্যাসীর বিগ্রহ দু'টিই বালকের রূপ ধারণ করেছিল। এহেন জাগ্রত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি সাধুর কাছ থেকে দু'টির একটি চেয়ে নেন। কিন্তু কোন্ মূর্তিটি যে তিনি পেয়েছিলেন সেকথা সঠিকভাবে জানা না থাকায় মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে বিগ্রহের যৌথ নাম রাখা হয় রামকৃষ্ণ। আর এক কিংবদন্তী, কোন পাখি এ মন্দিরের ওপর দিয়ে উড়ে যায় না ; গেলে, তখনই নাকি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

সাসপুর : বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলপথের সাসপুর স্টেশন থেকে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ২ মাইল (৩·২ কিলোমিটার) দক্ষিণে, ইঁদাস থানার অন্তর্গত সাসপুর গ্রামের (জে. এল. নং ৭৫) খ্যাতি প্রধানতঃ ছুরি, কাঁচি, জাঁতি, ক্ষুর, বঁটি, কাটারি ও কৃষিকর্মের বিবিধ যন্ত্রপাতি নির্মাণের কেন্দ্র হিসাবে। পুরাকীর্তি যা দু'একটি আছে তা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। স্থানীয় দে (তন্তুবায়) পরিবারের বাড়ির প্রাঙ্গণে রাধা-দামোদরের (শালগ্রাম) মন্দিরটি পুরাকীর্তির পর্যায়ে পড়ে, কেননা প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে নির্মাণকাল সঠিকভাবে না জানা গেলেও পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায় এটি শতাধিক বছরের প্রাচীন। পাশের সতের চূড়াবিশিষ্ট রাসমঞ্চের লিপি থেকে প্রকাশ সেটি ১২৯৭ বঙ্গাব্দে আনন্দচন্দ্র দে'র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও বিষ্ণুচরণ মিস্ত্রীর দ্বারা নির্মিত। গ্রামের হাটতলার উত্তরে আর এক পলস্তারা-আবৃত ইটের দালান-মন্দিরে এ অঞ্চলের বিখ্যাত দেবতা 'বুনাশিব' অধিষ্ঠিত। স্থানীয় কায়স্থ পরিবারের ৺হরিহর মিত্র স্বপ্নাদেশে এ স্বয়ম্ভু লিঙ্গটির প্রতিষ্ঠা করেন। পিতলের পাতে ক্ষোদিত (অভিনব সন্দেহ নেই), এ মন্দিরের পাঁচ লাইনের প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী৺ | সিবচরণে আস |

শ্রীহরিহর মিত্র দাস | সকাব্দা ১৭৬৪ সাল | সন ১২৪৯ সাল।" স্থাপত্যভাস্কর্যগত কোন কৌলীন্য না থাকলেও এ মন্দির ঘিরে বৈশাখী সংক্রান্তিতে (চৈত্র সংক্রান্তিতে নয়) ১৫।২০ দিনব্যাপী যে গাজন মেলা বসে তাতে বহু লোকের সমাগম হয়।

সাহারজোড়া : বাঁকুড়া-দুর্গাপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বড়জোড়ার মাইল দুই দক্ষিণে, দেজুড়ি গ্রামের মোড় থেকে ডান-হাতি কাঁচা রাস্তায় ২ মাইল (৩'২ কিলোমিটার) পশ্চিমে, বড়জোড়া থানার অন্তর্গত সাহারজোড়া গ্রাম (জে. এল নং ২৬)। এ অঞ্চলের লোকের কাছে সাহারজোড়ার খ্যাতি দেবী অম্বিকার মাহাত্ম্যের জন্য। কিন্তু তাঁর আধুনিক, চারচালা, ছোট মন্দিরটি স্থাপত্যের দিক থেকে উল্লেখনীয় নয়। কাছাকাছি অবস্থিত নন্দলাল, মদনমোহন ও কালাচাঁদের তিনটি মন্দিরই এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। প্রথমটি, সামনে ত্রি-খিলান দালানযুক্ত, মাকড়া-পাথরের, দক্ষিণমুখী এক একরত্ন মন্দির ; চূড়াটি ত্রিরথ ; উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার), দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৭ ফুট (৫'১ মিটার) ; প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৪২ শকাব্দ (১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ)। দ্বিতীয়টি সম্ভবতঃ মাকড়া-পাথরের একরত্ন দেবালয়ই ছিল ; বহুল-সংস্কারের ফলে এখন অন্য রূপ নিয়েছে। তৃতীয়টি আদিতে ইটের পঞ্চরত্ন মন্দির হিসাবে নির্মিত হলেও, কোণের চারটি চূড়াই এখন ভূপতিত হওয়ায় অনেকটা একরত্ন মন্দিরের মত দেখায়। সামনে ত্রি-খিলান দালানযুক্ত, দক্ষিণমুখী, এ দেবালয়ের উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট (৭'৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১৪ ফুট ৩ ইঞ্চি (৪'৩ মিটার)।

সিমলাপাল : বাঁকুড়া-তালডাংরা-সিমলাপাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বাঁকুড়া থেকে ২৪ মাইল (৩৮'৬ কিলোমিটার) দক্ষিণে সিমলাপাল থানার সদর সিমলাপাল গ্রাম। জনশ্রুতি অনুসারে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে উৎকলদেশাগত এক ব্রাহ্মণ পরিবার এ অঞ্চল দখল ক'রে মল্লরাজাদের সামন্ত হিসাবে সিমলাপাল রাজবংশের পত্তন করেন। এ পরিবারের বর্তমান বসতবাটির প্রাঙ্গনে, মাকড়া-পাথরের, দক্ষিণমুখী, আটচালা, বলরামজীউর মন্দিরটি এখানকার একমাত্র উল্লেখ-যোগ্য পুরাকীর্তি। উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০'৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ২১ ফুট ৯ ইঞ্চি (৬'৫ মিটার), এ দেবালয়ের প্রথাগত ত্রি-খিলান দালানের সামনে গ্রীসীয় ধরণের থামযুক্ত সমতল ছাদের আর একটি আধুনিক বারান্দা যে পরবর্তীকালে যোগ করা হয়েছে তাতে প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সাহেবিয়ানাই সূচিত হয়েছে, মন্দিরের সৌন্দর্য কিছু বাড়েনি।

এহেন দৃষ্টিকটু সংযোজন হুগলী জেলার হরিপাল প্রভৃতি স্থানের মন্দিরেও দেখা যায়। এ ত্রুটি কিন্তু অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে কালো পাথরের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ভাস্কর্যে। পুবের দেওয়ালের বাইরের গায়ে নিবদ্ধ উপবিষ্ট দুটি যক্ষ-যক্ষিণী ও সাবেক দালানের দেওয়ালে গ্রথিত দুটি অম্বিকা (তাদের মধ্যে একটি অপূর্ব লালিত্যময়ী), দু'টি জৈন তীর্থঙ্কর, দু'টি বেনুকৃষ্ণ, একটি রাজসভায় আসীন রামসীতা ও একটি বাসুদেব মূর্তি এ মন্দিরের বিশিষ্ট সম্পদ। পাথরের এতগুলি সুন্দর মূর্তি কোথা থেকে, কবে, কিভাবে সংগৃহীত তা জানা না গেলেও বেশ বড় আকারের এ ভাস্কর্যগুলি যে অধুনালুপ্ত কাছেপিঠের এক বা একাধিক পাথরের মন্দির থেকে প্রাপ্ত এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। আজকের সিমলাপাল থানায় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি নেই বললেই চলে। সেজন্য বিগতকালের এ সম্পদগুলি মূল্যবান।

সিমাফোর স্তম্ভ : ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ও'ম্যালীর বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার থেকে (পৃঃ ১২১), বাংলা তর্জমায়, নীচের উদ্ধৃতিটি অভিনিবেশযোগ্য। "বিষ্ণুপুরের কয়েক মাইল পশ্চিমে, মিলিটারী গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অদূরে রামসাগরে ও ওঁদা থেকে সামান্য তফাতে শালঘাটায় দুটি উঁচু স্তম্ভ এখনও দেখা যায়। কলকাতা থেকে বোম্বাই অবধি সবটা পথের প্রতি ৮ মাইল অন্তর ১০০ ফুট উঁচু স্তম্ভ নির্মাণ ক'রে তাদের শীর্ষ থেকে সিমাফোর সংকেতের মারফৎ বার্তা প্রেরণের যে প্রকল্পটি ভারত সরকার উনিশ শতকের প্রথম দিকে (১৮২০-৩০) গ্রহণ করেছিলেন, এগুলি তার কৌতূহলোদ্দীপক স্মৃতিচিহ্ন। 'টেলিগ্রাফ' কথাটা সে সময়ে সিমাফোর পদ্ধতিতে এভাবে খবর পাঠানোকে বোঝাত। সেজন্য পুরাতন মানচিত্রে আমরা এসব স্তম্ভকে 'টেলিগ্রাফ স্টেশন' বলে উল্লিখিত দেখি।" কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে শুরু ক'রে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলী ও বাঁকুড়া জেলায় এবং বিহারের কিছু অংশে এরকম স্তম্ভ নির্মিত হবার পর তারবার্তা প্রেরণের আধুনিক উপায়টি অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হওয়ায়, এ প্রকল্প মধ্য-পথে পরিত্যক্ত হয়। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার বেনিয়াপুকুরে, বিষ্ণুপুর থানার রামসাগরে, ওঁদা থানার শালঘাটায়, ছাতনা থানার ছাতনা ও অরড়ায় (ঝাঁটিপাহাড়ির কাছে) ইটের তৈরি, গোল বেড়ের, চারতলা ও ওপরের দিকে ক্রমশঃ সরু এই সিমাফোর স্তম্ভগুলি অল্প-বিস্তর জীর্ণ অবস্থায় এখনও দেখা যায়। ভেতরের ফাঁপা অংশে নিবদ্ধ সিঁড়ি দিয়ে কাঠের মেঝেযুক্ত প্রতি তলায় উঠে যাওয়া যেত। বাঁকুড়া

শহরের মাচানতলায় অবস্থিত আর একটি স্তম্ভ এখন লোপ পেয়েছে। মানচিত্রে এই ছ'টি স্তম্ভের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, পরস্পর থেকে মোটামুটি ৮ মাইল (১৩ কিলোমিটার) দূরত্বে এ 'টেলিগ্রাফ স্টেশন'গুলি উত্তর-পশ্চিমমুখী এক সরল রেখায় বাঁকুড়া জেলাকে অতিক্রম করেছে। পরিত্যক্ত এ ইমারতগুলি মন্দিরময় বাঁকুড়া জেলায় সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের এক পুরাকীর্তি।

প্রসঙ্গক্রমে, সরকারী মানচিত্রে 'জি. টি. এস.' বলে চিহ্নিত আর এক রকম ক্ষুদ্রতর স্তম্ভেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। কর্নেল ল্যাম্‌টনের তত্ত্বাবধানে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়ে যে 'গ্রেট ট্রিগনো-মেট্রিকাল সার্ভে' (বিশাল ত্রিকোণমিতিক জরিপ) ভারত ও সন্নিহিত দেশগুলিতে উনিশ শতকের প্রায় শেষ অবধি চলেছিল, তার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে এগুলি নির্মিত হয়। বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া থানার বিহারীনাথ ও পাবড়ায়, গঙ্গাজলঘাটি থানার কপিষ্ঠায়, বড়জোড়া থানার বড়জোড়ার অদূরে, ছাতনা থানার শুশুনিয়ায়, খাতড়া থানার জলহরিতে, সিমলাপাল থানার কুশুবায়, রাইপুর থানার কয়মায়, সোনামুখী থানার কারাসোলিতে, বিষ্ণুপুর থানার রামসাগরে ও কোতুলপুর থানার গঞ্জুয়ায়, মোট এগারটি 'জি. টি. এস.' স্তম্ভ একদা নির্মিত হয়েছিল। এদের অনেকগুলি এখনও বর্তমান আছে। শতাধিক বছরের ইমারত হিসাবে এ এক অভিনব ধরনের পুরাকীর্তি।

সিহর : কোতলপুর-কামারপুকুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), জয়রামবাটি গ্রামে ঢোকবার ঠিক আগে, 'মায়ের দীঘি' নামে পথের ধারে যে বড় পুকুরটি আছে, তার পাশ দিয়ে পশ্চিমমুখী মোরামের রাস্তায় মাইলখানেক (১·৬ কিলোমিটার) গেলে, কোতুলপুর থানার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত সিহর গ্রাম (জে. এল. নং ১৯৩)। এখানকার মাকড়া-পাথরের জগমোহনসমেত শিখর-দেউলটি বাঁকুড়া জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি এজন্য যে এহেন বিশিষ্ট গড়ণের দেবসৌধ এ জেলার বিক্রমপুর ও মুণিনগর (ওই নামের নিবন্ধ দু'টি দ্রষ্টব্য) ছাড়া এখন আর কোথাও নেই। পীঢ়া রীতির জগমোহনের ছাদে একটি মাত্র খাঁজ ও শীর্ষে বৃহৎ ঘণ্টা আর মন্দিরের ত্রিরথ শিখরের চূড়ায় বেশ বড় এক কুণ্ডলাকার আমলক আছে। মন্দির-মূলের উদ্‌গত অংশগুলি খুব উন্নত ও তাদের মধ্যে স্থাপিত তিনটি কুলুঙ্গিতে বেনুকৃষ্ণ, এক বাবু ও এক সুন্দরীর মূর্তি নিবদ্ধ। উত্তরের দেওয়ালে মিথুন-ভাস্কর্যও আছে দু'টি। পলস্তারা-আবৃত এসব মূর্তি পরবর্তী কালের হওয়া

সম্ভব। জগমোহনের দেওয়ালে আলো চলাচলের জন্য জাফ্‌রি-কাটা জানালাগুলি অভিনব। বিগ্রহ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শিব; নাম শান্তিনাথ। তাঁর পুবমুখী এ মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১১ ফুট ৮ ইঞ্চি (৩·৫ মিটার); জগমোহনের উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট (৪·৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৮ ফুট ৮ ইঞ্চি (৫·৬ মিটার)। উভয়েরই ছাদ ধাপযুক্ত চারচালা পদ্ধতিতে নির্মিত। মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই; জনশ্রুতি, অদূরের বীরসিংহপুর গ্রামের (চলতি ভাষায় 'বিষমপুর') ক্ষত্রিয় রাজারা নাকি এটির প্রতিষ্ঠাতা। স্থাপত্যশৈলীর বিচারে দেবালয়টি খ্রীষ্টীয় সতের শতকে নির্মিত বলে মনে হয়। জগমোহনের সংলগ্ন উত্তর-পুবে, ইটের, দক্ষিণমুখী, চারচালা ভোগগৃহটির ছাদ চারচালা 'ভল্‌ট'-এর ওপর স্থাপিত ও সেটির উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট (৪·৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১০ ফুট (৩ মিটার)। সিহর বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত শৈবতীর্থগুলির অন্যতম। গাজনের আড়ম্বর আগের তুলনায় অনেক কম হলেও এখনও প্রতি বৎসর তিন-চার শ লোক গাজন-সন্ন্যাসী হয়ে থাকে।

সোনাতপল ঃ বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর পিচের সড়ক (নিয়মিত বাস চলে) দ্বারকেশ্বরের সেতু পার হয়ে এক লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে যেখানে পূর্বতন সড়কের সঙ্গে মিশেছে, সেখান থেকে, লেভেল-ক্রসিং-এর পুব দিকে, বেলিয়াড়া গ্রাম পার হয়ে, কাঁচা রাস্তায় মাইল দু'য়েক (৩·২ কিলোমিটার) গেলে সোনাতপল মৌজা (জে. এল. নং ৭৫); বাঁকুড়া থেকে মোট দূরত্ব ৫ মাইলের (৮·১ কিলোমিটার) বেশী হবে না। ইটের তৈরি এখানকার বিশাল দেউলটি এখন খুব জীর্ণ হলেও সেটি বাঁকুড়া জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি। বর্তমানে প্রায় ৫০ ফুট (১৫ মিটার) উঁচু এই ভগ্নশিখর মন্দিরের নীচের অংশ এখন লোনা ধ'রে এতদূর ক্ষয়িত হয়েছে যে বাইরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থের সঠিক মাপ নেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে গর্ভগৃহের ভিতরের মাপ, প্রতি দিকে, ১২ ফুট (৩·৬ মিটার); সেই সঙ্গে দেওয়ালের প্রস্থ আনুমানিক ১০ ফুট (৩ মিটার) ধরলে, বাইরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ আদিতে প্রায় ২২ ফুটের (৬·৬ মিটার) মত ছিল বলে মনে হয়। এ মন্দির সম্বন্ধে আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্টের অষ্টম খণ্ডে মুদ্রিত মিঃ বেগলারের বিবরণীর কিছু অংশ এখানে তর্জমা ক'রে দেওয়া খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। "এক্তেশ্বরের দু'মাইল উত্তর-পুবে সোনাতপল গ্রাম। ধলকিশোর (দ্বারকেশ্বর) নদ যেখানে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে কিছু দূরে আবার একত্র হয়েছে,

সেই বিভক্তির মুখে গ্রামটি অবস্থিত। (এখন দক্ষিণ শাখাটি শুকিয়ে যাওয়ায় দ্বারকেশ্বর উত্তর শাখা দিয়ে প্রবাহিত—লেখক)।...এই দুই শাখার সংযোগস্থলের কাছে ঘনসংবদ্ধ ইটের এক উন্নত মন্দির দেখা যায়, যার ইটগুলি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২ ইঞ্চি ও ৮১/২ ইঞ্চি।...মন্দিরটি লক্ষণীয়ভাবে গুরুভার; গর্ভগৃহের ভিতরের আয়তন প্রতি দিকে মাত্র ১২ ফুট। ব্যবহৃত উপকরণ ইট হওয়ার দরুণ ও ইমারতটির প্রচুর উচ্চতার জন্য দেওয়ালগুলিকে পাথরের দেওয়ালের থেকে অনেক বেশী পুরু করতে হয়েছে। (এর পরে ধাপযুক্ত প্রবেশখিলান ও চারচালা ছাদের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তা এখানে নিষ্প্রয়োজন—লেখক)।... যে উঁচু ভিত্তির ওপর দেবালয়টি স্থাপিত তা এখন এক কদাকার ঢিবিতে পরিণত। প্রবেশপথের চৌকাঠের সামনে পাটাতনের অনুপস্থিতি থেকে মনে হয় সামনে কোন মণ্ডপ ছিল না এবং মন্দিরের সম্মুখভাগ বর্তমান আকারেই আদিতে নির্মিত হয়েছিল; সেরকম কিছু থাকলে, তার দেওয়ালে মন্দিরের সামনের কোন-না-কোন অলংকরণ অবশ্যই ঢাকা পড়ত। অতএব দেবালয়ের সম্মুখে মাটি ও রাবিশের দীর্ঘ চাতালটি হয় মুক্তাঙ্গন হিসাবে ব্যবহৃত হত (মেলা বা উৎসবের সময় আজও যা হয়ে থাকে), অথবা মূল মন্দিরের দিকে মুখ ক'রে সেখানে কোন উপ-মন্দির ছিল। দেবালয়টির আশপাশে, নিম্নভূমিতে (প্লাবনের জলে যা ডুবে যায়) আরও কয়েকটি ঢিবি দেখা যায় যেখান থেকে এখনও প্রাচীন ইট মেলে। জনশ্রুতি, এ মন্দির ও এসব ঢিবি পুরা-কালের শালিবাহন রাজার কীর্তি—যাঁর গড়ের ভগ্নাবশেষ আজও নাকি অদূরে, নদীর ধারে, কয়েকটি ঢিবির মধ্যে নিহিত আছে। ...কেউ কেউ বলেন এ স্থানের প্রাচীন নাম ছিল হামিরাডাঙ্গা। পঙ্কের প্রলেপে আবৃত প্রভূত ও উৎকৃষ্ট অলংকরণে মন্দিরটি একদা সজ্জিত ছিল। নীচের খোদাই ইটের নকশার সর্বাংশে পঙ্কের আবরণ এমন সুনিপুণভাবে বিন্যস্ত যে সেগুলি সমসাময়িক কালেরই হবে—বহু ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, সে রকম পরে আরোপিত নয় বলেই আমার বিশ্বাস। পলস্তারা এখন অবশ্য উঠে গিয়েছে অনেক স্থানে, মন্দিরের শিখরও অন্তর্হিত হয়েছে বহুকাল, আর সেই আকারহীন ভগ্ন চূড়ার ওপরে গাছপালা গজিয়েছে নিরঙ্কুশভাবে। এত সুন্দর এক মন্দিরকে এমন শোচনীয়ভাবে নষ্ট হতে দেওয়াটা গভীর পরিতাপের বিষয়।" তাঁদেরই এক পদস্থ আমলার এহেন আক্ষেপ সত্ত্বেও আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে নানা কারণে এটির সংরক্ষণ করতে পারেননি। সম্প্রতি, পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে, পর পর কয়েক বছর ধ'রে এটির সংস্কার করা হবে স্থির হয়েছে।

স্থাপত্য-ভাস্কর্যের রীতিপদ্ধতি ও উৎকর্ষের নজিরে সোনাতপলের এ দেউলটি প্রসিদ্ধতর বহুলাড়া মন্দিরের সমকক্ষ ও সমকালীন বলেই মনে হয়। শিখরের গায়ে চৈত্য-গবাক্ষের যে অনুকৃতির আভাস এখনও দেখা যায় তাও বহুলাড়ার অনুরূপ। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় এগার শতকে নির্মিত এই অসামান্য পুরাকীর্তিটি কিন্তু বহুলাড়ার থেকে অনেক বেশী জীর্ণ হয়েছে এই কারণে যে শেষোক্ত দেবগৃহটি শৈবকেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় ভক্তজনের অভিনিবেশ লাভ করতে পেরেছে বেশী পরিমাণে। সোনাতপল মন্দিরে এখন কোন বিগ্রহ নেই; আদিতেও যে কী ছিল সেকথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। অনেকে মনে করেন এটি সূর্যমন্দির, কেননা এটি পুবমুখী; কিছুদিন আগে মন্দিরের কাছাকাছি এক সূর্যমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল; আর অদূরেই বীরসিংহপুর-রাজহাট অঞ্চলে বহুকাল থেকে সূর্য-উপাসক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের বসবাস রয়েছে। কিন্তু সোনাতপলকে সূর্য-উপাসনার প্রাচীন কেন্দ্র ব'লে প্রমাণ করবার জন্য শুধু এই যুক্তিগুলিই যথেষ্ট কিনা সন্দেহ।

শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধেও সমাজবিজ্ঞানসম্মত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের আদিনিবাস শাকদ্বীপ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তীটি প্রচলিত তা এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। কোন গুরুতর পাপকার্যের জন্য কৃষ্ণ একদা তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধকে শাপ দিলে তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। কৃষ্ণ তখন তাঁকে পশ্চিম সমুদ্রের তীরে শাকদ্বীপে গিয়ে সূর্যের আরাধনা করতে বলেন। বহু যুগ সেইমত তপস্যার পরে, অনিরুদ্ধ রোগমুক্ত হয়ে জম্বুদ্বীপে (ভারতে) ফিরে আসেন ও অরুণ দেবতার প্রীত্যর্থে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দেন। বলা বাহুল্য, ইতিহাসের সঙ্গে এ কাহিনীর যোগসূত্র খুবই ক্ষীণ। কিন্তু সোনাতপলের সংলগ্ন পুবের মৌজা দুটির নাম যে এখনও 'তপোবন' ও 'ভীমপুর' সে তথ্য বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

সোনামুখী : বাঁকুড়া-সোনামুখী পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বাঁকুড়ার ২৬ মাইল (৪২ কিলোমিটার) উত্তর-পুবে ও বিষ্ণুপুর-সোনামুখী পিচ-রাস্তায় (শীতগ্রীষ্মে বাস চলে), বিষ্ণুপুরের ২১ মাইল (৩৪ কিলোমিটার) উত্তরে, সোনামুখী থানার সদর, সোনামুখী মিউনিসিপ্যাল শহর। খ্রীষ্টীয় সতের শতকে লিখিত জগন্মোহন পণ্ডিতের 'দেশাবলিবিবৃতি' গ্রন্থে (এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত এই

সংস্কৃত পুঁথিটিতে বর্ণিত বাংলাদেশের স্থানসমূহ সম্বন্ধে, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) সোনামুখীকে তাঁতিদের গ্রাম ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও সূতিবস্ত্র, রেশম, লাক্ষা ও নীলের ইলাহী কারবার হয়েছে এখানে। সেজন্য তন্তুবায় ও সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ই অতীতে এখানে সামাজিক নেতৃত্ব করেছেন ও স্থানীয় পুরাকীর্তিগুলির অধিকাংশ তাঁদেরই স্থাপিত। জনশ্রুতি, প্রাচীন গ্রামদেবী সুবর্ণমুখীর নামানুসারেই এ জনপদের নাম এবং কালাপাহাড় তাঁর নাক ভেঙে দিলেও, বর্গী অধিনায়ক ভাস্কর রাও ষোড়শোপচারে তাঁর পূজা দিয়েছিলেন। শহরের মধ্যস্থলে, ইটের এক দালান-মন্দিরে দেবীর সিন্দুরলিপ্ত পাথরের মূর্তি ও একটি উপবিষ্ট জৈন তীর্থংকর মূর্তি আজও দেখা যায়।

এখানকার শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি, বাজারপাড়ায় অবস্থিত, তাঁতি পরিবারের, ইটের, পশ্চিমমুখী, পঁচিশ-রত্ন, শ্রীধর (শালগ্রাম) মন্দির। এটিই বাঁকুড়া জেলার একমাত্র পঁচিশ-চূড়াযুক্ত দেবগৃহ। চারদিকে ত্রি-খিলান দালানযুক্ত এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট (৭·৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩ ফুট ৭ ইঞ্চি (৪·১ মিটার), এই ছোট আয়তনের দ্বিতল দেবালয়ের কেন্দ্রীয় চূড়া ছাড়া আর চব্বিশটি চূড়াকে, অভিনবভাবে, প্রতি তলের প্রতি কোণে তিনটি ক'রে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ঢাকা বারান্দাগুলির ছাদ 'ভল্ট' ও গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর স্থাপিত। পুবের দেওয়ালে নিবদ্ধ স্লেট পাথরের লিপিটি নিম্নরূপঃ "সকাব্দা ১৭৮৭ বাং ১২৫২ সাল···শ্রীধর মন্দিরং···পঞ্চবিংশতিচূড়কং কানাঞি রুদ্রদাসেন তন্তুবায়েন যত্নতঃ নির্মায়িতং বরং সৌধং নানা-চিত্রসমন্বিতং···হরি সূত্রধরেণ বিনির্মিতং।" বাংলাদেশে মন্দিরনির্মাণ-শিল্পে সূত্রধর সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সোনামুখীর এই মন্দির ও আকুই, কোতারপুর, বাঁকাদহ প্রভৃতি স্থানের কয়েকটি দেবালয় ছাড়া বাঁকুড়া জেলার আর কোথাও প্রতিষ্ঠালিপিতে তাঁদের নাম উল্লিখিত হয়নি যদিও মেদিনীপুর, হাওড়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার বহু ক্ষেত্রে এই শূদ্রবর্জনরীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। আলোচ্য মন্দিরের আসল বৈশিষ্ট্য কিন্তু তার 'টেরাকোটা' অলংকরনের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যে। এ মন্দিরের মত চারদিকের দেওয়ালে, এমন কি ঢাকা বারান্দার গায়েও, পোড়ামাটির সজ্জা বাঁকুড়া জেলার অল্প কয়েকটি মন্দিরে মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। বৈচিত্র্যের দিক

থেকেও এ দেবালয়ের অলংকরণ শীর্ষস্থানীয়; রামায়ণ মহাভারতের বিবিধ আলেখ্য ছাড়াও, কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক (শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব উপাসনানির্বিশেষে), সামাজিক, পশুপক্ষীচিত্র ও ফুলকারি নকশার অজস্র ব্যবহারে মন্দিরটিকে এক রত্নপেটিকার মত মনে হয়। কারিগরির ধরণ অবশ্য কিছুটা স্থূল ও পূর্বতন লালিত্যবর্জিত কেননা সেগুলি মাত্র ১২৫ বছরের পুরাতন। তবু 'টেরাকোটা' শিল্পীদের হাতে একই বিষয়বস্তুর চিত্রায়ণে যুগে যুগে যে পার্থক্য ঘটেছে তার তুলনামূলক সমীক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক এ মন্দিরের সজ্জা-প্রকরণ খুবই মূল্যবান উপাদান।

শ্রীধর মন্দিরের সামান্য দক্ষিণে, চন্দ্রপাড়ায়, চন্দ্র (গন্ধবণিক) পরিবারের ইটের, পুবমুখী, খাঁজকাটা-শিখরযুক্ত, দেউল শিবমন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট (৭.৫ মিটার), দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১২ ফুট ৬ ইঞ্চি (৩.৮ মিটার) ও একদুয়ারী গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর স্থাপিত। প্রবেশপথের ওপরে ও দু'পাশে রামায়ণ-কাহিনী, দশাবতার ও ফুলকারি নকশার, ভগ্ন হলেও বেশ ভাল, কিছু 'টেরাকোটা' অলংকরণ আছে। শহরের পুব প্রান্তে এক প্রাচীরঘেরা অঙ্গনমধ্যে, প্রথাগত স্থাপত্যরীতির, পশ্চিমমুখী এক ইটের গিরিগোবর্ধন মন্দির ও ১৭৫৭ শকাব্দে (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত, খাঁজকাটা-শিখরযুক্ত, পুবমুখী আর এক ইটের শিবমন্দির বিস্তারিত বিবরণের উপযুক্ত নয়। মনোহর দাসের দালান-মন্দিরটিরও স্থাপত্যভাস্কর্যগত কোন বৈশিষ্ট্য নেই, কিন্তু এই বৈষ্ণব সন্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন এমন লোক এ অঞ্চলে বিরল। জনশ্রুতি, মনোহর দাস নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এখানে বসতি স্থাপনের শুরুতে কৌপীনসম্বল এই সাধু স্থানীয় সমৃদ্ধ তন্তুবায় সম্প্রদায়ের কাছে একখণ্ড বস্ত্র চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। পরদিন প্রভাতে তাবৎ তাঁতিবাড়ির যন্ত্রপাতি ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যায়। অনুতপ্ত তাঁতিরা মনোহর দাসের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা চেয়ে বিপদ্‌মুক্ত হন ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেই থেকে সোনামুখীর তন্তুবায়দের অর্থানুকুল্যে মনোহর দাস বাবাজীর আখড়ায় সাড়ম্বরে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়ে আসছে। এই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতার নানা কিংবদন্তী এখনও এ অঞ্চলে শোনা যায়। মন্দিরে তাঁর কোন বিগ্রহ নেই; আছে তাঁরই ব্যবহৃত এক জোড়া খড়ম। তার চার পাশে এক-এক জোড়া ছোট খড়ম অর্ঘ্য দিয়ে ভক্তি নিবেদন করা এখানকার চিরকালের প্রথা।

সোমসার : বাঁকুড়া-বর্ধমান পিচ-রাস্তার (নিয়মিত বাস চলে) বাঁ পাশে (উত্তরে), ইঁদাস থানার অন্তর্গত মৌজা সোমসার (জে. এল. নং ২)। দামোদরতীরবর্তী এ পল্লীটি ইঁদাস থানার দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রাম ; প্রথমটি আকুই। মিশ্র (ব্রাহ্মণ) পরিবারের প্রতিষ্ঠিত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ সোমেশ্বর শিবের পুবমুখী, পঞ্চরথ-শিখর, পলস্তারা-আবৃত, ইটের দেউল মন্দিরটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার), দৈর্ঘ্যে ১৩ ফুট (৩·৯ মিটার) ও প্রস্থে ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি (৩·৭ মিটার), এ দেবালয়ের গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর স্থাপিত। অলংকরণ ও প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, স্থাপত্যপ্রকরণ ও লোকশ্রুতির নজিরে এটিকে আনুমানিক দেড় শ বছরের প্রাচীন মনে হয়। অন্য বৈশিষ্ট্য না থাকলেও সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে মন্দিরটি অবস্থিত। সামনেই সোনালী বালির বিস্তীর্ণ চড়ার মধ্য দিয়ে দামোদরের নীল ধারাটি দিগন্ত অবধি বিস্তৃত। মন্দিরের অদূরে, নদীর উঁচু পাড়ে, গাছতলায় রক্ষিত, পাথরের এক পূর্ণাঙ্গ বাসুদেবমূর্তি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। উচ্চতায় ২ ফুট ৭ ইঞ্চি (০·৮ মিটার) ও প্রস্থে ১ ফুট ৪ ইঞ্চি (০·৪ মিটার) এবং বর্তমানে চণ্ডী বলে উপাসিত, এ মূর্তির নিরেস কারিগরি থেকে সৈটিকে সেন-যুগের পরবর্তী কালের বলে মনে হয়। এ বিগ্রহের জন্য সোমসারে কখনও কোন মন্দির নির্মিত হয়েছিল এমন প্রমাণ নেই ; কোথা থেকে, কিভাবে এটি এখানে এসেছে সে বিষয়ে গ্রামবাসীরা কিছুই জানেন না। স্থানীয় মুখোপাধ্যায় বংশের জীর্ণ ভদ্রাসনের সংলগ্ন ও তাঁদেরই পূর্বপুরুষপ্রতিষ্ঠিত পাশাপাশি দু'টি একদুয়ারী, পুবমুখী, ইটের আটচালা শিবমন্দির গ্রামের অপর দ্রষ্টব্য। উচ্চতায় প্রায় ১৫ ফুট (৪·৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮ ফুট ২ ইঞ্চি (২·৫ মিটার), এই ছোট মন্দির দু'টির প্রবেশপথের ওপরে সাধারণ কারিগরির সামান্য কিছু 'টেরাকোটা' অলংকরণ আছে। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ দেবালয় দু'টি বড় শিবমন্দিরটির সমসাময়িক হতে পারে।

হদল-নারায়ণপুর : পাত্রসায়ের থানার উত্তর প্রান্তে, দামোদরের শাখানদী বোদাই-এর দক্ষিণ তীরে, হদল (জে. এল. নং ২৩) ও নারায়ণপুর (জে. এল. নং ৭) পাশাপাশি দুই পৃথক্ মৌজা হলেও, গ্রাম দু'টির নিকট অবস্থিতির জন্য তারা এই যৌথ নামেই পরিচিত। এখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ 'রামপুর' নিবন্ধে দেওয়া হয়েছে। মণ্ডল উপাধিধারী ভূতপূর্ব জমিদার পরিবারের তিন তরফের প্রতিষ্ঠিত

কয়েকটি 'টেরাকোটা' মন্দির এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। এ পরিবারের মুচিরাম ঘোষ মল্লরাজ গোপাল সিংহের আমলে (১৭২০-১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ) প্রাক্তন নিবাস নীলপুর থেকে উঠে এসে এখানে বসতি করেন। গোপাল সিংহের সভাসদ্ ও সংলগ্ন গ্রাম রামপুরের অধিবাসী শুভঙ্কর দাস ('শুভঙ্কর দাঁড়া ও খাল' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) তাঁকে মল্ল দরবারে পরিচয় করিয়ে দিলে, নিজ কৃতিত্বে অল্পকালের মধ্যেই তিনি এ অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত হন ও 'মণ্ডল' উপাধি লাভ করেন। পরে, বিস্তীর্ণ জমিদারির অধিকারী হয়ে নীলের কারবারেও এ পরিবার প্রভূত ধন-সঞ্চয় করেন। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তিগুলি সে ঐশ্বর্যেরই ফলশ্রুতি।

গ্রামে ঢুকতেই, পথের বাঁ পাশে যে পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন মন্দির ও ব্রহ্মানী দেবীর দালান-মন্দিরটি দেখা যায়, তাদের সঙ্গে অবশ্য মণ্ডল পরিবারের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। সামান্য অলংকরণযুক্ত, পশ্চিম-মুখী, আংশিক ভগ্ন, রত্ন-মন্দিরটি এক সময়ে হয়ত পরিচ্ছন্ন এক ইমারত ছিল কিন্তু বর্তমান জীর্ণ অবস্থায় তার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মানী দেবীর পুবমুখী আধুনিক দালান-মন্দিরটিও স্থাপত্যের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর কিন্তু এ বিগ্রহের মত বৃহৎ ও সুন্দর হিন্দু পৌরাণিক ভাস্কর্য বাঁকুড়া জেলায় আর আছে কিনা সন্দেহ। অগ্নিভয়হারিণীজ্ঞানে উপাসিতা, কষ্টিপাথরের এ পাল-ভাস্কর্যটির উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি (১·৭ মিটার) ও প্রস্থ ২ ফুট ১১ ইঞ্চি (০·৯ মিটার)। মূর্তিটির পাদপীঠে, দুই পাশে ও পিছনের ত্রি-পত্রাকৃতি খিলানের গায়ে পাঁচটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের অনুকৃতি থেকে তাঁকে 'পঞ্চকুণ্ডাগ্নিমধ্যস্থা' পার্বতী বলে সনাক্ত করা চলে। এ মন্দিরে রক্ষিত ৯ ইঞ্চি (২৩ সেন্টিমিটার) উচ্চতার ও ৫ ইঞ্চি (১৩ সেন্টিমিটার) প্রস্থের, পাথরের যক্ষ-যক্ষিনী মূর্তিটির কারিগরিও মন্দ নয়। এই মূল্যবান পুরাবস্তুগুলির পূর্ব-ইতিহাস সম্পর্কে স্থানীয় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। কিংবদন্তী অনুসারে, এ গ্রামের প্রথম বাসিন্দা জনৈক 'মুড়োকাটা' চক্রবর্তী। অরণ্যাবৃত এ অঞ্চলে গাছের 'মুড়ো' কেটে তিনি বসতি স্থাপন করেন বলে তাঁর এই নাম। স্বপ্নাদেশে তাঁর বিধবা কন্যা অদূরবর্তী দামোদরের এক গভীর দহ থেকে মূর্তিটি আবিষ্কার করেন। উদ্ধারকালে দহের গভীর জল নাকি হাঁটুজলে পরিণত হয় ও সাতটি কুমারী মেয়ে অবলীলাক্রমে মূর্তিটি বহন ক'রে আনে। পরে, মন্দিরের জন্য নির্বাচিত স্থানে বিগ্রহটি স্থানান্তরিত করবার বিফল চেষ্টা হলে পুনরায় স্বপ্নাদেশে জানা যায় যে সেখানেই মাটির নীচে দেবীর ভৈরব

অনাদিলিঙ্গ নারায়ণেশ্বর শিব শায়িত আছেন। এই শিবের নামেই নারায়ণপুর গ্রামের নাম।

ব্রহ্মাণী মন্দিরের কিছু উত্তরে, মণ্ডলদের ছোট তরফের ভদ্রাসন। বাড়ির প্রাঙ্গনে, দক্ষিণমুখী, নবরত্ন মন্দিরটির চেহারায় যে গীর্জার কিছু আদল দেখা যায় তা অভিনব। উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০·৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি (৫ মিটার), সামনে ত্রি-খিলান দালানযুক্ত এ দেবালয়ের গর্ভগৃহের দেওয়াল, অপ্রত্যাশিতভাবে, বাইরের দিকে আটকোণা ও ভেতরের দিকে চারকোণা। দালানের ছাদ 'ভল্ট্' ও প্রান্তীয় ছোট গম্বুজের ও গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর স্থাপিত। পশ্চিম দিকের দেওয়াল ঘেঁষে ওপরে যাবার সিঁড়ি আছে। পর পর ঘোড়া, সওয়ার, হাতি, সিংহ প্রভৃতি বসানো 'মৃত্যুলতা' দেওয়ালের কোণে বা গায়ে খাড়া ক'রে লাগানোই সর্বত্র-প্রচলিত রীতি ; এখানে কিন্তু সেগুলি প্রতি কোণের দু'পাশে সমতলভাবে নিবদ্ধ। দক্ষিণ ও পশ্চিমের দেওয়ালে কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক, সামাজিক ও ফুলকারি বিষয়বস্তুর প্রচুর 'টেরাকোটা' সজ্জা কারিগরিতেও বেশ উচ্চ শ্রেণীর। কেন্দ্রীয় খিলানশীর্ষে অর্জুনের লক্ষ্যভেদের বড় প্যানেলটিও অভিনব কেননা এহেন পুরোবর্তী স্থানে মহাভারতের কাহিনী এত লক্ষণীয়ভাবে আর কোথাও উৎকীর্ণ হয়েছে কিনা সন্দেহ। পারিবারিক শ্রুতি অনুসারে, প্রায় ১৬০ বছর আগে বাবুরাম মণ্ডল তাঁর নাবালক পুত্র গঙ্গাগোবিন্দের নামে প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ছোট তরফের বসতবাটির উত্তরে, দক্ষিণমুখী, নবরত্ন, দামোদর (শালগ্রাম) মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট (৭·৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৩ ফুট ৮ ইঞ্চি (৪·১ মিটার)। ত্রি-খিলান দালানযুক্ত এ দেবালয়ের সামনের বারান্দার ছাদ 'ভল্ট্' ও একজোড়া প্রান্তীয় গম্বুজ ও গর্ভগৃহের ছাদ দু'জোড়া পাশ-খিলানশীর্ষে স্থাপিত গম্বুজের ওপর রক্ষিত। 'টেরাকোটা' অলংকরণ কেবল সামনের দেওয়ালের খিলানগুলির ওপর নিবদ্ধ। সেখানে বড় বড় টালি দিয়ে গঠিত অনন্তশায়িন্ বিষ্ণু, লঙ্কাযুদ্ধ ও ভীষ্মের শরশয্যার ভাস্কর্যগুলি বেশ সুন্দর। এগুলিতে একদা রঙের প্রলেপ লাগানো হয়েছিল দেখা যায়। পাশেই ত্রি-খিলান দালানযুক্ত, পুবমুখী, পরিত্যক্ত, আটচালা মন্দিরের খিলানশীর্ষের রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা ও ফুলকারি নকশাগুলি বড় বড় টালির সমবায়ে গঠিত ও প্রশংসনীয় কারিগরির। এ দু'টি

দেবালয়ের সামান্য উত্তর-পশ্চিমে, ভগ্ন, পরিত্যক্ত, দক্ষিণমুখী, দোতলা দালান-মন্দিরটি স্থানীয় লোকের কাছে 'চব্বিশ-কুঠরি ঘর' নামে পরিচিত যার ভেতরে ঢুকলে বা'র হওয়া কঠিন। জনশ্রুতি, বর্গীর হাঙ্গামার সময় এখানকার ভূগর্ভস্থ কামরায় যে প্রচুর ধনরত্ন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, অশরীরী যক্ষের পাহারায় আজও নাকি তা সেখানেই আছে। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ তিনটি মন্দির আকারপ্রকারে দেড় শ থেকে দু'শ বছরের প্রাচীন মনে হয়।

গ্রামের প্রধান পথ ধ'রে আর একটু উত্তরে গেলে, বাঁ দিকে, বাড়িঘরের পিছনে, মেজ তরফের পুবমুখী, নবরত্ন, রাধাদামোদর (শালগ্রাম) মন্দিরে পৌঁছনো যায়। উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০'৫ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭ ফুট (৫'১ মিটার), এ দেবালয়ের পুব ও উত্তর দিকের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভলট্' ও গর্ভগৃহের ছাদ দু'জোড়া পাশ-খিলানশীর্ষে গম্বুজের ওপর স্থাপিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে আরও যে দু'টি বন্ধ ঢাকা বারান্দা আছে, তাদের প্রথমটি থেকে ওপরে যাবার সিঁড়ি উঠে গেছে। 'টেরাকোটা' অলংকরণের উৎকর্ষে এ মন্দির বাঁকুড়া জেলার অনুরূপ শ্রেষ্ঠ দেবালয়গুলির সঙ্গে উপমিত হতে পারে। পুব ও উত্তর দিকের সামনের দেওয়াল রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক, সামাজিক, লৌকিক দেবদেবী প্রভৃতি বিষয়বস্তুর অজস্র রূপায়ণে আচ্ছাদিত। এদের মধ্যে পুব দিকের খিলানশীর্ষে কৃষ্ণের চূড়াবাঁধা, অনন্তশায়িন্ বিষ্ণু, লঙ্কাযুদ্ধ ও ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গের ভাস্কর্যগুলি প্রথম শ্রেণীর।

গ্রামের উত্তর প্রান্তে, বড় তরফের প্রাসাদোপম দোতলা অট্টালিকাটিকেও পুরাকীর্তি বলা চলে। বস্তুতঃ, পশ্চিমবঙ্গের দূর গ্রামাঞ্চলে এহেন সাত-মহলা বিরাট বসতবাড়ি খুব কমই দেখা যায়। সামনের প্রাঙ্গনে সতের চূড়াবিশিষ্ট, আটকোণা, দ্বিতল রাসমঞ্চটি জেলার এজাতীয় ইমারতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। প্রতি তলের প্রতি কোণায় একটি ক'রে ও কেন্দ্রীয় আর একটি খাঁজকাটা চূড়ার সমবায়ে গঠিত এ দেবসৌধের উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট (১২ মিটার) ও ভিত্তি-বরাবর প্রতি দিকের দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি (২'৫ মিটার)। একতলার আটটি খিলানশীর্ষে অনন্তশায়িন্ বিষ্ণু, গজলক্ষ্মী, কৃষ্ণরাধিকা, রামসীতা, পুত্রকন্যাসমেত মহিষমর্দিনী দুর্গা, শিব-বিবাহ, গোষ্ঠলীলা ও শিব-নন্দী-ভৃঙ্গীর 'টেরাকোটা' ভাস্কর্যগুলি বেশ সুন্দর। রাসের সময় গ্রামের তাবৎ শালগ্রামশিলাকে তিনদিন ধ'রে এখানে রাখবার প্রথাটি বহুদিনের।

বড় তরফের ভিতর-বাড়ির অঙ্গনে, দক্ষিণমুখী, পঞ্চরত্ন, রাধাদামোদর (শালগ্রাম) মন্দিরটি কিন্তু স্থাপত্যভাস্কর্যে সাধারণ শ্রেণীর। উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার) ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি (৪·৪ মিটার), এ দেবালয়ের সামনের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট' ও গর্ভগৃহের ছাদ পাশ-খিলানশীর্ষে স্থাপিত গম্বুজের ওপর রক্ষিত। হদল-নারায়ণপুরে এটিই একমাত্র প্রতিষ্ঠালিপিযুক্ত মন্দির। সে লিপি থেকে দেখা যায়, এটি ১৭২৮ শকাব্দে (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত। 'টেরাকোটা' অলংকরণগুলি এমনিতেই খুব উচ্চাঙ্গের ছিল না, তদুপরি, সংস্কারের সময় গোলাপী প্রলেপ লাগিয়ে সেগুলির আরও সৌন্দর্যহানি করা হয়েছে। ১২৬১ বঙ্গাব্দে (১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে) ৺শিবনারায়ণ মণ্ডল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পিতলের রথটিও পুরাকীর্তি হিসাবে গণ্য। প্রায় ১০ ফুট (৩ মিটার) উচ্চতার এই নবরত্ন রথটির গায়ে মাঝারি কারিগরির দশাবতার, পৌরাণিক ও সামাজিক বিষয়ে নানা চিত্র উৎকীর্ণ আছে।

হরিহরপুর : ওঁদা থানার উত্তর প্রান্তের গ্রাম হরিহরপুরে পৌঁছবার পথনির্দেশ 'এল্যাটি' নিবন্ধে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ইটের অজস্র টুকরো-ছড়ানো বেশ বড় আয়তনের এক ঢিবির ওপর, উত্তরমুখী, চারচালা, ইটের শিবমন্দিরটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার), দৈর্ঘ্যে ১৬ ফুট ২ ইঞ্চি (৪·৯ মিটার) ও প্রস্থে ১৫ ফুট ৭ ইঞ্চি (৪·৭ মিটার), এই একদুয়ারী, অলংকরণবিহীন মন্দিরের সামনে, পরবর্তীকালে, সমতল ছাদের এক দালান সংযুক্ত হয়েছে। গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের ওপর স্থাপিত। পঞ্চমুখী শিবলিঙ্গটির মাথার দিকে যে গর্ত দেখা যায় সে সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সেখানে নাকি বৃহদায়তন এক মণি বসানো ছিল যার দৈনিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঢিবি ও মন্দিরটিও বাড়ত। বহুদিন আগে, এক সন্ন্যাসী সে মণি চুরি ক'রে পালাবার পর থেকে এই অলৌকিক ঘটনা নাকি বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দিরের বাঁধানো চাতালের পুব অংশে, খোলা জায়গায়, বেদীর উপরে, প্রায় আড়াই ফুট (·৮ মিটার) উচ্চতার পাথরের এক গণেশমূর্তি দেখা যায়। তার চারদিকে হাজার হাজার মাটির মানতের ঘোড়া। ক্ষয়িত ও সিন্দুরলিপ্ত এ মূর্তিটির পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু না জানা গেলেও ইনি যে এখন এক প্রতাপশালী লৌকিক দেবতায় পরিণত হয়েছেন তা মানতের ঘোড়ার সংখ্যা থেকেই প্রকাশ।

হরিহরপুর থেকে এক মাইল (১'৬ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে বীরসিংহপুর-রাজহাট গ্রামে (জে. এল. নং ৯৭) বহু সূর্য-উপাসক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের বাস। তাঁদের সামাজিক ইতিহাস ও সূর্য উপাসনার রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ অনুসন্ধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

হাড়মাসড়াঃ বাঁকুড়া-তালডাংরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), বাঁকুড়ার প্রায় ১০ মাইল (১৬ কিলোমিটার) দক্ষিণে শিবডাঙ্গার মোড় থেকে ডান-হাতি পিচের রাস্তায় ৫ মাইল (৮ কিলোমিটার) দূরের বিবর্দা গ্রাম পার হয়ে, বাঁ-হাতি মোরামের রাস্তায় আরও ৪½ মাইল (৭'২ কিলোমিটার) গেলে, তালডাংরা থানার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত হাড়মাসড়া গ্রাম (জে. এল. নং ২৮)। মাকড়া-পাথরে নির্মিত, উড়িষ্যা-শৈলীর, পরিত্যক্ত এক পঞ্চরথ, শিখর-দেউল ও তার কাছেই ৫৮×২৮ ইঞ্চি (১'৫×০'৭ মিটার) উচ্চতা ও প্রস্থের পাথরের এক পার্শ্বনাথ মূর্তি ঐখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। পাশের পুকুর থেকে পাওয়া এ মূর্তিটির পাদপীঠের পঞ্চরথ বিন্যাস দেখে মনে হয়, এ বিগ্রহের জন্যই হয়ত খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক কি তারও আগে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬ মিটার), দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি (২'৩ মিটার*) ও প্রস্থে ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি (২ মিটার), পুবমুখী এ দেবালয়ের ছাদ ধাপযুক্ত চারটি চালের ওপর রক্ষিত। সামনে যে ছোট একটি মুখমণ্ডপ ছিল তার ভিত্তির চিহ্ন ছাড়া এখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আমলক ও শিখরের কিছু অংশ ভেঙে পড়ায় এ মূল্যবান পুরাকীর্তিটি এখন ধ্বংসের পথে।

এ গ্রন্থের 'ভূমিকা' অধ্যায়ে মানভূম-সিংভূম-হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে নদীপথবাহিত জৈনধর্ম দূর অতীতে কিভাবে অব্যবহিত পূর্বের বাঁকুড়া এলাকায় প্রবেশ করেছিল, সেকথা সবিস্তারে বলেছি। শিলাবতীর গতিপথের সামান্য উত্তরে, আজকের হাড়মাসড়া গ্রামে যে একদা এহেন এক জৈন ধর্মকেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছিল, আলোচ্য পুরাকীর্তিগুলি তার 'পাথুরে প্রমাণ'। জনশ্রুতি, পুরাকালে, অলৌকিক শক্তিশালী এক সন্ন্যাসী নাকি এক রাত্রির মধ্যে এটি নির্মাণ করেন। ভাঙা অংশগুলি দেখিয়ে গ্রামবাসীরা সখেদে বলেন, কাজ শেষ হবার পূর্বমুহূর্তে এক মোরগ ডেকে ওঠায় তিনি সেগুলি সম্পূর্ণ করবার সময় পাননি। নির্মাতার স্মৃতির উদ্দেশে পরিত্যক্ত মন্দিরে আজও যে পূজা দেওয়া হয় তাতে—আশ্চর্যের কথা— যাজন করেন হাড়ি সম্প্রদায়ের এক পুরোহিত।

বৈদ্যপ্রধান হাড়মাসড়া গ্রামে বহু সম্পন্ন গৃহস্থের অনেকদিনের বাস। তাঁদের পূর্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি ছোটবড় ইটের মন্দির গ্রামের ইতস্ততঃ দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে রায়পাড়ায় রায় (বৈদ্য) পরিবারের প্রতিষ্ঠিত, সামান্য 'টেরাকোটা'যুক্ত, দক্ষিণমুখী, লক্ষ্মী-জনার্দনের (শালগ্রাম) দালান-মন্দির ; বৈদ্যপাড়ায় একই পরিবারের দক্ষিণমুখী, 'টেরাকোটা'সজ্জিত, নবরত্ন রাসমঞ্চ ও পাঁচঘরিয়া (বৈদ্য) পরিবারের দক্ষিণমুখী, 'টেরাকোটা'অলংকৃত লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দির উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

ও'ম্যালী, এল. এস. এস. — বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, বাঁকুড়া: কলিকাতা, ১৯০৮।

জেকবি, এইচ. — সেক্রেড বুকস অব দি ইস্ট, খণ্ড-২২ : লণ্ডন।

দাস, হরিদাস — মধ্যযুগীয় গৌড়ীয় সাহিত্যের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অভিধান : নবদ্বীপ, ৪৬৫ শ্রীগৌড়াব্দ।

দাসগুপ্ত, শশিভূষণ — ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য : কলিকাতা; ভাদ্র, ১৩৬৭।

দীক্ষিত, কে. এন. — 'দি আইডেন্টিফিকেসন অব পুষ্করণা মেন্সনড ইন দি শুশুনিয়া ইনক্রিপশন অব চন্দ্রবর্মা' (প্রবন্ধ): 'অ্যানুয়্যাল রিপোর্ট অব দি আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া (১৯২৭-২৮): দিল্লী, ১৯৩১।

পাণ্ডে, এইচ. — অ্যানুয়্যাল রিপোর্ট অব দি সুপারিণ্টেডেণ্ট, ইস্টার্ন সার্কল, আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে, ১৯১৬-১৭ : কলিকাতা, ১৯১৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার — বাঁকুড়ার মন্দির : কলিকাতা, ১৩৭১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস — ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মিডিভ্যাল স্কাল্প্চার: দিল্লী, ১৯৩৩।

বসু, নির্মলকুমার — 'মানভূম জেলার মন্দির' (প্রবন্ধ): প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪০।

বসু, নগেন্দ্রনাথ — 'মহারাজা চন্দ্রবর্মা' (প্রবন্ধ): বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, তৃতীয় খণ্ড।

বাগচী, প্রবোধচন্দ্র — 'বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ' (প্রবন্ধ): বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা; প্রথম খণ্ড, ১৩৪৬।

বেগলার, জে. ডি. — 'রিপোর্ট অব এ টুর থ্রু বেঙ্গল প্রভিন্সেস্ ইন ১৮৭২-৭৩' (বিবরণী): আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া রিপোর্টের অষ্টম খণ্ডে মুদ্রিত: কলিকাতা, ১৮৭৮।

ব্যানার্জি, অমিয়কুমার — বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার: কলিকাতা, ১৯৬৮।

ব্লক, টি. — অ্যানুয়্যাল রিপোর্ট অব দি আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে, বেঙ্গল সার্কল: কলিকাতা, ১৯০৩।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র — 'দেশাবলিবিবৃতি' (প্রবন্ধ) : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম-২য় সংখ্যা, ১৩৫৫। কলিকাতা।

মজুমদার, আর. সি. এবং পুসালকর, এ. ডি. — হিস্ট্রি অ্যাণ্ড্ কালচার অব ইণ্ডিয়ান পিপল্ : স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার : বোম্বাই, ১৯৫৭।

ম্যাক্‌কাচ্চন, ডেভিড — 'নোটস্ অন সাম টেম্পল্‌স্ অব বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট' (প্রবন্ধ) : ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক, বাঁকুড়া : কলিকাতা, ১৯৬১।

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ — 'কেতুগ্রামের কবি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (প্রবন্ধ) : বিশ্বভারতী পত্রিকা ; শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৫।

সাঁতরা, তারাপদ — 'বাংলার মন্দির : মন্দিরগড়া স্থপতিদের ঠিকানা' (প্রবন্ধ) : চতুষ্কোণ মাসিক পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৩৭৬।

স্পুনার, ডি. বি. — অ্যানুয়্যাল রিপোর্ট অব দি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ইস্টার্ন সার্কল, আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে, ১৯১০-১১ : কলিকাতা, ১৯১১।

হাণ্টার, ডব্লু. ডব্লু. — এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল, ভল্যুম-৪ (বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান) : লণ্ডন, ১৮৭৬।

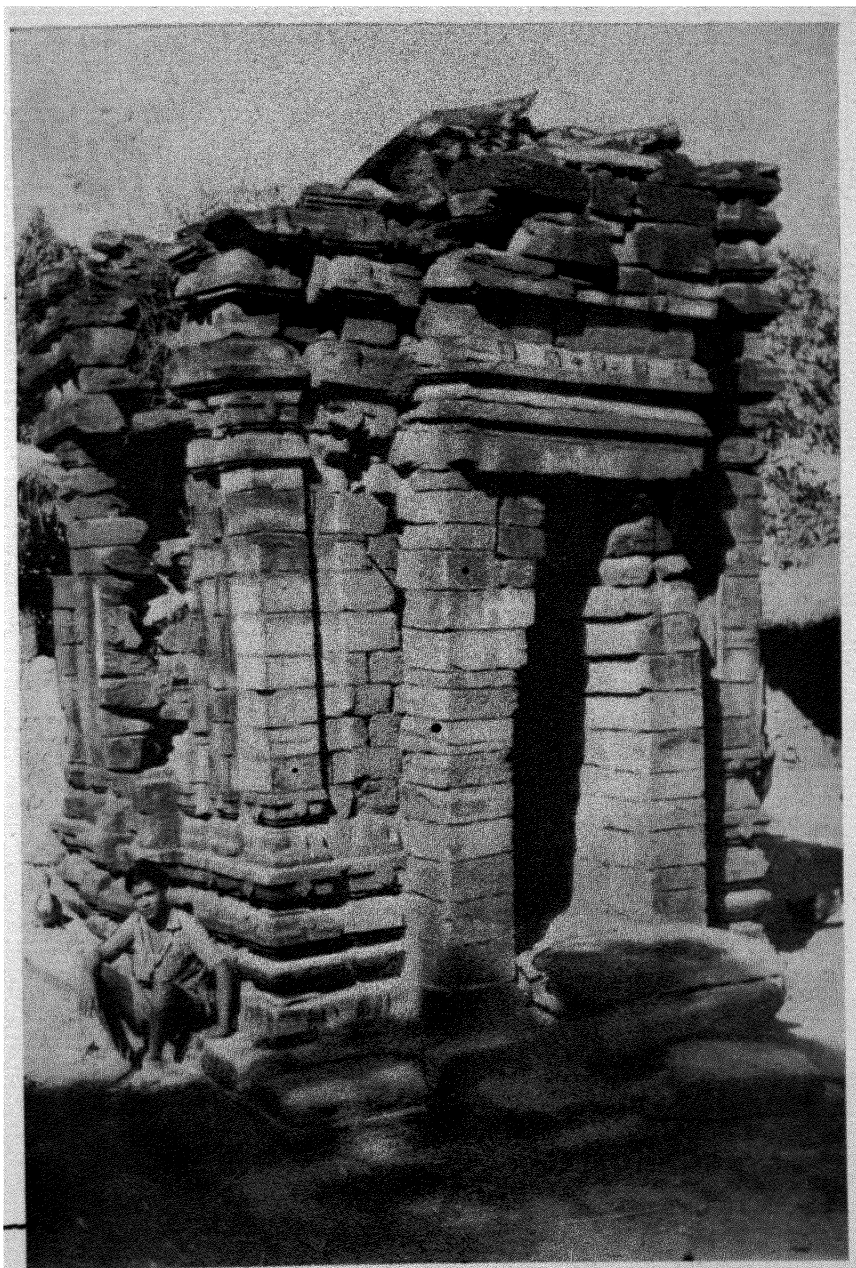
হীরাকুমারী — আচারাঙ্গ সূত্র (বাংলা অনুবাদ) : শ্বেতাম্বর জৈন মহামণ্ডল, কলিকাতা।

অনুক্রমণিকা*

* স্থানবাচক নামগুলি পৃষ্ঠা উল্লেখ ক'রে সূচীপত্রে দেখানো হয়েছে ব'লে অনুক্রমণিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

আলোকচিত্র

[পরবর্তী আলোকচিত্রগুলি শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্তৃক গৃহীত। দু [illegible] [illegible] শি[illegible]
পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের শ্রীঅমিয়কুমার সে[illegible]
একটির সর্বস্বত্ব যথাক্রমে শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ও পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

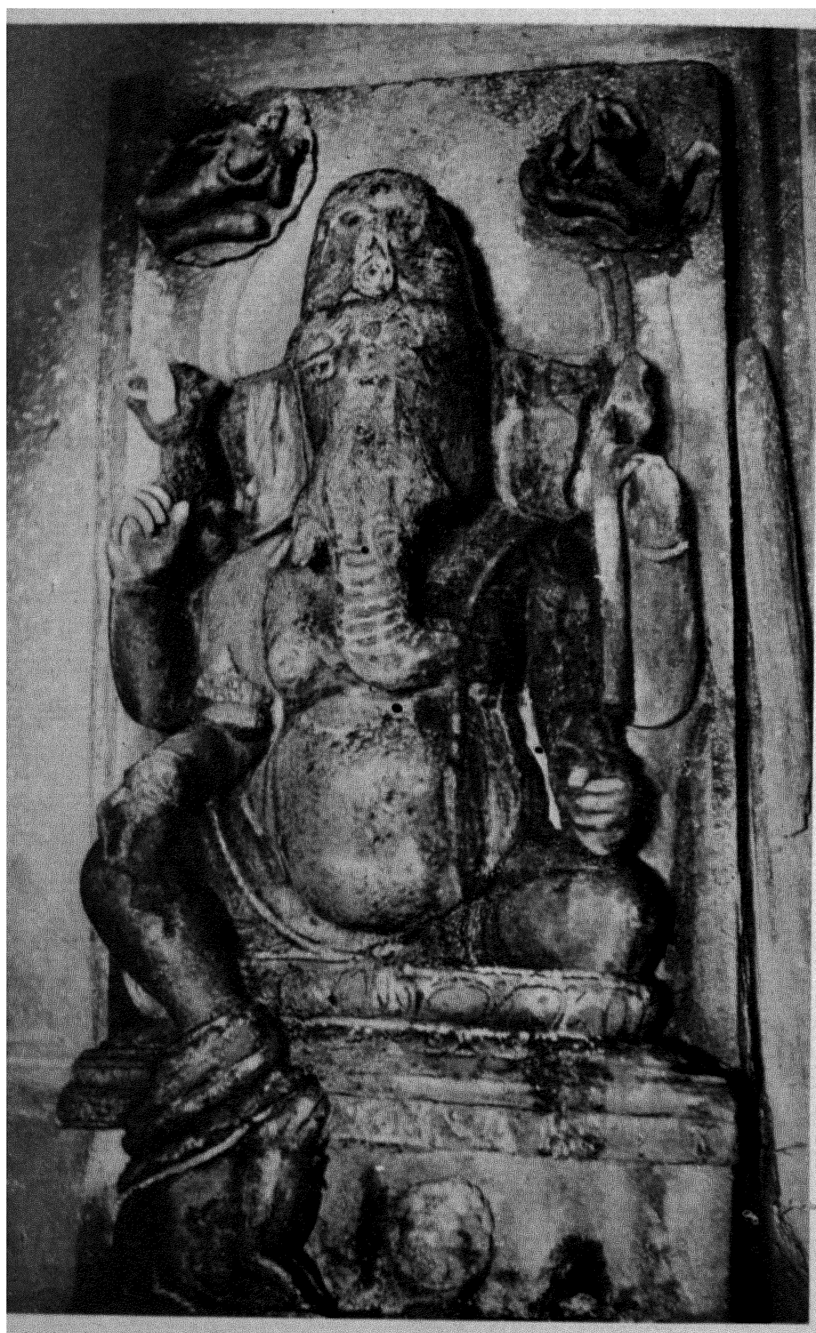


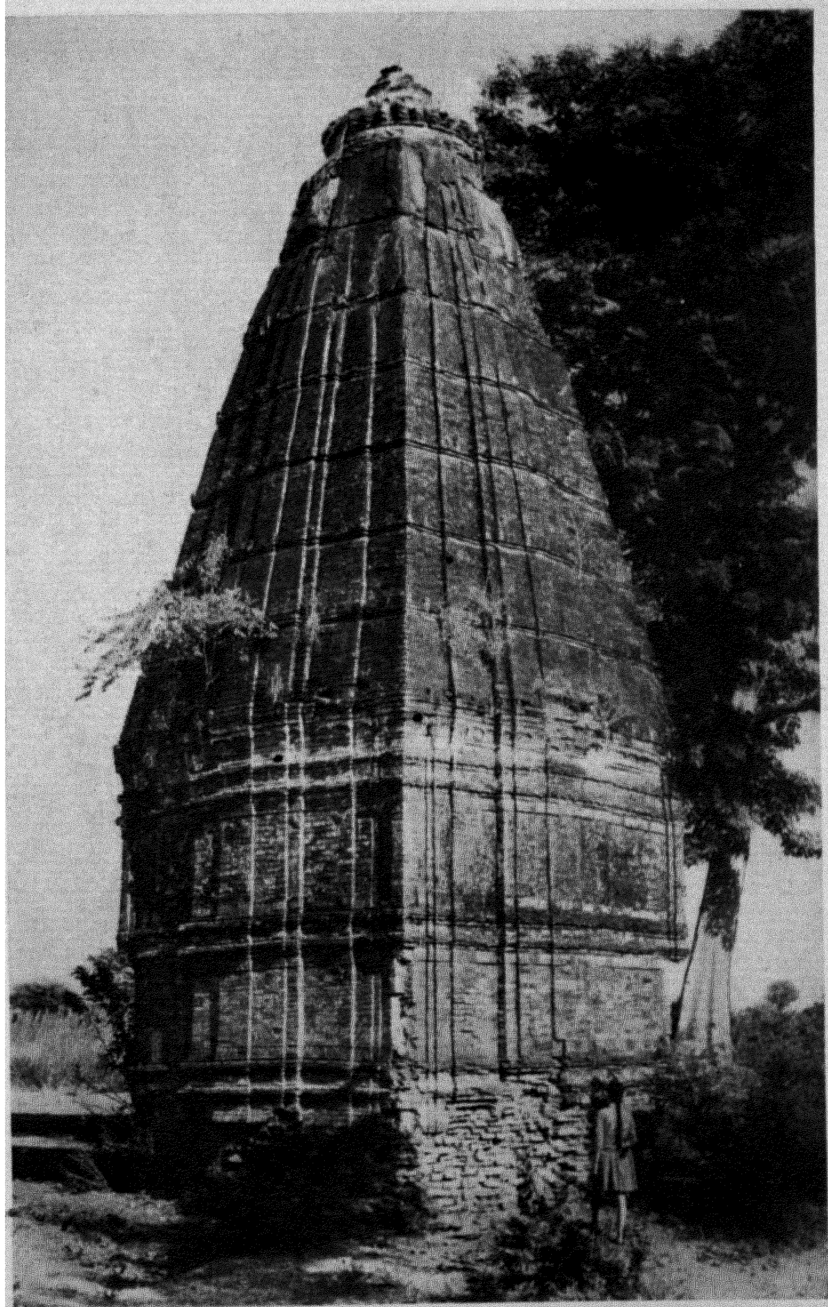
প্রাক্-মুসলিম যুগের পাথরের দেউল : অম্বিকানগর (পৃঃ ৩১)



প্রাক্-মুসলিম যুগের পাথরের দেউল : আটবাইচণ্ডী (পৃঃ ৩৩-৩৪)







মল্ল আমলের বিশিষ্টগঠন ইটের দেউল : এল্যাটি (পৃঃ ৩৭)





'ষড়চক্রবাহিনী' জ্ঞানে উপাসিত পাথরের নটরাজমূর্তি : কান্তোড় (পৃঃ ৩৮-৩৯)



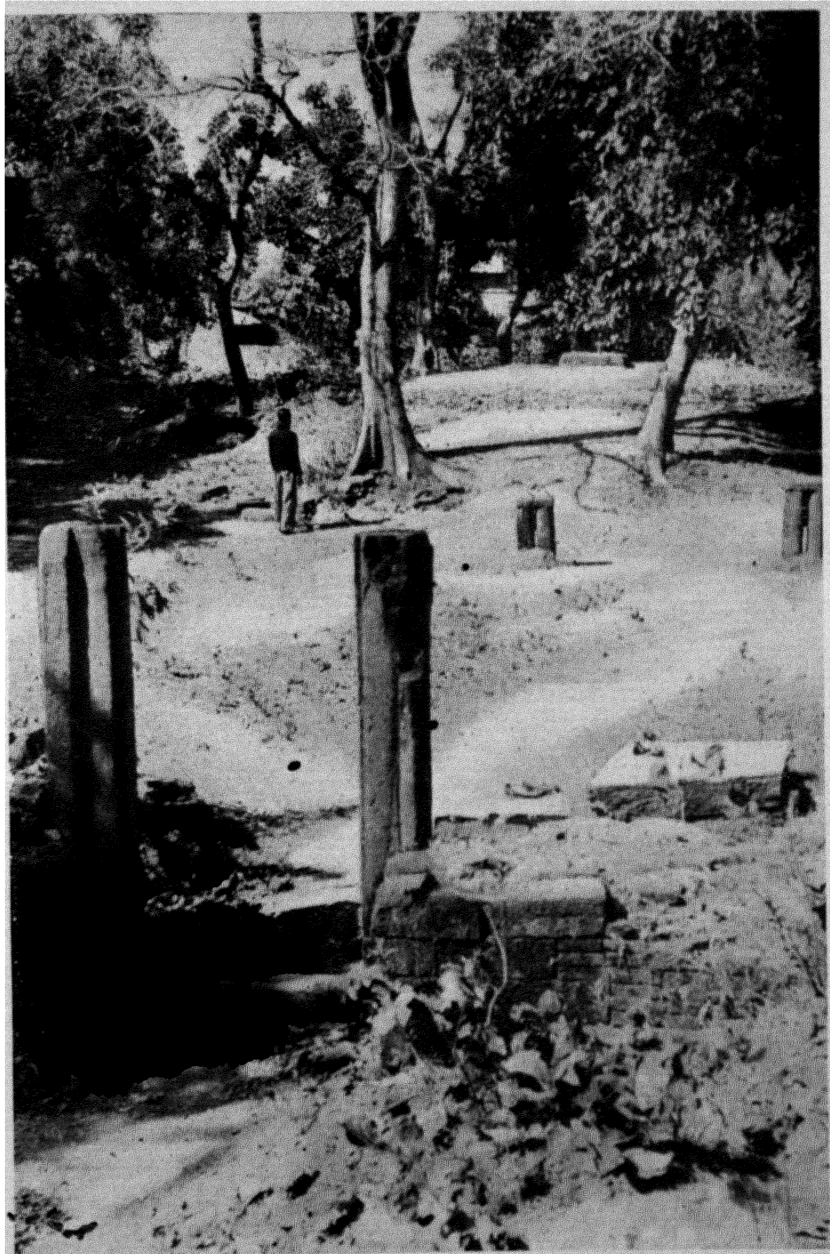




মল্ল আমলের পাথরের পঞ্চরত্ন মন্দির : গোকুলনগর; ওই মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ



গোকুলনগর মন্দিরের অদূরে 'ক্লোরাইট'-পাথরের বিশাল বরাহমূর্তি (পৃঃ ৪৪)



ছাতনার পুরাক্ষেত্রের সাধারণ দৃশ্য (পৃঃ ৪৫-৪৬)

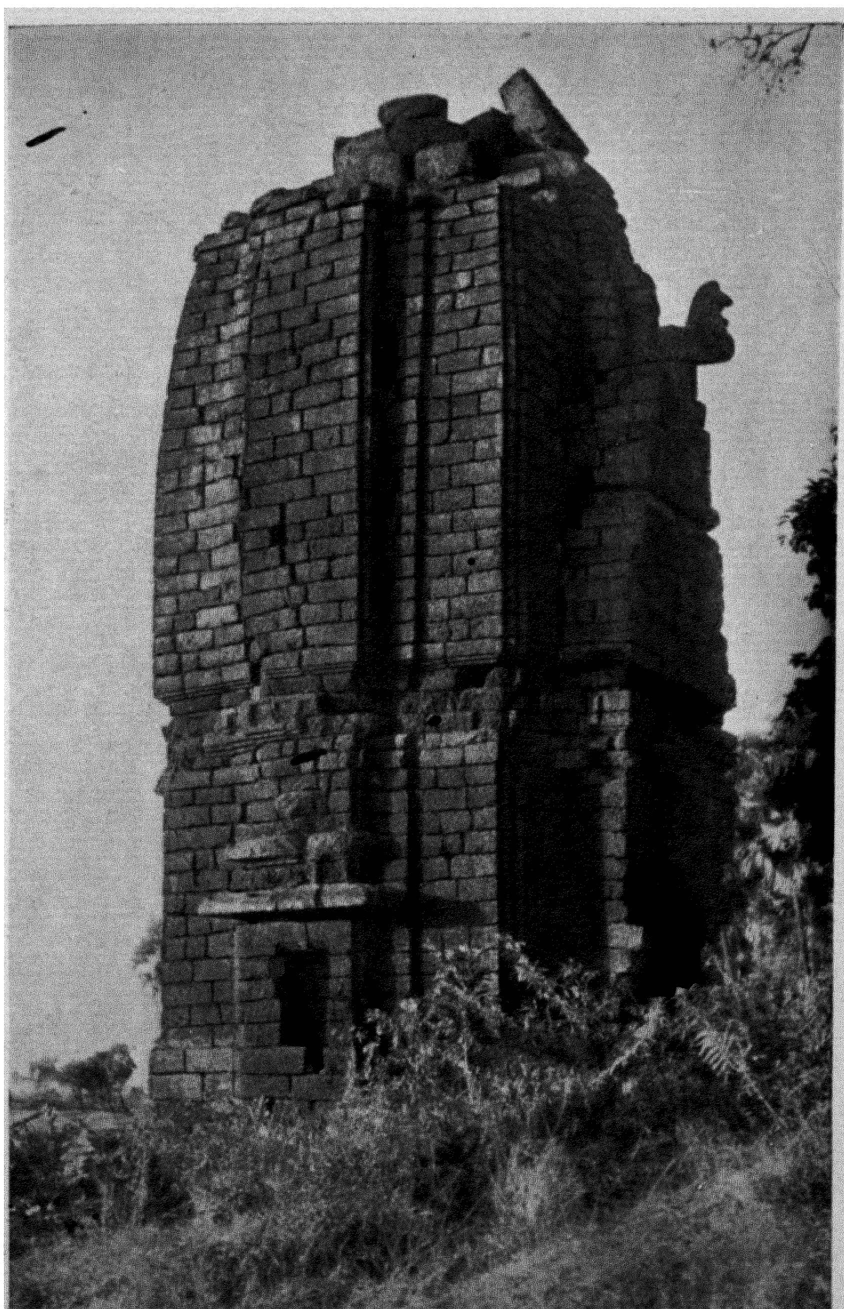


জগন্নাথপুরের পাথরের শিব-মন্দির (পৃঃ ৪৭)

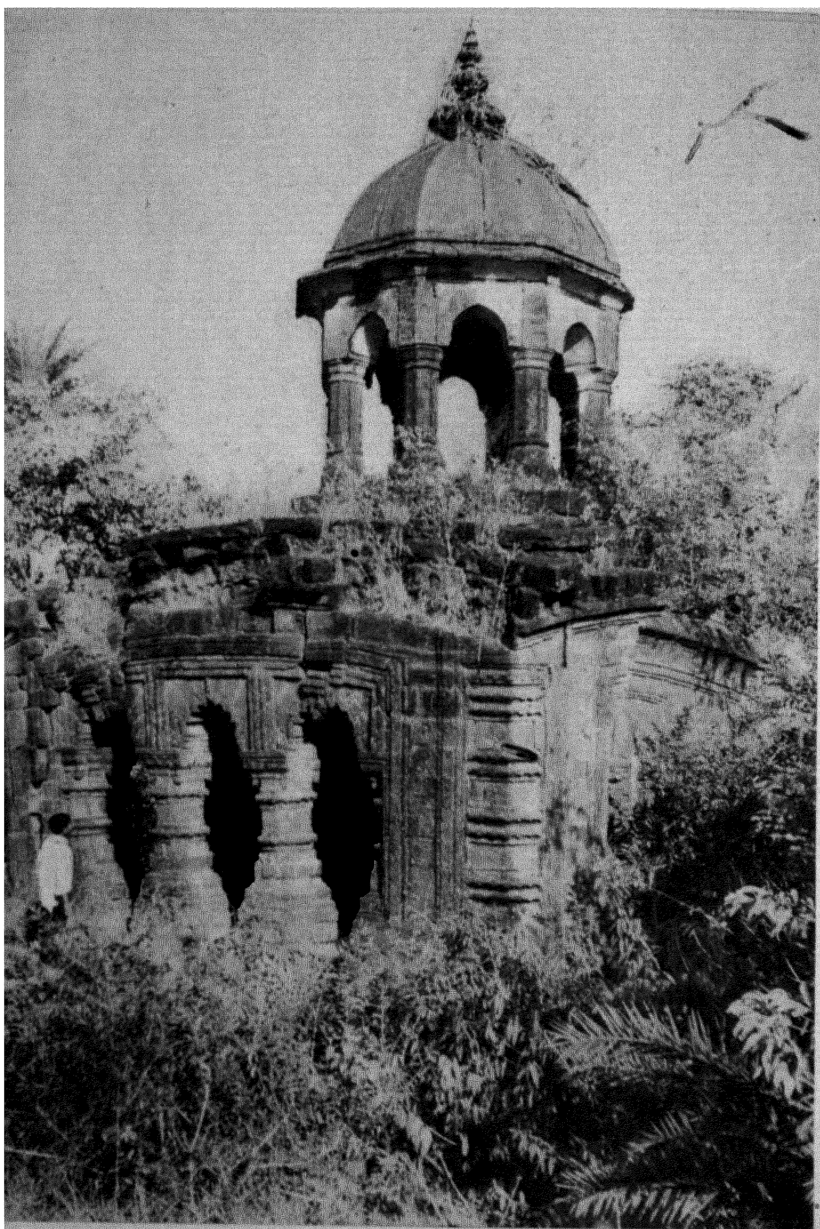


পাথরের ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিব-মন্দির : ডিহর (পৃঃ ৫২-৫৩)





খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পাথরের দেউল : দেউলভিড়্যা (পৃঃ ৫৫-৫৭)



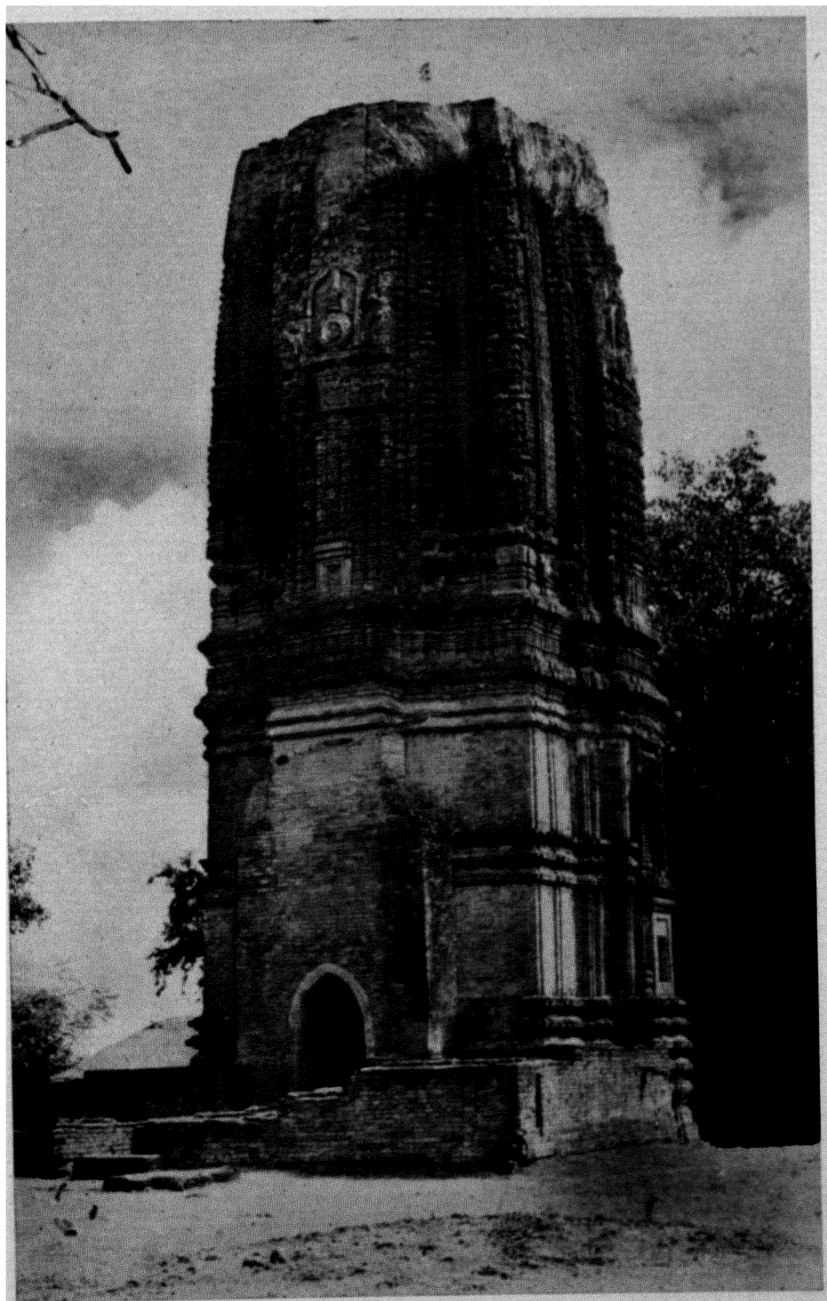
মল্ল আমলের পাথরের একরত্ন মন্দির : দ্বাদশবাড়ি (পৃঃ ৫৯)



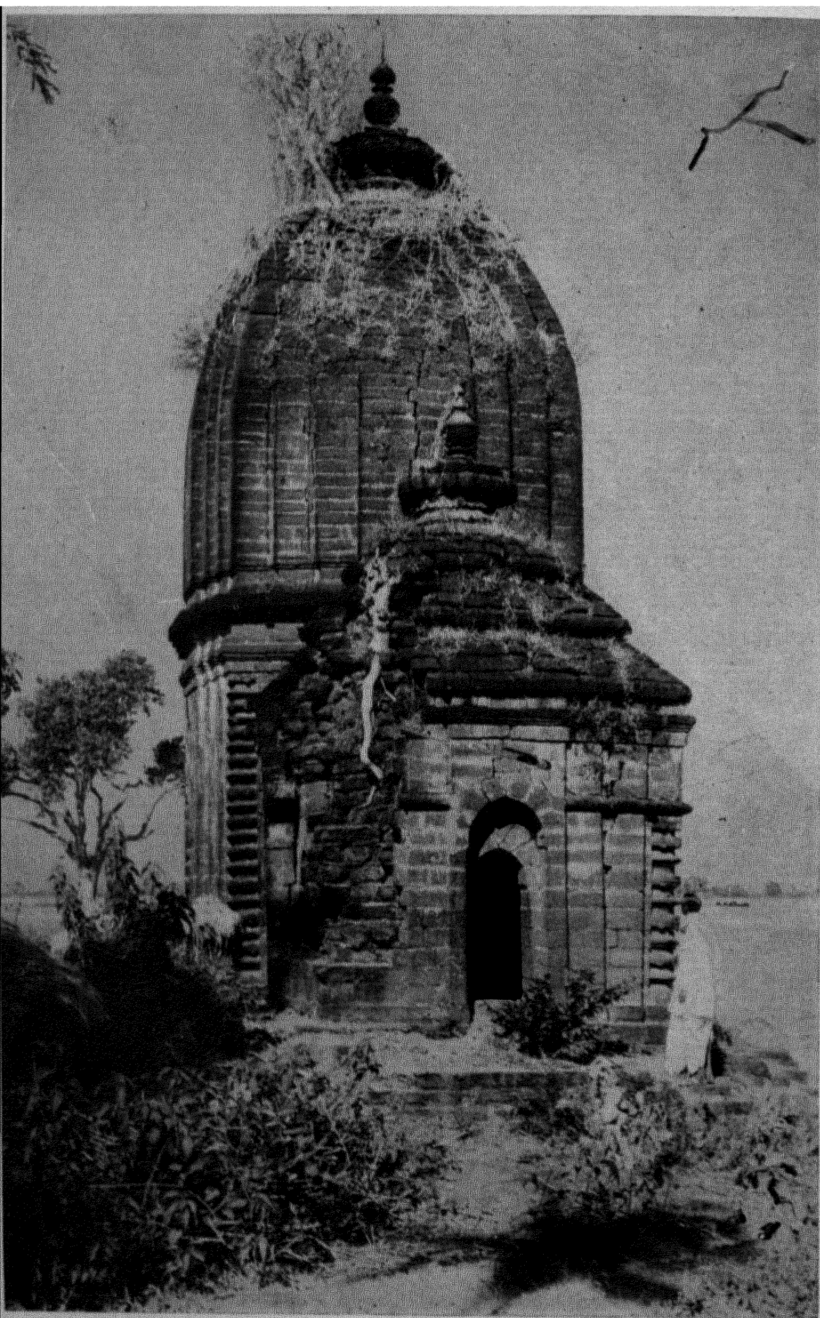




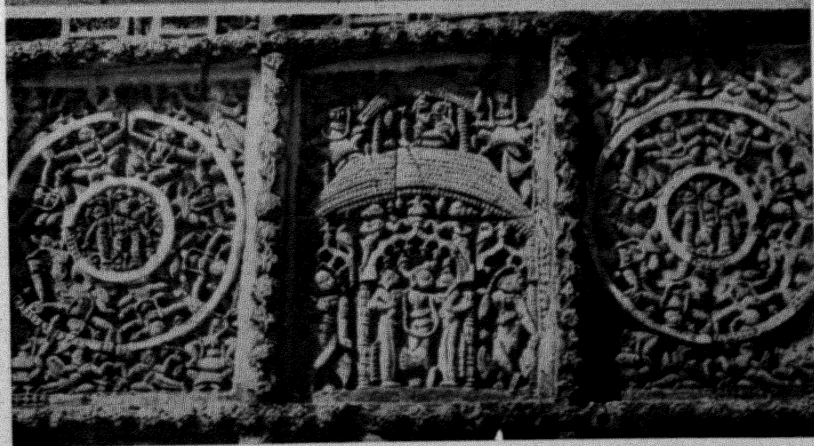
পাথরের চারচালা সর্বমঙ্গলা-মন্দির : নারিচা এবং গর্ভগৃহে রক্ষিত দুর্গা ও গণেশমূর্তি



প্রাক্-ম্সলিম য্গের অলংকৃত ইটের দেউল : বহ্লাড়া (প্ঃ ৬৯-৭২)



জগমোহনসমেত উড়িষ্যারীতির পাথরের দেউল : বিক্রমপুর (পৃঃ ৭৮)



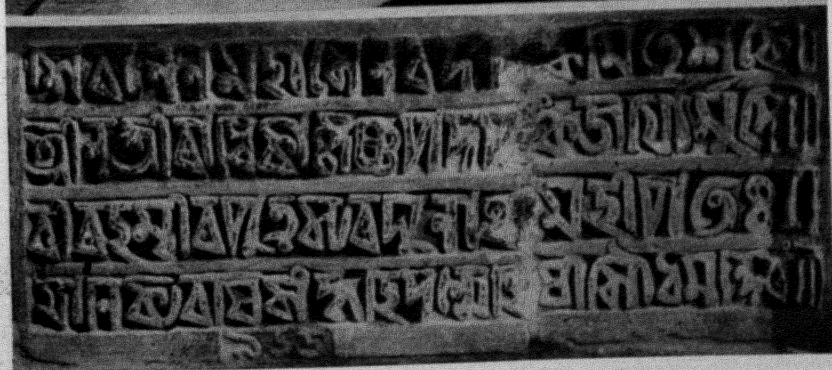
শ্যামরায় মন্দির ও তার 'টেরাকোটা' সজ্জার নিদর্শন : বিষ্ণুপুর (পৃঃ ৮৯-৯০)

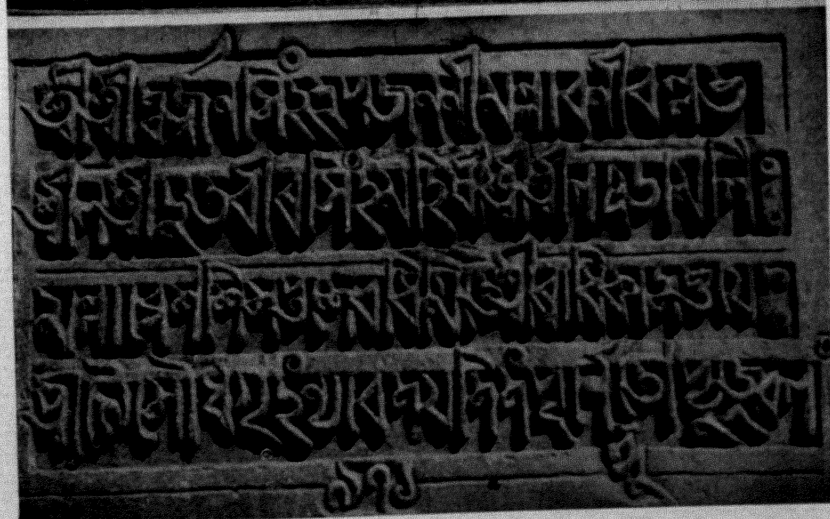


শ্যামরায় মন্দিরে খিলানের নীচে নিবদ্ধ 'টেরাকোটা' সজ্জা : বিষ্ণুপুর (পৃঃ ১০)

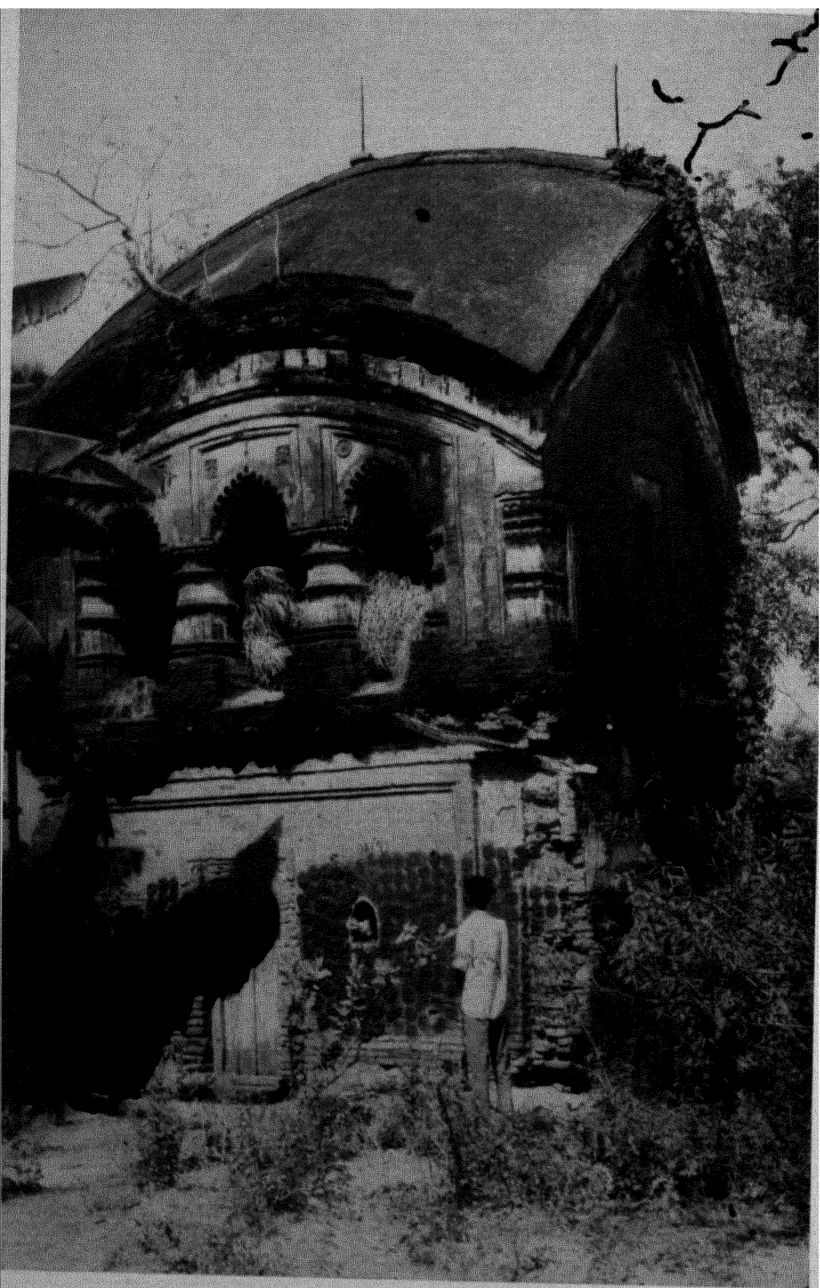




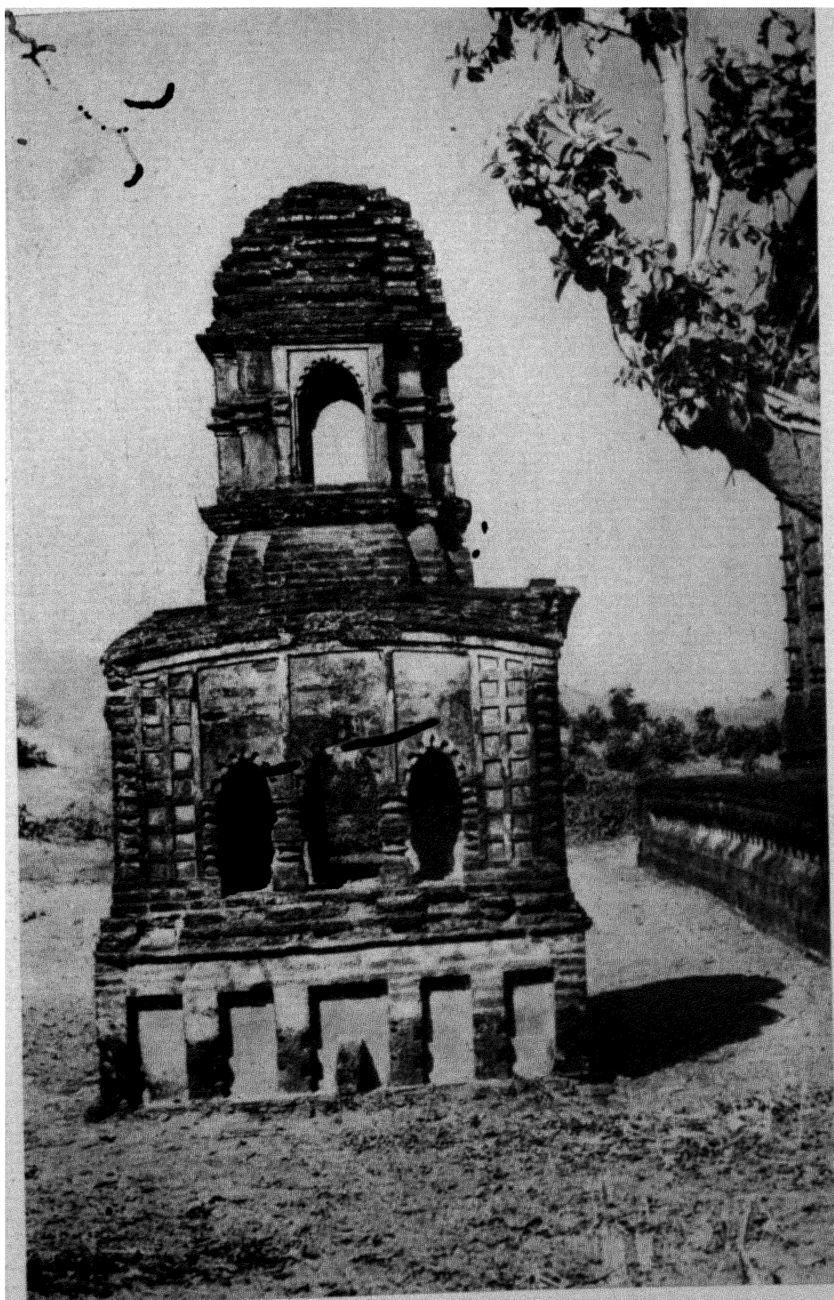




মদনমোহন মন্দিরের 'টেরাকোটা' সজ্জা ও মুরলীমোহন মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি : বিষ্ণুপুর



দ্বিতল, দোচালা নহবতখানা : বিষ্ণুপুর (পৃঃ ৯১-৯২)



রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গণে পাথরের রথ : বিষ্ণুপুর (পৃঃ ৮৩)



মল্ল 'রাজ'-পরিবারে রক্ষিত কাঠ-খোদাইয়ের নিদর্শন : পোড়ামাটির অনুরূপ সজ্জার সঙ্গে

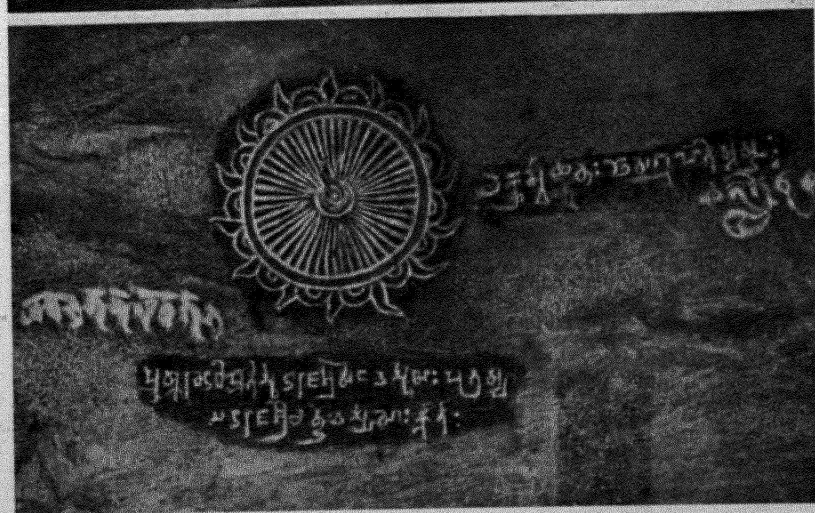




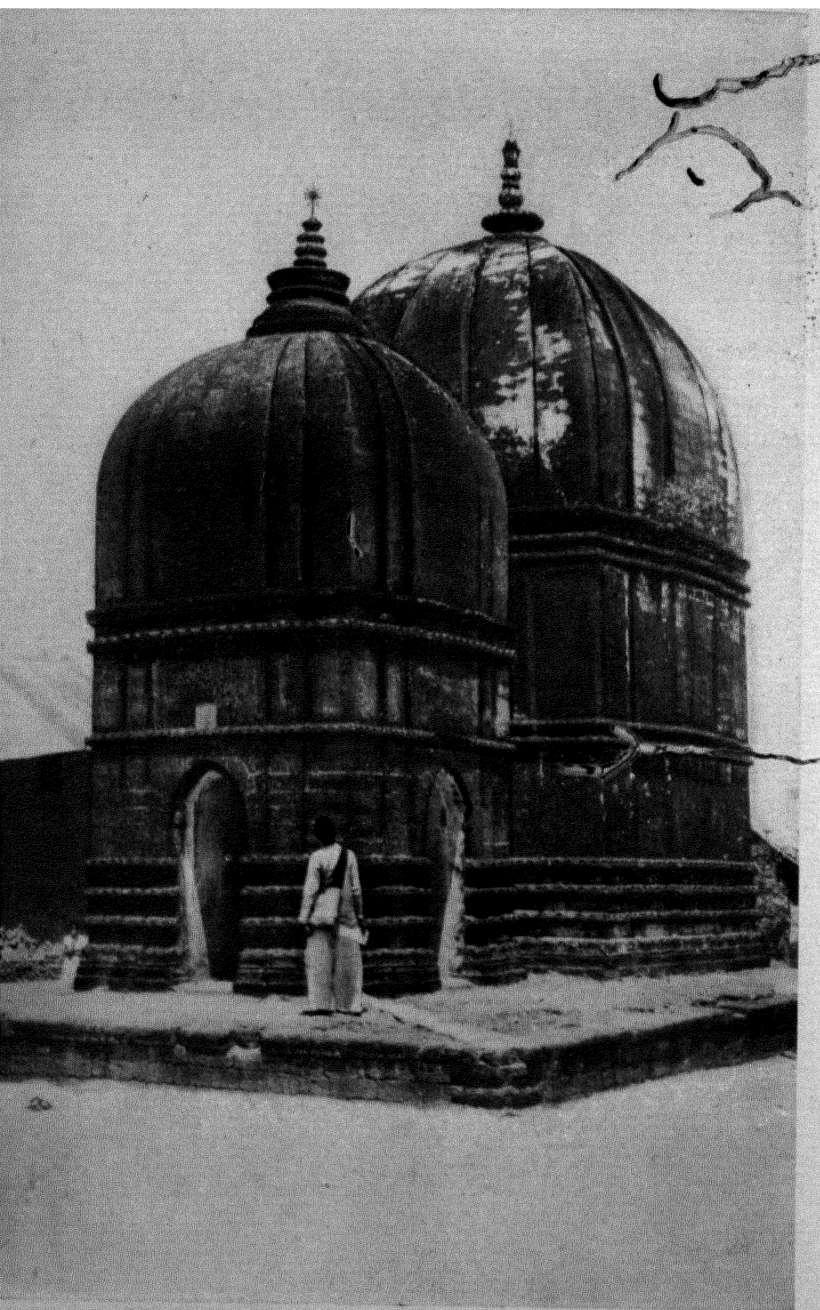
কোরবানতলায় কোরবান সাহেবের 'মাজার' : বিষ্ণুপুর (পৃঃ ৯৫-৯৬)

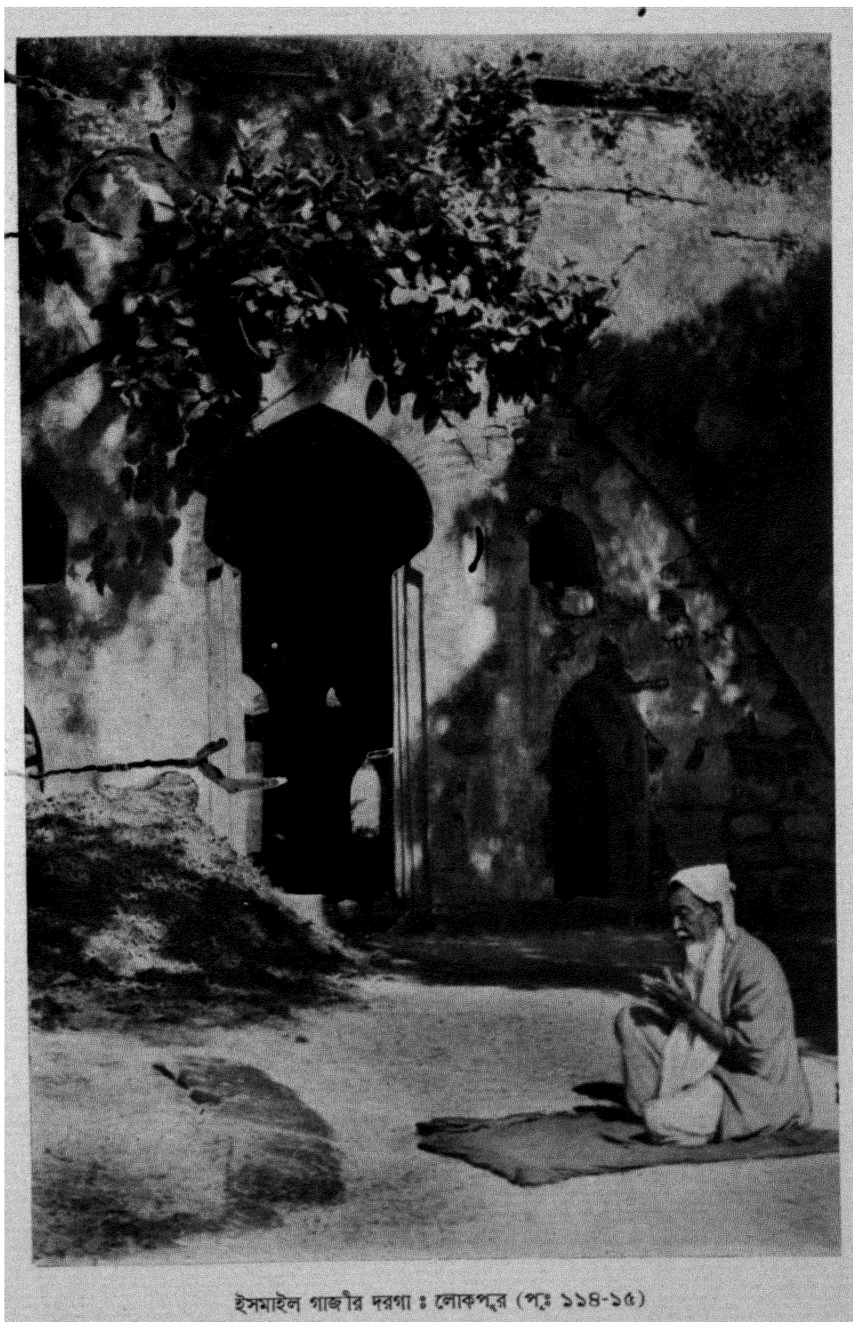




হাকন্দ মন্দির : ময়নাপুর ও চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া গুহালিপি (পৃঃ ১০৩ ও ১১৬-১৭)





ইসমাইল গাজীর দরগা ঃ লোকপুর (পৃঃ ১১৪-১৫)

পাতকথা।–

যত তঙ্কা খানকরা হইবেক দর। বহর মাপ্তি
কাপ্তিতার শুদ্ধ করিবের।। চৌবৃদ্ধি অঙ্গলে
হাত জানহ প্রমান। বহর মাপ্তি অঙ্গুল
তার কর নিরূপণ।। যত আঙ্গুলি ওঁদর
আনার তলে দিয়া। তারি বে বহর কথা-
শাবধান হইয়া।। হরণ করিলে যত আনা
গণ্ডা রয়। অঙ্গুলি প্রতি তত পাড়ে শুভঙ্কর
কয়।।

তিনশত প্রেচুশ অঙ্কি হাতাতথলো প্রর।
বাধনের ও রি দিয়া [illegible] হর।।
হারিলে পারিলে যদি চন্দ্র পক্ষ রয়।
বত্রেশ্বর শুভঙ্কর শাঙ্কিরেতে কয়।।

পাওন—
তাগাপ্রমান— ৩৩৩
১৭৫।২

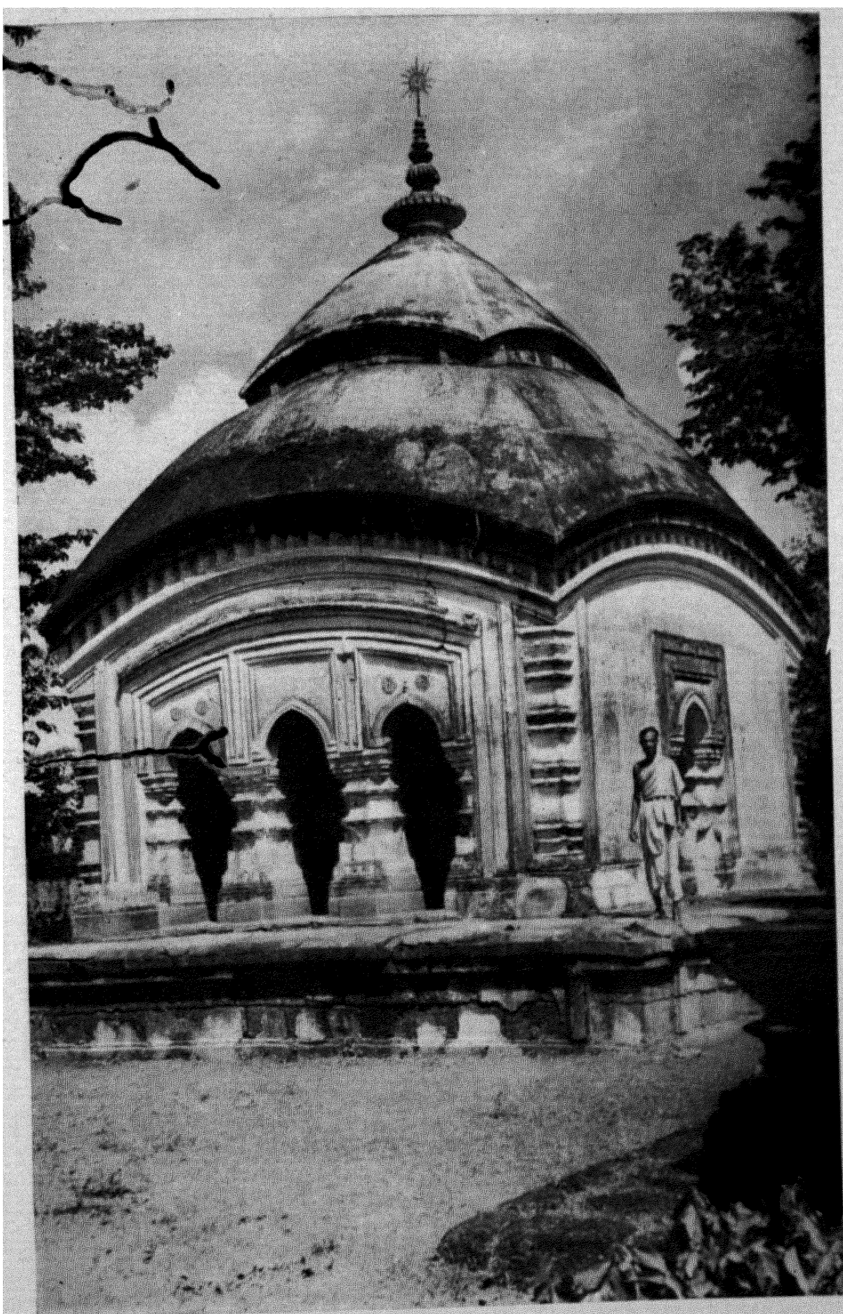
[illegible]

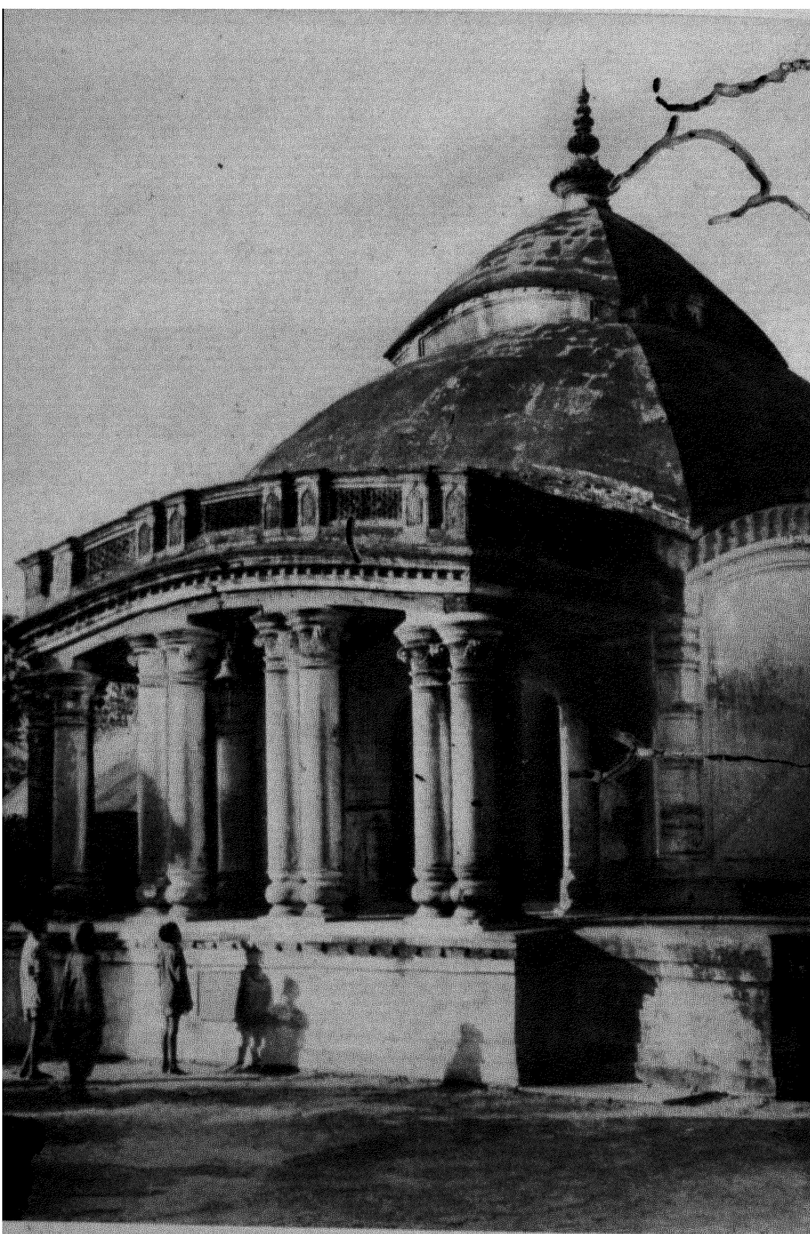
৩

১২

১

মাসামাসের একদিন হইল চাকরী। কয়গজ:
পাইয়া কিবা কোনা জবি জরী।। মাসের
চৌদ্দ জমা সাধ্যবিতে হয়। দশ পাচ কড়া ৪ ৩–





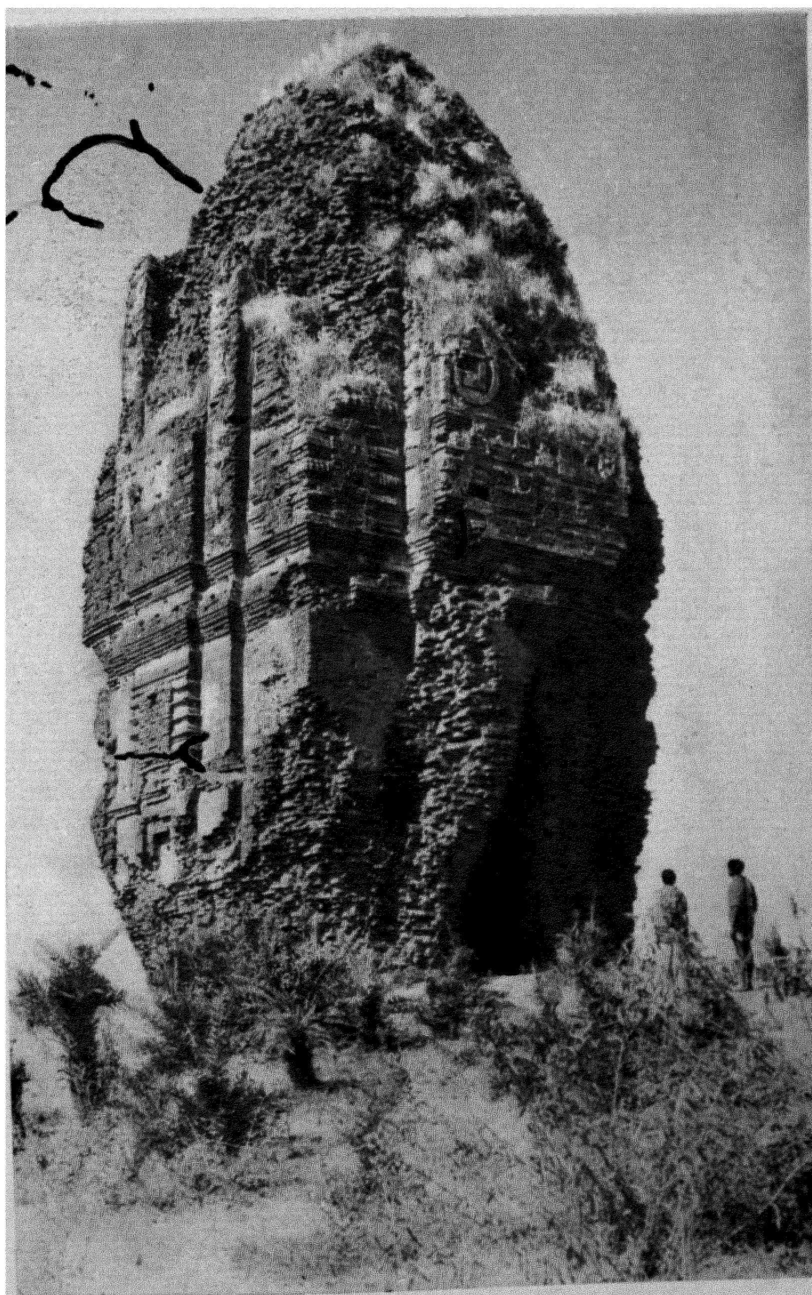
আধুনিক দালানযুক্ত পুরাতন আটচালা মন্দির : সিমলাপাল (পৃঃ ১২০)



জয়পুরের অদূরে পরিত্যক্ত সিমাফোর স্তম্ভ (পৃঃ ১২১-২২)



উড়িষ্যারীতির দেউল : সিহর (পৃঃ ১২২-২৩) ও সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরে পোড়ামাটির



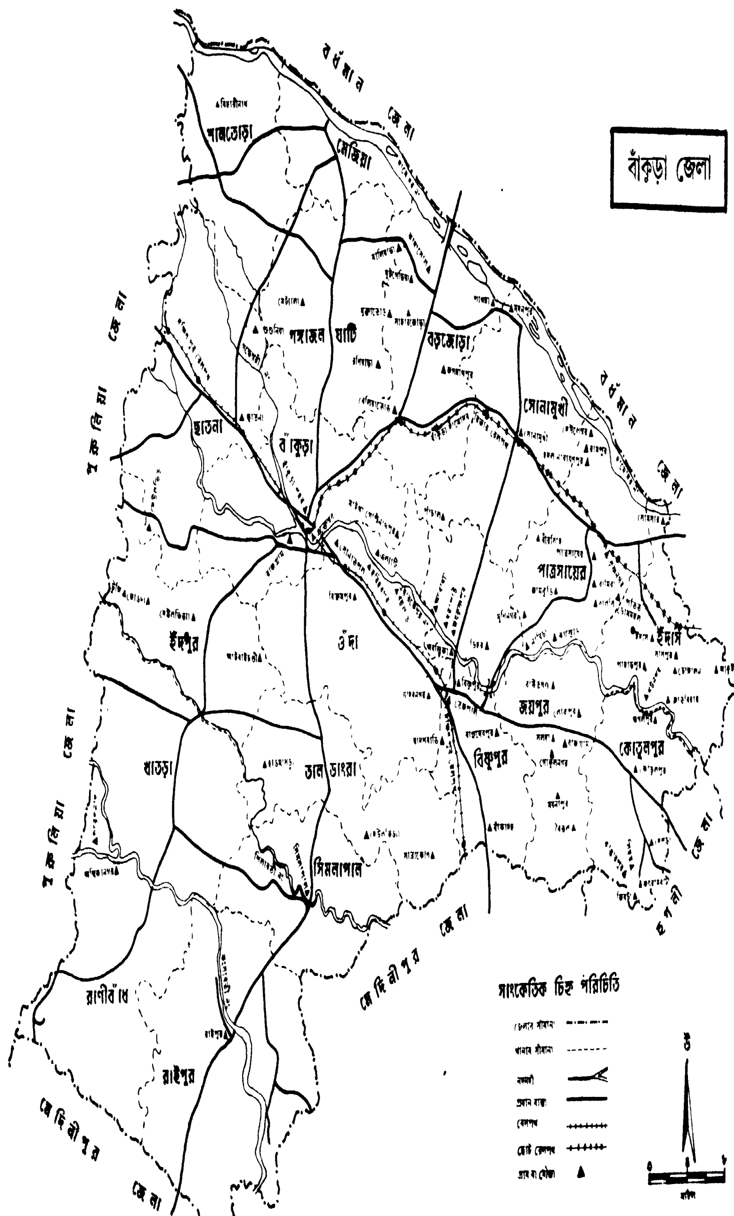
প্রাক্-মুসলিম যুগের ইটের জীর্ণ দেউল : সোনাতপল (পৃঃ ১২৩-২৫)





রাধাদামোদর মন্দিরের 'টেরাকোটা' সজ্জা : হদল-নারায়ণপুর (পৃঃ ১৩১)




বাঁকুড়া জেলা
বর্ধমান জেলা
বর্ধমান জেলা
পুরুলিয়া জেলা
পুরুলিয়া জেলা
মেদিনীপুর জেলা
মেদিনীপুর জেলা
হুগলী জেলা
শালতোড়া
মেজিয়া
গঙ্গাজলঘাটি
বড়জোড়া
সোনামুখী
ছাতনা
বাঁকুড়া
পাত্রসায়ের
ইঁদপুর
ওঁদা
ইন্দাস
জয়পুর
বিষ্ণুপুর
কোতুলপুর
খাতড়া
তালডাংরা
সিমলাপাল
রাণীবাঁধ
রাইপুর
সাংকেতিক চিহ্ন পরিচিতি
জেলার সীমানা
থানার সীমানা
নদনদী
প্রধান রাস্তা
রেলপথ
ছোট রেলপথ
গ্রাম বা মৌজা
উ